সাধক জীবনচরিত

সাধুসঙ্গো বিবেকশ্চ নির্মলং নয়নদ্বয়ম্ ।
যস্য নাস্তি নরঃ সোঽন্ধঃ কথং নাপদমার্গগঃ ॥

কুলার্ণব-তন্ত্র

গণেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

সংকলিত



নবপত্র প্রকাশন
৮ পটুয়াটোলা লেন / কলিকাতা-৯

SADHAK JIBANCHARITA
By GANESH CHANDRA MUKHOPADHAYA

প্রথম নবপত্র প্রকাশ : ১ আষাঢ় ১৩৬৫

মুদ্রক : নিউ এজ প্রিণ্টার্স
৫৯ পটুয়াটোলা লেন / কলিকাতা-৯

প্রকাশক : প্রসূন বসু
নবপত্র প্রকাশন
৮ পটুয়াটোলা লেন / কলিকাতা-৯

উপক্রমণিকা

প্রবল ঝটিকা উঠিলে বিশাল সিন্ধুবক্ষ যখন ভীষণভাবে আলোড়িত হয়—তরঙ্গের উপর তরঙ্গ গর্জন করিয়া বেগে প্রবাহিত হয়—বাতাসের দাপটে চারিদিক অস্থির করিয়া তোলে—তরণীসকলকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিয়া মুহূর্তে মুহূর্তে অসংখ্য নৌকা সাগর তলে নিমগ্ন করে ; ঐ সময়ে যে দুই-চারিখানি তরণীর মাঝি হাল ধরিয়া ঠিক থাকিতে পারে, বুদ্ধিপ্রভাবে তরঙ্গরাশি বিদলিত করিয়া আপনাকে বাঁচাইতে পারে, তাহারাই প্রকৃত মাঝি নামের উপযুক্ত ; সেইরূপ সংসার-সাগরের মধ্যে অসত্য এবং পাপের ভীষণ ঝড় যখন সমুত্থিত হয় এবং সত্য, পবিত্রতা, শান্তি প্রভৃতি নৌকাগুলি বিলুপ্ত হইতে থাকে, সেই সময়ে যাঁহারা বিরুদ্ধ ধর্মমতরূপ তরঙ্গরাশিকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিদলিত করিয়া সংসারসাগরের উচ্ছৃঙ্খলতা দূর করেন, তাঁহারাই জগতের মধ্যে প্রকৃত জ্ঞানী ও মহাপুরুষ।

ভারতভূমি রত্ন-প্রসবিনী। তিনি অনেক পুরুষরত্নের জননী। ইঁহার গর্ভে কত কত মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, করিতেছেন এবং করিবেন, তাহা কে বলিতে পারে ? এক সময়ে ব্যাস, বাল্মীকি প্রভৃতি মুনিঋষিগণ বিধাতৃপ্রদত্ত অমৃতপূর্ণ বীণাধ্বনিতে ইন্দ্রজালের ন্যায় ভুবন বিমোহিত করিয়া গিয়াছেন। আর্যধর্মকে নির্বাপিত করিয়া যখন নাস্তিকতার অগ্নি প্রধূমিত হইতেছিল, সেই সময়ে মহাত্মা শঙ্করাচার্য অভ্যুদিত হইয়া ব্রহ্মজ্ঞানের বিজয়ভেরী নিনাদিত করিয়া গিয়াছেন। এইরূপ কত কত মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়া কত উপকার ও কত অভাবপূরণ করিয়া গিয়াছেন। রত্নগর্ভা ভারত-ভূমিতে যে সকল মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের জীবনচরিত লেখাই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য।

বর্তমানকালে আমাদের দেশে নাটক, নভেল, উপন্যাস ব্যতীত ভ্রমণ-বৃত্তান্ত, জীবন-চরিত ও ধর্মসংক্রান্ত কোন পুস্তকেরই আদর নাই। এরূপ পুস্তক প্রণয়নে সাধারণে গ্রন্থকর্তাকে উৎসাহিত না করিয়া বরং তাঁহাকে নিরুৎসাহ করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, 'যে পুস্তকে পূর্ণিমার শুভ্র চন্দ্রালোকে খিড়্কির স্বচ্ছ পুষ্করিণীর ধারে লতামণ্ডপের মধ্যে ফুল্লকুসুমসদৃশ কমলমণিকে না দেখিতে পাওয়া যায় ; যে পুস্তকে প্রতিবেশীর পুত্র বিপিনকে হেমাঙ্গিনীর প্রতি কটাক্ষ-শর হানিতে না দেখিতে পাওয়া যায় ; যে পুস্তকে বিরহিণী ইন্দুবালাকে বিমর্ষভাবে পথিপার্শ্বস্থ গবাক্ষের দ্বারে প্রণয়ীর জন্য বসিয়া থাকিতে না দেখা যায়, সে পুস্তক কি আর পুস্তকের মধ্যে গণ্য ?' যে দেশের শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত ব্যক্তিদিগের এইরূপ ধারণা, সে দেশে এরূপ পুস্তকের উন্নতি কিরূপে হইবে ?

বর্তমানকালে এ দেশের অনেক ব্যক্তিকে তাঁহাদের পূর্বপুরুষদিগের নাম জিজ্ঞাসা করিলে বা তাঁহাদিগকে [illegible] বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, অম্লানবদনে উত্তর করিবেন, 'মহাশয় ! ও সব আমরা শিক্ষা করি নাই', কিন্তু তাঁহারা, সুদূর সাগরপারে ইউরোপখণ্ডের মধ্যে যে সকল রাজা-প্রজা ও লেখক-লেখিকা আছেন, তাহাদের চৌদ্দ-পুরুষের নাম ও ঠিকানা অনায়াসে বলিয়া দিবেন, তাহাতে কোনরূপ দ্বিরুক্তি করিবেন

না। এ কথা সত্য যে, পূর্বকালের বিদ্যা জ্ঞানকরী ছিল এবং এখনকার বিদ্যা অর্থকরী হইয়াছে। তখনকার লোকে, জ্ঞানসঞ্চয় হইতে পারে, এরূপ পুস্তক আদরের সহিত পাঠ করিতেন ; আর এখনকার লোকে বিরহিণীর বিরহ, প্রণয়িণীর প্রণয়, বারাঙ্গনার দাম্পত্য-প্রেম প্রভৃতি অতি আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়া থাকেন। এরূপ সমাজের মধ্যে আমার এই 'সাধক জীবনচরিত' যে প্রতিষ্ঠালাভ করিবে বা ইহা বিক্রয় করিয়া আমি অর্থোপার্জন করিব, এরূপ আশা আমাব নাই। আমি নিজে মহৎ ব্যক্তিদিগের জীবনী পাঠ করিতে ভালবাসি বলিয়া জনসাধাবণে ইহা প্রকাশ করিলাম। এই সাধক জীবনচরিতের দ্বারা শত-সহস্র, লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি নরনারীর মধ্যে যদি একজনও ইহা পাঠ করিয়া কিঞ্চিন্মাত্র আনন্দলাভ করেন, তাহা হইলে আমার সকল শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

পরিশেষে আমি কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, নব্যভারত ও অন্যান্য দুই-চারিখানি মাসিক পত্রিকার সাহায্য না পাইলে এবং আমার প্রিয় সুহৃদ প্রসিদ্ধ ডিটেক্টিভ উপন্যাস লেখক শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি দে মহাশয় ইহার সংশোধনের ভার গ্রহণ না করিলে আমি কখনই ইহা প্রকাশ করিতে পারিতাম না।

বঙ্গদেশের শিক্ষা-বিভাগেব ডিরেক্টার সাহেব এই পুস্তকখানি স্কুলের ছাত্রদিগকে পারিতোষিক দিবার জন্য এবং স্কুল লাইব্রেরিতে রাখিবাব জন্য সম্মতি দান করিয়াছেন। তাঁহাব এই অনুমোদন, ১৯১৯ সালের আগস্ট মাসের ২৩শে তারিখের 'কলিকাতা গেজেটে' প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীগণেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

সূচীপত্র

শাক্যবংশের উৎপত্তি

বুদ্ধদেব শাক্যবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া সাধনার দ্বারা সিদ্ধ হইয়াছিলেন। শাক্য-বংশীয়দিগের মধ্যে তিনিই কেবল কামক্রোধাদি রিপুসকলকে জয় করিয়াছিলেন। তাঁহার এতাদৃশ ক্ষমতা দেখিয়া শাক্যবংশীয় লোকেরা তাঁহাকে শাক্যসিংহ ও শাক্যমুনি আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। শাক্যবংশ আমাদিগের পৌরাণিক সূর্যবংশের একটি পৃথক্ শাখা মাত্র। সূর্যবংশীয় ইক্ষ্বাকু রাজা যে বংশের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেই বংশের একাংশ হইতে শাক্যবংশের উৎপত্তি হইয়াছিল। ইক্ষ্বাকুবংশে সুজাত নামক এক রাজা ছিলেন, তাঁহার পুত্রেরা তৎ-কর্তৃক নির্বাসিত হইয়া 'শাক্য' এই অভিধা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কি কারণে যে উঁহারা নির্বাসিত হইয়াছিলেন, তাহার বিবরণ এই স্থানে লিপিবদ্ধ করিলাম।

পুরাকালে অযোধ্যা-নগরে সুজাত নামে ইক্ষ্বাকুবংশীয় একজন প্রতাপশালী রাজা ছিলেন। তাঁহার পাঁচ পুত্র ও পাঁচ কন্যা ছিল। পুত্রগণের নাম—ওপুর, নিপুর, করকুণ্ডক, উল্কামুখ ও হস্তিশীর্ষক। কন্যাগণের নাম—শুদ্ধা, বিমলা, বিজিতা, জলা ও জলী। এই সকল পুত্র ও কন্যা ব্যতীত 'জেন্ত' নামে তাঁহার আর এক পুত্র ছিল। সেটি তাঁহার প্রধানা মহিষীর সখী-পুত্র। সখীর নাম জেন্তি, সেই জন্য সকলে তাহার পুত্রকে জেন্ত বলিয়া ডাকিত।

রাজা সুজাত এক সময়ে ঐ সখীকে স্ত্রীভাবে আরাধনা করিয়াছিলেন, জেন্তিও তাঁহার বাসনা পূর্ণ করিয়াছিল। ইহার জন্য রাজা পরিতুষ্ট হইয়া জেন্তিকে বলিয়াছিলেন, 'তোমার সৌজন্য দেখিয়া আমি তোমায় বরপ্রদান করিতে ইচ্ছা করি, অতএব তুমি তোমার অভিলষিত বর-প্রার্থনা কর। রাজার ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া জেন্তি মনে মনে বিবেচনা করিল যে, রাজার অবর্তমানে তাঁহার অন্যান্য পুত্রেরা পিতৃ-রাজ্যের ও পৈতৃক ধনের অধিকারী হইবে, আমার পুত্রের তাহাতে কোন অধিকার থাকিবে না, অতএব যাহাতে আমার পুত্র ঐ সিংহাসন প্রাপ্ত হয়, তাহাই করিতে হইবে। এইরূপ চিন্তা করিয়া জেন্তি বলিল, 'মহারাজ! আপনি যদি আমাকে বর দিতে একান্ত অভিলাষী হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আপনি আপনার পাঁচ পুত্রকে বনবাসী করিয়া আমার পুত্রকে রাজ্যপ্রদান করুন।' মহারাজ সুজাত, জেন্তির মুখে এইরূপ বরপ্রার্থনা শুনিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন, কিন্তু প্রতিজ্ঞাভঙ্গের ভয়ে কোন ক্রমেই স্বীকৃত বরপ্রদানে বিমুখ হইতে পারিলেন না। রাজা 'তাহাই হউক' বলিয়া জেন্তির অভিলষিত বরপ্রদান করেন। রাজার বরদানের কথা, ক্রমে নগরবাসিমাত্রেই শুনিল। রাজকুমারেরা পিতৃসত্য-পালনের জন্য পিতৃরাজ্য পরিত্যাগ করিয়া বনে গমন করেন। কুমারদিগকে বনগমন করিতে দেখিয়া রাজ্যের অধিকাংশ লোকেই তাঁহাদের সহিত গমন করেন। ইঁহারা বহুদেশ পর্যটন করিয়া অবশেষে হিমালয়ের সন্নিকটস্থ রোহিণী নদীতীরবর্তী শকোট বনে আসিয়া উপস্থিত হন। ঐ বিস্তৃত শকোটবনের

মধ্যে যে স্থানে মহানুভব ও মহাজ্ঞানী কপিলমুনি* বাস করিতেন, উঁহারা তাঁহারই আশ্রমের সন্নিকটে বসবাস করেন। রাজকুমারেরা শকোটবনে বাস করায় এবং অন্য কোন বংশের সহিত সংস্রব না রাখিয়া আপনাদের পরস্পর ভগিনী, ভাগিনেয়ী প্রভৃতির সহিত বিবাহপ্রথা প্রচলিত করায়, উঁহাদের বংশ শাক্যবংশ বলিয়া অভিহিত হয়। সুজাত রাজার জ্যেষ্ঠপুত্র 'ওপুর'ই শাক্যবংশের প্রথম বা আদিপুরুষ। শাক্যবংশ ইক্ষ্বাকু-বংশের একটি শাখা মাত্র।

কপিলবস্তু নগরের উৎপত্তি

সুজাত রাজার নির্বাসিত পুত্রেরা বহুলোক সমভিব্যাহারে হিমালয়ের উৎসঙ্গপ্রদেশে কপিল ঋষির আশ্রম-নিকটস্থ শকোটবনে বাস করিলে, ক্রমে তথায় অন্যান্য লোক যাতায়াত আরম্ভ করে। নানা দেশীয় বণিক্‌গণও তথায় গতিবিধি করিতে থাকে। তখন তাঁহাদের ইচ্ছা হয় যে, আমরা এই স্থানেই থাকিব, অন্য কোথাও যাইব না। কুমারেরা এইরূপ মনস্থ করিয়া কপিলমুনির আজ্ঞা লইয়া সেই শকোটবনে এক উত্তম নগর নির্মাণ করেন। কপিলমুনির আজ্ঞা লইয়া ঐ নগর নির্মিত হইয়াছিল বলিয়া, ঐ নগরের নাম 'কপিলবস্তু' হয়।

কপিলবস্তু নগর স্থাপিত হইবার পর হইতেই তাহার শ্রীবৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হয়। ক্রমে উহা এত সমৃদ্ধিশালী হয় যে, তৎকালে ঐ নগর প্রধান বাণিজ্যস্থান বলিয়া বিখ্যাত হইয়া উঠে। সুজাত রাজার জ্যেষ্ঠপুত্র ওপুর ঐ নগরের রাজ-পদে অভিষিক্ত হন। ওপুরের পর যথাক্রমে নিপুর, করকুণ্ডক, সিংহহনু** প্রভৃতি রাজা হইয়াছিলেন। সিংহহনুর চারি পুত্র এবং এক কন্যা হইয়াছিল। পুত্রগণের নাম শুদ্ধোদন, ধৌতোদন, শুভোদন ও অমৃতোদন এবং কন্যার নাম অমিতা। শুদ্ধোদন জ্যেষ্ঠ বলিয়া সিংহহনুর পরলোকপ্রাপ্তির পর পৈতৃক-সিংহাসন তিনিই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই শুদ্ধোদন রাজার ঔরসে ও কোলবংশীয় ভার্যা মায়া দেবীর গর্ভে ভগবান্ বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করেন।

ইক্ষ্বাকুবংশীয় সুজাত রাজার জ্যেষ্ঠপুত্র ওপুর বিখ্যাত শাক্যবংশের মূল। এই মূল পুরুষের অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ অতীত হইলে মহাত্মা শাক্যমুনির উদয় হয়।

* এই কপিলমুনি সাংখ্যবক্তা ও সগর-সন্তানগণের দাহকর্তা কপিল হইতে পৃথক্ ব্যক্তি। তাহার কারণ এই যে, ইঁনি গৌতম-গোত্রীয় বলিয়া বিশেষিত হইয়াছিলেন।

** আমি যে কয়খানি বুদ্ধদেবের জীবনী দেখিয়াছি, তাহার সকলগুলিতেই সিংহহনুর পুত্র শুদ্ধোদন লিখিত আছে, কেবল 'শাক্যমুনি-চরিত' নামক পুস্তকে ইহার মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ পুস্তকের ৪৯ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে—'কুমারের পিতামহধনু সিংহহনু, যাহা উত্তোলন করিতেও কাহার সাধ্য হয় নাই, উপবিষ্ট থাকিয়াই তদ্যোগে তিনি দশ ক্রোশ দূরস্থিত ভেরী, সপ্ততাল এবং যন্ত্রযুক্ত বরাহ ভেদ করেন, বাণ পাতালে প্রবিষ্ট হয়, সে স্থানে একটি কূপ হয়, সেই কূপের নাম আজিও লোকে শরকূপ বলিয়া থাকে।' ইহার দ্বারা বেশ বুঝা যাইতেছে যে, সিংহহনু বলিয়া কোন ব্যক্তি ছিলেন না, সুতরাং শুদ্ধোধনের পিতার নাম সিংহহনু নহে।

শাক্যসিংহের মাতামহ কুলের ইতিহাস

শাক্যসিংহের মাতামহকুলের ইতিহাস অত্যন্ত অদ্ভুদ। রাজা শুদ্ধোদন যে কুলে বিবাহ করিয়াছিলেন, সে কুল বা বংশ শাক্য হইলেও তাঁহার পাণিগৃহীতা ভার্যা কোলীয়বংশের দৌহিত্রী ছিলেন। এই কোলীয়কুল বা কোলীয়বংশ শাক্যবংশের কন্যা হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল। কোন এক পরিত্যক্তা শাক্যকন্যার গর্ভে কোল নামক জনৈক ঋষির ঔরসে এই বংশের মূলপুরুষ উৎপন্ন হইয়াছিলেন। কোলীয়বংশের উৎপত্তির ইতিবৃত্ত এইরূপ ঃ—

সুজাত-রাজপুত্রেরা ও তৎসহগামী অন্যান্য ক্ষত্রিয়েরা শাক্য-আখ্যা প্রাপ্ত হইলে ক্রমে তাহাদের বংশ-বিস্তার হয়। করকুণ্ডক শাক্যের রাজত্বকালে কোন এক শাক্য-কন্যার গলৎকুষ্ঠব্যাধি হইয়াছিল, বৈদ্যেরা অনেক চেষ্টা করিয়াও কিছুতেই তাঁহার ব্যাধির উপশম করিতে পারেন নাই। কন্যাটির অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সমস্তই এক ব্রণ হইয়া যায়, কোন স্থান অক্ষত ছিল না। হতভাগিনী কন্যা গলৎকুষ্ঠরোগগ্রস্তা হইয়া প্রত্যেক লোকের ঘৃণার্হা হন। তাঁহার ভ্রাতৃগণ তাঁহাকে পর্বতে পরিত্যাগ করা বিধেয় বোধ করেন। অনন্তর তাঁহার ভ্রাতৃগণ তাঁহাকে এক শকটে আরোহণ করাইয়া হিমালয়-সমীপে লইয়া যান। তাঁহারা হিমালয় পর্বতের একটি গুহা-মধ্যে তাঁহাকে প্রবেশ করাইয়া, তন্মধ্যে প্রভূত ভক্ষ্য, প্রচুর পানীয়, কতকগুলি কম্বল ও অন্যবিধ শয্যা প্রদান করিয়া গুহার মুখ কাষ্ঠরাশির দ্বারা প্রচ্ছন্ন করতঃ বালুকারাশির দ্বারা তাহার ছিদ্রভাগ বন্ধ করিয়া দিয়া কপিলবস্তু নগরে ফিরিয়া আসেন। মৃতকল্পা শাক্য-দুহিতা কয়েক দিবস সেই গুহ্য-মধ্যে বাস করায় বায়ুহীন স্থানে বাসের জন্যই হউক অথবা সেই গুহার উষ্মতাপ্রযুক্তই হউক, তিনি সম্পূর্ণ রূপে আরোগ্য লাভ করেন, অধিকন্তু তাঁহার এরূপ নূতন শরীর ও মনোহর রূপ হয় যে, তাঁহাকে দেখিলে আর মানুষ বলিয়া বিবেচনা হইত না।

একদা এক ব্যাঘ্র আহার অন্বেষণে সেই স্থান দিয়া আসিলে মনুষ্যের গন্ধে আকুল হইয়া উঠে। ব্যাঘ্র ক্রমে গুহার নিকটস্থ হইলে মনুষ্যগন্ধ অধিকতর প্রাপ্ত হইয়া গুহার মুখস্থিত বালুকারাশি পদের দ্বারা আকর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হয়। এই পর্বত-গুহার অনতিদূরে 'কোল' নামে জনৈক রাজর্ষি বাস করিতেন। ঋষি ফুল-আহরণার্থ সেই স্থানে আসিয়া দেখেন, এক ব্যাঘ্র গুহামুখস্থ বালুকারাশি অপসারণ করিতেছে। ইহা দেখিয়া ঋষির কৌতূহল জন্মে, তিনি ক্রমে তাহার নিকটগামী হন। ঋষির প্রভাবে ব্যাঘ্র পলায়ন করিলে, ঋষি সেই গুহাদ্বারে গিয়া দেখেন, গুহাদ্বারের বালুকারাশি ব্যাঘ্র কর্তৃক উৎসারিত হইয়াছে; কিন্তু কতকগুলি কাষ্ঠের দ্বারা গুহাদ্বার আবৃত আছে। ঋষি আরও কৌতূহলী হন এবং কাষ্ঠগুলিকে একে একে অপসারিত করিয়া দেখেন, তন্মধ্যে যেন এক দেবকন্যা উপবিষ্টা আছেন। ঋষি জিজ্ঞাসা করেন, 'তুমি কে?' কন্যা প্রত্যুত্তর করেন, 'আমি কপিলবস্তু নগরের অমুক শাক্যের কন্যা, আমার গলৎকুষ্ঠ-রোগ হইয়াছিল, তৎকারণে আমার প্রতি আমার ভ্রাতৃগণের ঘৃণার উদ্রেক হওয়ায়, আমাকে এই স্থানে জীবিতাবস্থায় বিসর্জন দিয়া গিয়াছেন, কয়েক দিনের মধ্যে আমার সে ভীষণ রোগ সারিয়া গিয়াছে। এক্ষণে আপনার অনুগ্রহে আমি মনুষ্য মুখ দেখিয়া পুনর্জন্ম-তুল্য বোধ করিলাম।'

রাজর্ষি কোল, সেই কন্যার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে আশ্রমে লইয়া আসেন এবং

ধ্যান-জ্ঞান সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার সহিত গার্হস্থ্য ধর্মের অনুশীলন করিতে থাকেন। ক্রমে সেই শাক্যদুহিতার গর্ভে কোল ঋষির ঔরসে যমজক্রমে ১৬টি সন্তান জন্মে। ঋষিপুত্রেরা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, তাহাদের মাতা তাহাদিগকে কপিলবস্তু নগরে যাইবার জন্য আদেশ করেন। তিনি তাহাদিগকে বলেন, 'পুত্রগণ! কপিলবস্তু নগরের অমুক শাক্য আমার পিতা, তোমাদের মাতামহ অমুক অমুক, তোমাদের মাতুল আমার ভ্রাতা অমুক! এক্ষণে তোমরা সেই স্থানে তাঁহাদের নিকট যাও—অবশ্যই তাঁহারা তোমাদের বৃত্তি-বিধান করিবেন। তোমাদের মাতামহবংশ মহদ্বংশ, অবশ্যই তাঁহারা তোমাদিগকে গ্রহণ করিবেন।'

শাক্যকন্যা ঐরূপ বলিযা পুত্রদিগকে শাক্যবংশের আচার-ব্যবহার রীতি-নীতি ধর্ম-বিষয়ক উপদেশ দেন। তাহারা মাতৃকুলের আচার-ব্যবহার শিক্ষা করিয়া কপিলবস্তু নগরে গমন করে। ঋষিবালকেরা ক্রমে শাক্যদিগের সভাস্থানে উপস্থিত হয়। তাহারা মাতার নিকট যেরূপ শিক্ষা পাইয়াছিল, সেইরূপ নিয়মে শাক্যসভায় প্রবেশ করিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করে। শাক্যগণ ঋষিকুমারগণের শাক্যাচার দেখিয়া বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমরা কোথা হইতে আসিতেছ এবং কাহার বংশধর?' তাহারা প্রত্যুত্তরে বলে, 'আমরা কোলাশ্রম হইতে আসিয়াছি, আমাদের মাতা অমুক শাক্যের কন্যা, আমাদের পিতা কোল ঋষি। আমাদের মাতা কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্তা হইলে, অমুক শাক্য তাঁহাকে গিরিগহ্বরে পরিত্যাগ করিয়া আসেন। দেবানুগ্রহে তিনি আরোগ্য লাভ করিলে রাজর্ষি কোল তাঁহাকে বিবাহ করেন। আমরা তাঁহাদের পুত্র, মাতামহ ও মাতুলদিগকে দেখিতে আসিয়াছি।'

উক্ত বালকবৃন্দের মাতামহ এ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন এবং তিনি ও তাঁহার পুত্র-পৌত্রগণ সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। কথিত বৃত্তান্ত শুনিয়া তাঁহারা সকলেই বিস্মিত ও আনন্দিত হন। আনন্দের বিশেষ কারণ এই যে, রাজর্ষি কোলকে তাঁহারা চিনিতেন। রাজর্ষি কোল বারাণসীর রাজা। তিনি জ্যেষ্ঠপুত্রের উপর রাজ্যভার অর্পণ করিয়া হিমালয় পর্বতের পাদদেশে তপস্যার্থ গমন করিয়াছিলেন। তাঁহা-কর্তৃক শাক্যকন্যা পরিগৃহীত হইয়াছে এবং তাঁহার ঔরসে দৌহিত্রগণ উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা অবশ্যই আনন্দের বিষয়।

শাক্যগণ অতিমাত্র প্রীত হইয়া সেই দৌহিত্র ও ভাগিনেয়দিগকে গ্রহণ করেন এবং যথোচিত বৃত্তি প্রদান করেন। যে বালকের যে নাম, সেই বালককে সেই নামে এক-একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম ও কিছু কিছু কৃষিযোগ্য ভূমি প্রদান করেন এবং উহাদিগকে কোলীয় নামে খ্যাত করেন। এইরূপে শাক্যকন্যা হইতে কোলীয় বংশ উৎপন্ন হইয়াছিল। সুভূতি নামক জনৈক শাক্য এই কোলীয় বংশের এক সুন্দরী কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, তদ্গর্ভে মায়াদেবীর জন্ম হয়।

কপিলবস্তু নগরের অদূরে 'দেবড়হো' নামক গ্রামে সুভূতি শাক্য বাস করিতেন। সুভূতি সেই গ্রামের অধিপতি। তিনি করভদ্র গ্রামের কোলীয়কুলে যে কন্যার পাণিগ্রহণ করেন, তাঁহার গর্ভে সাত কন্যা উৎপাদন করিয়াছিলেন। পুত্র হইয়াছিল কি না, তাহা জানা যায় নাই। কন্যাগুলির নাম যথাক্রমে বর্ণিত হইল। যথা—মায়া, মহামায়া, অতিমায়া, অনন্তমায়া, চুলায়া, কোলীসেবা ও মহাপ্রজাপতি।

রাজা সিংহহনু পরলোকগমন করিলে পর, তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র শুদ্ধোদন রাজ্যপ্রাপ্ত

হইয়া উপর্যুক্ত সুভূতি শাকের প্রথমা কন্যা মায়া এবং কনিষ্ঠা কন্যা মহাপ্রজাপতির পাণিগ্রহণ করেন। এই বিবাহের দ্বাদশবর্ষ পরে মহারাজ শুদ্ধোদনের ঔরসে ও মায়াদেবীর গর্ভে ভগবান্ শাক্যসিংহের উদয় হইয়াছিল।

বুদ্ধদেবের জন্ম

শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেই নেপাল রাজ্যের নাম শুনিয়া থাকিবেন। নেপাল রাজ্যের উত্তর সীমা হিমালয় পর্বত, পূর্ব সীমা সিকিম প্রদেশ, দক্ষিণ সীমা বঙ্গ, বিহার ও অযোধ্যাপ্রদেশ এবং পশ্চিম সীমা দিল্লী ও কিউমাউন দেশ। এই চতুঃসীমাবিশিষ্ট নেপাল রাজ্যের মধ্যে কপিলবস্তু নামে এক নগর ছিল। ঐ নগর শাক্যবংশসম্ভূত রাজা শুদ্ধোদনের রাজধানী। কপিলবস্তুর বর্তমান নাম কোহানা।

মহারাজ শুদ্ধোদনের পাঁচ মহিষী, তন্মধ্যে মায়াদেবীই সর্বপ্রধানা। মায়াদেবী রূপে ও গুণে অতুলনীয়া ছিলেন। মহারাজ তাঁহার অলৌকিক রূপলাবণ্যে এরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে কখনও তাঁহাকে নয়নের অন্তরাল করিতে পারিতেন না। যখনই তাঁহার সরল কমনীয় অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানি দেখিতেন, যখনই তাঁহার ঈষৎ ব্রীড়াবনত বিশাল নয়নের বঙ্কিম-কটাক্ষ লক্ষ্য করিতেন, যখনই তাঁহার লজ্জারাগ-রঞ্জিত সলজ্জ-বদনে বীণাবিনিন্দিত মধুর কণ্ঠস্বর শুনিতেন, তখনই তিনি সংসারের সকল চিন্তা ভুলিয়া যাইতেন। শুধু যে তিনি তাঁহার সৌন্দর্য দেখিয়াই বিমোহিত হইতেন, তাহা নহে, তাঁহার কর্তব্যপ্রিয়তা, আত্মসংযম, ধর্মনিষ্ঠা প্রভৃতি সদ্‌গুণ দেখিয়া স্বর্গোপম সুখানুভব করিতেন। যদিও মহারাজ শুদ্ধোদন তাঁহার অশেষসদ্‌গুণালঙ্কৃতা সর্ব-সৌন্দর্যশালিনী মহিষীর রূপে গুণে মুগ্ধ হইয়া থাকিতেন, কিন্তু তাঁহার হৃদয়ে এক দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা ঘুরিয়া বেড়াইত, সেইজন্য তিনি সুখী হইয়াও সময়ে সময়ে গভীর দুঃখে ম্রিয়মান থাকিতেন। সতীসাধ্বী স্ত্রীগণ কখনও, এমন কি, একদণ্ডও, স্বামীর দুঃখভাব দেখিতে পারেন না, কখনও স্বামীর নিন্দা শ্রবণ করিতে পারেন না, স্বামীকে সুখী করিবার জন্য ইঁহারা সর্বদাই চেষ্টা করিয়া থাকেন। একদিন মায়দেবী মহারাজের মুখমণ্ডল নিষ্প্রভ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'নাথ! আজ আপনাকে এরূপ বিষণ্ন দেখিতেছি কেন? শরীর-গতিক ভালো আছে তো?' মায়াদেবীর কথা শুনিয়া রাজা বলিলেন, 'প্রেয়সি! আমি শারীরিক ভালো আছি বটে, কিন্তু মানসিক বেদনা আমায় বড় যন্ত্রণা দিতেছে। যদি আমি পুন্নাম নরক হইতে উদ্ধার না হইলাম, তবে আমার এ বিষয়বৈভবে কি আবশ্যক?' মহারাজের কথা শুনিয়া মায়াদেবী যখন বুঝিলেন যে, এ দুঃখ দূর করা সাধ্যাতীত, তখন তিনি রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'স্বামিন্! যাঁহাকে বাক্যে প্রকাশ করা যায় না, কিন্তু যাঁহার দ্বারা বাক্যের প্রকাশ হয়, আপনি তাঁহার আরাধনা করুন, যাঁহাকে মনের দ্বারা চিন্তা করা যায় না, কিন্তু যাঁহার দ্বারা মন চিন্তা করিতে পারে, আপনি তাঁহারই আরাধনা করুন, যাঁহাকে চক্ষুর দ্বারা দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু যাঁহার দ্বারা চক্ষু দেখিতে পায়, আপনি তাঁহাকেই চিন্তা করুন, যাঁহাকে কর্ণের দ্বারা শুনিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু যাঁহার দ্বারা কর্ণ শুনিতে পায়, আপনি তাঁহাকেই আরাধনা করুন, আপনার কামনা সিদ্ধ হইবে।' মায়াদেবীর উপদেশ শুনিয়া রাজার জ্ঞান জন্মে এবং তাহার পর হইতেই তিনি পরব্রহ্মের অর্চনায় নিযুক্ত হন।

ভগবান্ সততই ভক্তের বাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া থাকেন। এক দিবস মায়াদেবী তাঁহার প্রমোদগৃহের শীর্ষদেশে সখীসহ কথোপকথন করিতে করিতে নিদ্রিতা হইয়া পড়েন এবং তদবস্থায় এইরূপে এক অপূর্ব স্বপ্ন দর্শন করেন,—'একটি শ্বেতবর্ণের ষড়্দন্তবিশিষ্ট সুন্দর হস্তী শ্বেতপদ্ম শুণ্ডে ধারণ করিয়া অতি ধীরে, তাঁহার কুক্ষি ভেদ করিয়া উদর-মধ্যে প্রবেশ করিতেছে।' রাণীর নিদ্রাভঙ্গ হইলে, তিনি অতিমাত্র পুলকিতা হইয়া আপন স্বপ্ন-বৃত্তান্ত রাজার নিকট জ্ঞাপন করেন। মহারাজ তৎক্ষণাৎ জ্যোতির্বিদ্দিগকে আহ্বান করেন। জ্যোতির্বিদ্গণ স্বপ্ন-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বলিলেন, 'মহারাজ! এক মহাপুরুষ মায়াদেবীর গর্ভে আপনার পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিবেন।' বৃদ্ধ বয়সে সন্তান সম্ভাবিত হইবে বলিয়া, রাজা ও রাজমহিষী অতিশয় আনন্দিত হন।

যথাসময়ে মায়াদেবী অন্তঃসত্ত্বা হইয়া ক্রমে পূর্ণগর্ভা হন। একদিবস মায়াদেবী স্বামীর নিকট পিতৃগৃহে গমনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। রাজা অন্তঃর্বত্নী পত্নীর অভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্য সতত ব্যস্ত থাকিতেন, সুতরাং তাঁহার অনিচ্ছাসত্ত্বেও তিনি তাহাতে সম্মতি প্রদান করেন। যাহাতে শুভদিনে এবং শুভক্ষণে যাত্রা হয়, তাহার জন্য মহারাজ শুদ্ধোদন দৈবজ্ঞদিগকে আহ্বান করেন। দৈবজ্ঞেরা শুভদিন ধার্য করিয়া দিলে, মায়াদেবী সেই দিবস পিতৃগৃহোদ্দেশে যাত্রা করেন। মায়াদেবী প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখিতে অতিশয় ভালবাসিতেন। যে সময়ে তিনি লুম্বিনী নামক উপবনের পার্শ্বদেশ দিয়া গমন করিতেছিলেন, সেই সময়ে তিনি ঐ উপবনের সৌন্দর্যদর্শনে মুগ্ধ হইয়া সেই স্থানে অবতরণ করেন। ঐ উপবনের মধ্যে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া, যখন তিনি ক্লান্তদেহে প্লক্ষ-তরুমূলে বিশ্রাম করিতেছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার গর্ভবেদনা উপস্থিত হয়। ক্রমে তিনি ঐ তরুমূলে, বসন্তকালে শুক্লপক্ষের পূর্ণিমাতিথিতে সুলক্ষণযুক্ত এক পুত্ররত্ন প্রসব করেন। মহারাজ এই সুসংবাদ শ্রবণমাত্র প্রসূতি ও নবপ্রসূতিকে ঐ উপবন হইতে আপন গৃহে আনয়ন করেন। পদ্মহীন সরোবর, গন্ধহীন পুষ্প, পুষ্প-হীন উদ্যান, ফলশূন্য বৃক্ষ এবং সতীত্ব-বিহীনা রমণী যেমন শোভাশূন্য দেখায়, সেইরূপ সন্তানবিহীন রাজগৃহ এতদিন অন্ধকারাচ্ছন্ন শ্মশানবৎ ছিল, আজ নবপ্রসূত শিশুর আগমনে তাহা মধুময় হইয়া উঠিল।*

মহারাজ শুদ্ধোদন পুত্রের মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করিয়া আনন্দিত হইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু শীঘ্রই তাঁহার হৃদয়ে বিষাদের রেখা পতিত হইয়াছিল। মায়াদেবী সন্তান প্রসব করিবার সপ্তম দিবস পরে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। নবপ্রসূত শিশু শশিকলার ন্যায় দিন দিন পরিবর্ধিত হইতে থাকে। মহারাজ পুত্রের অন্নপ্রাশন এবং নামকরণ-ক্রিয়া মহাসমারোহে সম্পন্ন করেন। শিশু জাতমাত্রে রাজ্ঞী এবং রাজার সর্বকামনা সিদ্ধ হইয়াছিল বলিয়া শুদ্ধোদন পুত্রের নাম 'সর্বার্থসিদ্ধ' রাখেন।

সিদ্ধার্থ অলৌকিক বুদ্ধিবলে অতি অল্পকালের মধ্যেই সকল বিদ্যায় বিলক্ষণ পারদর্শী হইয়া উঠেন। তিনি অপরাপর বালকের ন্যায় ক্রীড়া কৌতুকে আসক্ত থাকিতেন না, সময় পাইলেই তিনি নির্জন স্থানে যাইয়া ঈশ্বর-চিন্তায় মগ্ন থাকিতেন। একদিবস সিদ্ধার্থ আপন বন্ধুগণসহ গ্রাম্য ভূমি দেখিবার জন্য গমন করিয়াছিলেন। পথিমধ্যে তিনি নির্জন স্থানে একটি উদ্যান দেখিতে পাইয়া সঙ্গীদিগকে পরিত্যাগ করেন ও

* এই ঘটনা যীশুখ্রীষ্ট জন্মাইবার প্রায় ৬২৩ বৎসর পূর্বে ঘটিয়াছিল

উদ্যানমধ্যে প্রবেশ করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে থাকেন। পরে তিনি পরিশ্রান্ত হইয়া ক্লান্তি দূর করিবার জন্য একটি সুন্দর বৃক্ষের তলদেশে আসিয়া উপবেশন করেন। চিন্তা, সিদ্ধার্থের চিত্তকে নির্জনে পাইয়া ঈশ্বরপ্রেমে মুগ্ধ হইতে উপদেশ দেন। চিন্তার উপদেশানুসারে তিনি ঈশ্বরপ্রেমে বিমুগ্ধ হইয়া বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া পড়েন। এদিকে রাজা শুদ্ধোদন কুমারকে দেখিতে না পাইয়া অতিশয় উৎকণ্ঠিত হন ও তাঁহার অনুসন্ধানার্থ বহুসংখ্যক লোক প্রেরণ করেন। ঐ সকল ব্যক্তিদিগের মধ্যে এক ব্যক্তি কুমারের সন্ধান পাইয়া মহারাজসমীপে সকল বিষয় অবগত করেন। রাজা উদ্যান-মধ্যে আসিয়া কুমারকে তাদৃশ অবস্থায় দেখিয়া অতিশয় আশ্চর্যান্বিত হন। বহুলোকের সমাগমে এবং কোলাহলে কুমারের ধ্যানভঙ্গ হইলে, তিনি পিতাকে নিকটস্থ দেখিয়া কিছু লজ্জিত হন ও তাঁহার সহিত বাটী প্রত্যাগমন করেন।

বিবাহ

যৌবনাবস্থার প্রারম্ভে পুত্রের ঈদৃশ অবস্থা সংসার-বৈরাগ্যের হেতুভূত মনে করিয়া, শুদ্ধোদন অচিরে তাঁহাকে পরিণয়পাশে বদ্ধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হন। বিবাহ বিষয়ে কুমারের মতামত জানিবার জন্য শুদ্ধোদন প্রধান মন্ত্রীকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করেন। স্থিরচিত্ত সিদ্ধার্থ সপ্তম দিবসে উত্তর দিবেন বলিয়া মন্ত্রীকে বিদায় দেন। বিবাহ করা উচিত কি না, এই বিষয় লইয়া তিনি ছয় দিবসকাল আন্দোলন করেন। পরে এইরূপ স্থির করেন যে, অরণ্যবাসী হইয়া ধর্মপালন করা অতি সহজ, কিন্তু সংসারাশ্রমে থাকিয়া, শত শত পাপময় প্রলোভনের হস্ত হইতে আপনাকে রক্ষা করিয়া ধর্ম-কর্মপরায়ণ হওয়া অত্যন্ত কঠিন। কঠিন হইলেও গৃহী হইয়া আমাকে ধর্মপালন করিতে হইবে, সুতরাং আমার বিবাহ করা উচিত। সিদ্ধার্থ সপ্তম দিবসে বিবাহে সম্মতি জানাইয়া মন্ত্রীকে বলেন, 'ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র যে কোন জাতীয় কন্যা হউক না কেন, যিনি বিবিধগুণে বিভূষিতা, তাঁহাকেই আমি বিবাহ করিব। যে কন্যা গুণে, সত্যে এবং ধর্মে শ্রেষ্ঠা, সেই কন্যা আমার মনোনীতা। যে কন্যা ঈর্ষাদি গুণযুক্ত নহে, সদা সত্যবাদিনী, রূপ-যৌবনে শ্রেষ্ঠা হইয়াও রূপে অগর্বিতা, পিতা মাতা আত্মীয়-স্বজনের প্রতি স্নেহান্বিতা, দানশীলা, যে শঠতা, ছলনা ও রুক্ষবাক্য জানে না, সদা সংযতেন্দ্রিয়া এবং দাম্ভিকা, উদ্ধতা বা প্রগলভা নহে, যে কল্পনা জানে না, তোষামদও করে না, যে লজ্জাবতী, ধার্মিকা ও শাস্ত্রজ্ঞা, এরূপ পাত্রী হওয়া আবশ্যক। আমি ঐরূপ পাত্রীকেই বিবাহ করিব।'

মন্ত্রী সিদ্ধার্থের অভিপ্রায় অবগত হইয়া রাজার নিকট ব্যক্ত করেন। মহারাজ শুদ্ধোদন পুত্রের বিবাহ করিতে মত আছে শুনিয়া, কুমারের উপদেশমত পাত্রী অনুসন্ধানার্থ কুলজীব্রাহ্মণদিগকে নিযুক্ত করেন। ঐ সকল ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে এক ব্যক্তি প্রত্যাগমন করিয়া মহারাজের নিকট নিবেদন করেন যে, 'মহারাজ! আমি কুমারের অনুরূপ কন্যা দেখিয়াছি, ইনি দণ্ডপাণি শাক্যের তনয়া।' অন্যান্য ব্রাহ্মণেরাও ঐরূপ কেহ দুইটি, কেহ তিনটি পাত্রীর সন্ধান লইয়া মহারাজের সমীপে যথাযথ নিবেদন করিতে লাগিল। সকল ব্রাহ্মণই আপনাপন সংসূচিত পাত্রীর গুণ-গরিমা প্রকাশ করিতে থাকায়, মন্ত্রী ব্রাহ্মণদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'দেখুন, আমার ইচ্ছা, কুমার আপনি গুণবতী কন্যা মনোনীত করেন; অতএব এই কার্য

সম্পাদনের জন্য একটি উপায় অবলম্বন করা যাউক। সুবর্ণ, রজত, বৈদূর্য এবং বিবিধ রত্নময় অশোকভাণ্ড, কুমার আমন্ত্রিত কুমারীগণকে অর্পণ করুন। সেই সকল কুমারীর মধ্যে যাহার প্রতি কুমারের দৃষ্টি পড়িবে, তাহাকেই তাহার জন্য বরণ করা যাইবে।' মহারাজ শুদ্ধোদন এইরূপ প্রস্তাব যথার্থ বিবেচনা করিয়া, রাজ্য মধ্যে এইরূপ ঘোষণা করিয়া দেন যে, অদ্য হইতে সপ্তম দিবস পরে কুমার সিদ্ধার্থ আমন্ত্রিত কুমারীদিগকে অশোকভাণ্ড বিতরণ করিবেন। সমুদয় কুমারী যেন সংস্থাগারে উপস্থিত থাকেন। নির্দিষ্ট দিন সমাগত হইলে, কুমার সংস্থাগারে রত্ন-সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া অশোকভাণ্ড বিতরণ করেন। ঐ সময়ে কুমারের মনের ভাব অবগতির জন্য মহারাজ তথায় একজন গুপ্তচর রাখিয়া দেন। অশোকভাণ্ড বিতরণ আরম্ভ হইলে কুমারীদিগের মধ্যে এক একজন করিয়া সিদ্ধার্থের নিকট আসিতে লাগিলেন, এবং তাঁহাদের প্রধানা সহচরী—রূপ, গুণ, বংশমর্যাদা প্রভৃতির বিশেষ পরিচয় দিতে লাগিল। পরিচয় দেওয়া শেষ হইলে অশোকভাণ্ড প্রদত্ত হইতে লাগিল।

সমুদয় অশোকভাণ্ড বিতরণ শেষ হইয়াছে, এরূপ সময়ে দণ্ডপাণির কন্যা গোপা কুমার-সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া অশোকভাণ্ড প্রার্থনা করেন। ঐ সময়ে অশোকভাণ্ড আর না থাকায়, কুমার গোপাকে সম্বোধন করিয়া বলেন, 'সুন্দরী! তুমি সকলের শেষে আসিলে কেন?' এই কথা বলিয়া আপন বহুমূল্য অঙ্গুরীয় উন্মোচন করিয়া দেন।

পরিণয় কি অদ্ভুত ব্যাপার! ইহা বিধাতার এক অপূর্ব লীলা। কে দুই অপরিচিত হৃদয়কে সম্মিলিত, পরিচিত ও একীভূত করে, কে উভয়ের হস্তকে একত্র মিলিত করে, কে পরস্পরের নয়নকে একস্থানে সংস্থাপিত করিয়া দ্বৈতভাব বিলোপ করে, কাহার গুণে একে অপরের হৃদয়ে প্রবিষ্ট ও লুক্কায়িত হইয়া যায়, কে একের শোণিত অপরের সঙ্গে মিশাইয়া দেয়, কে উভয়কে উভয়ের সুখদুঃখভাগী করে, কে একের প্রাণ অপরের সহিত মিশাইয়া দ্রবীভূত ধাতুর মত তরল প্রেম-রসাপ্লুত করিয়া রাখে, কে ইহার তত্ত্ব বলিবে? একের নয়নজল অপরের নয়নজলে মিশিয়া নদী হয় কেন? দুই অঙ্গ এক হইয়া যায় কেন? উভয়ের দৃষ্টিতে প্রেম-রসের উদ্রেক হয় কেন, কে বলিবে? দাম্পত্য-প্রণয় অতি বিস্ময়কর! ইহা কেমন করিয়া হয় ও কেন হয়, কেহ জানে না। যাঁহার লীলা, তিনিই উভয়ের হৃদয়ে বসিয়া গোপনে কি অপূর্ব মধুর রসের সঞ্চার করেন, তাহা বুদ্ধির অতীত। চ্যুতবৃক্ষ হইতে মাধবীও বিচ্ছিন্ন হয়, বিটপী হইতেও ফল পতিত হয়, সংযুক্ত পরমাণুও বিযুক্ত হয়, কিন্তু দাম্পত্যপ্রণয়ে পরিণীত হৃদয় বিভিন্ন হয় না। তবে বিলাস-ভোগের প্রণয় ক্ষণভঙ্গুর। ইহা ব্যভিচারের নামান্তর মাত্র। দাম্পত্যপ্রণয়ে যে নরনারীর আত্মা মিলিত হয়, তাহা অতীব সুশোভন, সুন্দর এবং পবিত্রতার আকর। সিদ্ধার্থ গোপার-পবিত্র মূর্তি দর্শন করিয়া তাঁহার সহিত দাম্পত্যপ্রণয়ে অবগাহন করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। গোপা পুত্রের মনোনীতা হইয়াছে শুনিয়া, শুদ্ধোদন অত্যন্ত প্রীত হন এবং তৎক্ষণাৎ দণ্ডপাণির নিকট লোক প্রেরণ করেন। অনন্তর উভয় পক্ষের মতস্থির হইলে, ঊনবিংশ বৎসর বয়সে মহাসমারোহে গোপার সহিত সিদ্ধার্থের উদ্বাহ-ক্রিয়া সমাধা হয়।

বৈরাগ্যের উদয়

বিবাহের কয়েক বৎসর অতিবাহিত হইলে পতিপ্রাণা গোপা ভাবিয়াছিলেন যে, তিনি

স্বর্গীয় মধুরপ্রেমে এবং সেবা ও যত্নে স্বামীর চিত্তহরণ করিয়া সুখে ও শান্তিতে উভয়ের জীবন-তরী সংসার-সমুদ্রে পার করিবেন। মহারাজ শুদ্ধোদন ভাবিয়াছিলেন, পুত্রকে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত মনে ভগবানের চিন্তায় শেষজীবন অতিবাহিত করিবেন, কিন্তু জগতে জীবের সকল ইচ্ছা সম্পূর্ণ হয় না। এক দিবস নারীকণ্ঠনিঃসৃত প্রভাতী মাঙ্গলিক গানে সিদ্ধার্থের নিদ্রাভঙ্গ হয়। নিদ্রাভঙ্গের পর তিনি অতি নিবিষ্ট-চিত্তে সেই গভীর জ্ঞানপূর্ণ সুললিত গান শ্রবণ করেন। গান শুনিতে শুনিতে তাঁহার হৃদয় দ্রবীভূত হইয়া যায়, এবং মনুষ্যজীবনের ক্ষণভঙ্গুরতার বিষয় উদয় হয়। 'এই অনিত্য সংসারের মধ্যে নিশ্চয়ই কোন নিত্য পদার্থ আছে, যাহা প্রাপ্ত হইলে মানব শান্তি লাভ করিতে পারে', এইরূপ চিন্তায় সিদ্ধার্থের মন অহোরাত্র বিলোড়িত হইতে থাকে।

এক দিবস অপরাহ্ণে সিদ্ধার্থ শকটারোহণে রাজবাটীর উত্তর দ্বার দিয়া ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছেন, এরূপ সময়ে দেখিলেন, একজন বৃদ্ধ গমন করিতেছে। উহার কেশরাশি পলিত, দেহের চর্ম লোল, হস্ত পদাদি শিথিল, দন্তগুলি স্খলিত এবং দেহ অর্ধভগ্ন। সে আপনার দেহের ভার একগাছি যষ্টির উপর রাখিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে অতি কষ্টে গমন করিতেছে। উহার ঐরূপ অবস্থা দেখিয়া যুবরাজ গৌতমের মন সহসা আকুল হইয়া উঠে। তিনি সোৎসুকচিত্তে সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ছন্দক! এ কোন্ জীব? ইহা ত আমি কখনও দেখি নাই?' গৌতমের কথা শুনিয়া সারথি বিনীত-ভাবে উত্তর করে, 'যুবরাজ! ঐ ব্যক্তি স্থবির। উনি বার্ধক্য-দশায় উপস্থিত হইয়াছেন। বার্ধক্যে দেহে আর সামর্থ্য থাকে না, ইন্দ্রিয়নিচয় ক্রমে হীনবীর্য হইতে থাকে। দেহিমাত্রেই এই গতির অধীন।' সারথির মুখে ঐ সকল কথা শুনিবামাত্র সিদ্ধার্থের চিত্ত-চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। তিনি আর স্থির থাকিতে না পারিয়া ছন্দককে বলিলেন, 'উঃ, আমরা কি মূঢ়! যৌবন-মদে মত্ত হইয়া এ শরীরের পরিণাম একবারও ভাবিয়া দেখি না। আমার আর ভ্রমণে প্রয়োজন নাই, বাটী প্রত্যাবর্তন কর।' সিদ্ধার্থ গৃহে আসিয়া গাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন হন।

এই ঘটনার কয়েক দিবস পরে, সিদ্ধার্থ প্রমোদ-উদ্যানে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ছন্দক পূর্বেই কুমারের মনোভাব বুঝিতে পারিয়াছিল, সেই জন্য সে, সে দিবস সুসজ্জিত রথ রাজবাটীর দক্ষিণ তোরণাভিমুখে রাখিয়া দিয়াছিল। কুমার ঐ দক্ষিণ তোরণ দিয়া প্রমোদ-কাননে যাইবার সময় পথিমধ্যে দেখেন, এক ব্যক্তি পথিপার্শ্বে বসিয়া মুহুর্মুহুঃ বমন ও কুন্থন করিতেছে এবং পীড়ার ভীষণ যন্ত্রণায় হা-হুতাশ ও ছটফট্ করিতেছে। কুমার ঐ ব্যক্তির অবস্থা দেখিয়া ব্যথিতচিত্তে সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ছন্দক! এ ব্যক্তি ওরূপ করিতেছে কেন?' কুমারের প্রশ্ন শুনিয়া ছন্দক নম্রস্বরে উত্তর করিল, 'প্রভু! ঐ ব্যক্তি ব্যাধিগ্রস্ত হইয়াছে। ব্যাধির প্রবল প্রকোপ সহ্য করিতে অপারগ হওয়ায় ঐ ব্যক্তির এরূপ দুর্দশা। জীবের জীবন কখনও সমভাবে থাকে না, কোন-সময়ে-না-কোন-সময়ে আমাদিগকেও ঐরূপ অবস্থায় পড়িতে হইবে।' সারথির কথা শুনিয়া সিদ্ধার্থ পূর্বদিনের ন্যায় গৃহে ফিরিয়া আসেন।

অপর এক দিবস সিদ্ধার্থ শকটারোহণে রাজবাটীর পশ্চিম তোরণ দিয়া ভ্রমণে বহির্গত হন। দৈববশতঃ তিনি সে দিবস পথিমধ্যে দেখেন যে, কতকগুলি ব্যক্তি একটি বস্ত্রাবৃত মনুষ্যের মৃতদেহ বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে এবং ঐ শবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ কয়েকজন লোক উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে গমন করিতেছে। এই শোকাবহ

দৃশ্য দর্শন করিয়া সিদ্ধার্থ বাষ্পাকুললোচনে সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ছন্দক! ঐ ব্যক্তির আপাদমস্তক বস্ত্রাবৃত কেন? আর উহার সঙ্গিগণ ওরূপভাবে হাহাকার করিতেছে কেন?'

বিনয়নম্রস্বরে সারথি উত্তর করিল, 'কুমার! ঐ ব্যক্তির প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়াছে! ঐ জীবনশূন্য দেহ, অগ্নিতে দগ্ধ করিবার নিমিত্তই উহারা লইয়া যাইতেছে। এই সংসার মধ্যে উহাকে আর দেখিতে পাওয়া যাইবে না বলিয়াই, উহার আত্মীয়গণ ঐরূপ হাহাকার করিতেছে।' সারথির বাক্য শ্রবণ করিয়া সিদ্ধার্থ পুনর্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ছন্দক! এই মৃত্যু কি সকলেরই হইয়া থাকে? আর সকলেই কি এইরূপ কাঁদিয়া থাকে?' পুনর্বার সারথি বিনীতভাবে বলিল, 'কুমার! এই পাঞ্চভৌতিক দেহের ইহাই পরিণাম। বৃক্ষে ফল জন্মিলে যেমন একদিন তাহার পতন অবশ্যম্ভাবী, সেইরূপ জন্মগ্রহণ করিলে জীবের মৃত্যু অনিবার্য। তরঙ্গিণী যেমন সাগরাভিমুখে সতত ধাবিতা, জীবগণও সেইরূপ কালসাগরাভিমুখে নিয়ত অগ্রসর হইতেছে। আপনি এই কোলাহলপূর্ণ পাপ সংসারের যে দিকে নিরীক্ষণ করিবেন, সেই দিকেই কেবল ক্রন্দনের ধ্বনি শুনিতে পাইবেন। ধনীর অট্টালিকা হইতে দরিদ্রের পর্ণ কুটীর পর্যন্ত, তাপসের আশ্রম হইতে ঘোর বিষয়াসক্ত বিষয়ীর নিবাস ভূমি পর্যন্ত, বিশেষ পর্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলে, কেবল হাহাকার, ক্রন্দনের রোল শুনিতে পাইবেন। কান্না ভিন্ন সংসারে আর কিছুই নাই। বোধ হয়, কাঁদিবার জন্যই আমাদের সৃষ্টি হইয়াছে।' সিদ্ধার্থ সারথির কথা শুনিয়া, দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া, রথ প্রত্যাবর্তন করিতে বলেন। রথ প্রত্যাবর্তিত হইলে যুবরাজ চিন্তাকুলচিত্তে গৃহে আসেন। সিদ্ধার্থ ঐ দিবস তাঁহার সুকোমল শয্যায় শয়ন করিয়া ভাবিতে ভাবিতে বলিয়াছিলেন, 'কাল! এ মহাশক্তি তুমি কোথায় পাইলে? যে দিকে দৃষ্টিপাত করি, সেই দিকেই তুমি! যে তোমার আবর্তে পড়িয়াছে, তাহাকেই ডুবাইয়াছ। এই যে সুকুমার শিশু মৃদু মৃদু হাসিয়া খেলা করিতেছে, কে বলিতে পারে যে, কিছুদিন পরে তুমিই ঐ আনন্দ-বিস্ফারিত কোমল চক্ষু দুইটিতে দুঃখের জলপ্রপাত উৎপন্ন করিবে না? অথবা ততদিন অপেক্ষা নাও করিতে পার। কাল! এ সংসারে তোমার শাসন হইতে কি কেহই মুক্ত নহে?'

অপর এক দিবস সিদ্ধার্থ রথারোহণে রাজবাটীর পূর্ব-তোরণ দিয়া ভ্রমণে বহির্গত হন। কিছুদূর অগ্রসর হইলে, একজন সন্ন্যাসী তাঁহার নয়নপথে পতিত হন। তাঁহার সৌম্য মূর্তি, সর্বাঙ্গ বিভূতি-ভূষিত, মস্তকে জটাকলাপ, হস্তে কমণ্ডলু এবং ধর্ম-চিন্তায় আসক্তি দেখিয়া সিদ্ধার্থ সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ছন্দক! ইনি কে?' ছন্দক অতি বিনীতভাবে বলিল, 'কুমার! ইনি সন্ন্যাসী। ইনি আত্মীয়বর্গ, গৃহ ও বিষয়-বাসনা পরিহার করিয়া ধর্ম-চিন্তায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। জগতের যাবতীয় মনুষ্যই ইঁহার আত্মীয় এবং ভিক্ষাই ইঁহার জীবিকা।'

ছন্দকের কথা শুনিয়া সিদ্ধার্থ আনন্দপূর্ণস্বরে বলেন, এত দিনে জানিলাম, ঐ সন্ন্যাসীর মতো হইতে পারিলে সংসারে সংসারে যথার্থ সুখী হওয়া যায়। রাজ্যভোগে চিত্তের শান্তি-সম্পাদন করা যায় না। ছন্দক! রথ প্রত্যাবর্তন কর। আর আমার ভ্রমণে ইচ্ছা নাই।' রথ প্রত্যাবর্তিত হইলে, সিদ্ধার্থ গৃহে আসিয়া শয়ন করেন! তাঁহার চিত্ত নানাবিধ চিন্তায় আলোড়িত হইতে থাকে। তিনি এইরূপ চিন্তা করেন,

'যদিও প্রফুল্লকুসুমসদৃশ নির্মল পুত্রমুখ, পরমেশ্বরের পবিত্রতা ও আনন্দমূর্তি স্মরণ করাইয়া দেয়, যদিও প্রেমময়ী প্রাণ-প্রতিমা সহধর্মিণীর বিশুদ্ধ প্রেমযোগ, পরম পিতা ঈশ্বরের যোগানন্দের আভাসস্বরূপ হয়, কিন্তু আসক্তি পরিত্যাগ না করিলে এ সকল সৌন্দর্য বুঝিতে পারা যায় না। তাই সংসারের অধিকাংশ মনুষ্যই ইন্দ্রিয়-উপভোগের নিমিত্ত স্ত্রী-পুত্রের সেবা করিয়া শোকতাপে দগ্ধীভূত হয়। যখন সংসারের সকল পদার্থই অনিত্য অস্থায়ী, কেহই চিরসঙ্গী নয়, তখন শরীরের স্ফূর্তি, পরিচ্ছদের গর্ব, সৌন্দর্যের মমতা এবং বিদ্যার অহঙ্কার করি কেন? পৃথিবীর সমুদয় ধার্মিক ও মহাপুরুষেরাই সংসারের অনিত্যতা চিন্তা করিয়া ধর্মপথে অগ্রসর হইতে পারিয়াছিলেন। আমিও ধর্মপথের পথিক হইব। প্রত্যহই অসংখ্য মানব জরাব্যাধিপ্রপীড়িত হইয়া মৃত্যুর করাল গ্রাসে প্রবিষ্ট হইতেছে। এই জরাব্যাধি ও মৃত্যুর করালগ্রাস হইতে উদ্ধার পাইবার অবশ্যই কোন উপায় আছে, আমাকে সেই অজ্ঞাত উপায়োদ্ভাবনের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে হইবে।'

সিদ্ধার্থ এইরূপ চিন্তা করিয়া সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করাই স্থিরসিদ্ধান্ত করেন, কিন্তু পিতার এবং স্ত্রীর অজ্ঞাতসারে গৃহত্যাগ করিলে পিতার এবং স্ত্রীর করুণ-প্রাণে দারুণ শেল বিদ্ধ হইবে, এই ভাবিয়া তিনি আপনার এই কঠোর অভিপ্রায় পিতা ও সহধর্মিণীর নিকট ব্যক্ত করেন। পুত্রবৎসল মহারাজ শুদ্ধোদন পুত্রের এই হৃদয় বিদারক প্রস্তাব শুনিবামাত্র, তাঁহার বাক্‌রোধ হইয়া যায়, তাঁহার আর কথা কহিবার শক্তি থাকে নাই। বহুক্ষণ পরে তিনি পুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলেন, 'বৎস! সংসার-ত্যাগে তোমার কি প্রয়োজন, তোমার কিসের দুঃখ, সংসারে তোমার কিসের অভাব, তুমি অতুল ঐশ্বর্যের অধীশ্বর, শত শত কলকণ্ঠা রমণী, গীতধ্বনিতে, বীণার মধুর বাদ্যধ্বনিতে তোমার চিত্ত-বিনোদনের জন্য ব্যস্ত রহিয়াছে। শত সহস্র দাসদাসী তোমার আজ্ঞাপালনে নিযুক্ত, গুণবতী রূপবতী গোপা তোমার জীবনের সহচরী, তবে তুমি কেন কি দুঃখে সংসার ছাড়িয়া বনে গমন করিবে? আমি তোমাকে পাইয়া হস্তে স্বর্গলাভ করিয়াছি, তোমাকে পাইয়া আমি প্রাণসমা পত্নীর মৃত্যু-শোক বিস্মৃত হইয়াছি, তুমিই আমার সর্বস্ব ধন, তুমি যদি আমায় ছাড়িয়া যাও, তাহা হইলে আমি কখনই প্রাণে বাঁচিব না।' এই বলিতে বলিতে মহারাজের বাক্‌রোধ হইয়া যায়। সিদ্ধার্থ পিতার কাতরোক্তি শুনিয়া কিয়ৎক্ষণ অশ্রুবিসর্জন করেন, পরে তিনি পিতাকে সান্ত্বনা করিয়া বলেন, 'পিতঃ! আপনি আমাকে ব্যাধি ও মৃত্যু ইহাদিগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ করিতে পারিলে, আমি কখনই সংসার পরিত্যাগ করিব না।' পুত্রের কথা শুনিয়া মহারাজ শুদ্ধোদন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া বলেন, 'বৎস! প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন করিবার ক্ষমতা কাহার আছে? মহা মহা যোগী কঠোর তপস্যা করিয়াও জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা পান নাই। তাঁহারাও, প্রলোভনময় সংসার, মনুষ্যের ধর্মসাধনের প্রতিকূল মনে করিয়া, কোলাহলশূন্য নির্জন গিরিকন্দর ও বৃক্ষরাজি-সমাকুল অরণ্যে সাধনা করিয়াছিলেন, কিন্তু মৃত্যুর নিকট কি পরিত্রাণ পাইয়াছিলেন? বৎস! আমার কথা রাখ, আমায় পরিত্যাগ করিও না।' পিতার উপদেশ-বাক্য শ্রবণ করিয়া সিদ্ধার্থ বলিয়াছিলেন, 'পিতঃ! এই পরিবর্তনশীল অনিত্য সংসারের ঘটনাবলী আমি যখন চিন্তা করিতে আরম্ভ করি, বাহিরের কোলাহল ও উদ্‌ভ্রান্ত ভাব পরিত্যাগ করিয়া শান্ত ও ধীরভাবে আপনার আত্মার ভিতরে অবতরণ করিয়া সাংসারিক বিষয়

যখন ভাবনা করি, তখন স্বভাবতঃ প্রাণে এই প্রশ্ন হয়,—এই অস্থায়ী জগতে স্থায়ী কি? আমার চিরদিনের সঙ্গী নিজস্ব পদার্থ কি? আমার অপরিবর্তনীয় নিত্য আনন্দ প্রস্রবণ কোথায়? তখন পুত্র, কলত্র, আত্মীয়, বান্ধব ও সংসারের সৌভাগ্য, আমার অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হয়। এই আত্ম-চিন্তা হৃদয়ে জাগ্রত হইলেই আসক্তির বন্ধন ছিঁড়িয়া যায়—সংসার-মায়া শিথিল হয়। সংসারের অনিত্যতা-চিন্তাই ধর্মের অঙ্কুর। ভগ্ন অট্টালিকাবাসী যেমন অট্টালিকার পতনোন্মুখ অবস্থা দেখিয়া, সত্বর তাহা পরিত্যাগ করিয়া নিরাপদ স্থানে আশ্রয় অন্বেষণ করে, ধর্মপিপাসু মানব সেইরূপ জরামরণসঙ্কুল সংসারের অস্থায়িত্ব চিন্তা করিয়া প্রাণপণে তাহা পরিত্যাগ করেন। আপনি আমায় অনুমতি করুন, আমি চিরানন্দময়, চিরসুখময়, শোকতাপ-জরামরণশূন্য অমৃতধামের দিকে অগ্রসর হই।' মহারাজ শুদ্ধোদন পুত্রের সঙ্কল্প দৃঢ় জানিয়া, শোকবিদগ্ধ হৃদয়ে সাশ্রুনয়নে পুত্রকে উদাসীন হইতে অনুমতি দেন। গোপা প্রেমপূর্ণবচনে কত বুঝাইয়াছিলেন, অশ্রুধারায় ধরাতল সিক্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি কাহারও মমতায় বিমুগ্ধ হন নাই।

এই ঘটনার কিছুদিন পূর্বে সিদ্ধার্থের একমাত্র পুত্র রাহুল জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পাছে পুত্রের উপর অধিক মমতা জন্মাইয়া আপনার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়, এই ভয়ে ভীত হইয়া তিনি সেই দিবস প্রশান্ত গভীর রজনীযোগে গৃহ পরিত্যাগ করিতে মনস্থ করেন। রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইলে সিদ্ধার্থ আপনার শয্যা পরিত্যাগ করিয়া নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে পত্নীর নিকট গমন করেন। তিনি যাইয়া দেখেন, দুগ্ধফেননিভ শয্যায় গোপা গাঢ় নিদ্রায় অভিভূতা, বামপার্শ্বে নবকুমার রাহুল নিদ্রিত। সিদ্ধার্থ কিয়ৎক্ষণ অনিমেষলোচনে নবকুমারের স্বর্গীয় মাধুরীপূর্ণ বদন নিরীক্ষণ করিয়া বলিয়াছিলেন, 'এই শিশু যাঁহার অলৌকিক মাধুর্যের অস্ফুট প্রতিবিম্বমাত্র, না জানি, তিনি কতই মনোহর।' ঐরূপ গোপার বিষয়ও কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করেন, তৎপরে একবার মাতাপিতার চরণোদ্দেশে প্রণাম করিয়া মনে মনে তাঁহাদের নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্বক, ছন্দক ব্যতীত অন্য সকলের অজ্ঞাতসারে, ঊনত্রিশ বৎসর বয়সে তিনি নিত্য পদার্থের অন্বেষণে অনিত্যসংসার পরিত্যাগ করেন। ইনি কয়েক ঘণ্টা কাল অবিশ্রামগতিতে অশ্বচালনা করিয়া সূর্যোদয়ের পূর্বে অনোমা নদীতীরে আসিয়া উপস্থিত হন ও তথায় অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া মণিকাখচিত আপন অঙ্গের আভরণাদি ছন্দকের হস্তে অর্পণ করেন। 'তুমি আমার বৃদ্ধ মাতাপিতার শোকাপনোদন করিও', এই কথা বলিয়া সিদ্ধার্থ তাঁহাকে তথা হইতে বিদায় দেন। যে স্থানে সিদ্ধার্থ ছন্দককে বিদায় দিয়াছিলেন, সেই স্থানকে অদ্যাবধি 'ছন্দকনিবর্তক' বলে এবং সেই স্থানে না কি আজিও এক চৈত্য দেখিতে পাওয়া যায়। বিখ্যাত চীন পর্যটক ফা-হিয়ন বলেন, 'আমি যখন কুশী* নগরাভিমুখে যাত্রা করিতেছিলাম, তখন পথিমধ্যে একটি নিবিড়-ঘন-সন্নিবিষ্ট বিটপি-পরিবেষ্টিত কাননের প্রান্তভাগে এক কীর্তিস্তম্ভ দর্শন করি।'

ছন্দক প্রস্থান করিলে সিদ্ধার্থ নিষ্কণ্টক হন। তিনি তথায় আপনার হস্তস্থিত তরবারির দ্বারা আপন মস্তকের ভ্রমরসদৃশ কৃষ্ণবর্ণ সুচারু কেশরাশি কর্তন করিয়া

---

* কুশীনগর বর্তমান গোরক্ষপুরের পূর্ব-দক্ষিণ ভাগে পঞ্চাশ ক্রোশ অন্তরে স্থাপিত ছিল।

ফেলেন। এইরূপ অবস্থায় তিনি কিয়দ্দূর গমন করিলে, এক ব্যাধের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তিনি ঐ ব্যাধকে আপনার পরিধেয় বস্ত্র প্রদান করিয়া তাহার পরিধেয় বস্ত্র পরিধান করেন। উঃ, কি ভয়ানক পরিবর্তন! সূর্যোদয়েব পূর্বে যিনি রাজ-রাজেশ্বর ছিলেন, সাধারণের মঙ্গলের জন্য, সাধারণের মুক্তির জন্য, আপন ইচ্ছায় আজ তিনি পথের কাঙ্গাল হইলেন। পিতাব অতুল বৈভব, রাজ্য, ঐশ্বর্য, রূপে গুণে অতুলনীয়া যুবতী ভার্যা এবং নবজাত পুত্র, ঐ সকল পশ্চাতে রাখিযা, সংসারের সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া তিনি সন্ন্যাসধর্ম অবলম্বন করেন।

সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ ও সাধনা

সিদ্ধার্থ দরিদ্রবেশে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে বৈশালী* নগরে আসিয়া উপস্থিত হন। তথায় তিনি অড়ার পণ্ডিতের নিকট হিন্দুশাস্ত্রাদি পাঠ করেন। সেখানে তাঁহার আকাঙ্ক্ষা পরিপূর্ণ না হওয়ায, তিনি রাজগৃহে** গমন করিযা রুদ্রক নামক জনৈক ঋষির শিষ্য হন। ঐ সময়ে রাজগৃহ মগধেশ্বর বিম্বসারের বাজধানী ছিল।

সিদ্ধার্থ অড়ার ও রুদ্রকের নিকট শাস্ত্র ও যোগ-প্রণালী শিক্ষা করিয়া কোণ্ডান্য, বাপা, ভদ্রায, মহানামা ও অশ্বজিৎ নামক পঞ্চজন শিষ্যসহ গযা জেলাস্থ উরুবিল্ব গ্রামে আসেন। সিদ্ধার্থ এই স্থানের অপূর্ব শোভা সন্দর্শন করিযা মোহিত হন এবং শান্তিপূর্ণ স্থান তপস্যাব অনুকূল মনে করিয়া জনকোলাহলশূন্য নৈরঞ্জন নদী-তীরে

* বিশালবদরী, এক্ষণে যাহা হরিদ্বারের উত্তর-পূর্বাংশে বদরিকাশ্রম বলিয়া প্রসিদ্ধ, তন্নিকটবর্তী নগরের নাম বৈশালী, কিন্তু কানিংহাম সাহেব তাঁহাব প্রাচীন ভারতবর্ষের ভুগোলে লিখিয়াছেন, বৈশালী পাটলীপুত্রের (পাটনার) উত্তরে স্থাপিত ছিল। তিনি আধুনিক বিসার নামক স্থানকে 'বৈশালী' বলিযা স্থির করিয়াছেন। আমি এই বিষয়ের যথাসাধ্য অনুসন্ধান করিয়া কানিংহাম সাহেবের মতেরই পোষকতা করিলাম।

* অতি পূর্বকালে রাজগৃহ জরাসন্ধের রাজধানী ছিল, জরাসন্ধের জন্মবৃত্তান্ত অতীব আশ্চর্যজনক। তিনি মগধের একজন প্রবল পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। জরাসন্ধের পিতার নাম বৃহদ্রথ। তিনি কাশীরাজের যমজ কন্যাদ্বয়কে বিবাহ করিয়াছিলেন ও তাঁহাদের সহিত নির্জনে এইরূপ নিযম করিয়াছিলেন যে, তোমাদের উভয়ের প্রতি আমি সমভাবে অনুরক্ত থাকিব, কদাচ বৈষম্যাচরণ করিব না। ঐ রাজা পত্নীদ্বয়ের সহিত সুখে কালাতিপাত করিতে থাকেন বটে, কিন্তু অনেক যজ্ঞ হোম করিয়াও কোনরূপে পুত্র-সন্তান জন্মিল না দেখিযা, তিনি সর্বদা শোক-সাগরে নিমগ্ন থাকিতেন। একদা যজ্ঞকৌশিক নামক জনৈক মুনি অকস্মাৎ আগমনপূর্বক এক বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট আছেন শ্রবণ করিয়া, রাজা বৃহদ্রথ তাঁহার নিকট উপস্থিত হন ও মুনিজনসমুচিত নানাবিধ উৎকৃষ্ট দ্রব্য প্রদান করিয়া মুনিবরকে পরিতুষ্ট করেন। যজ্ঞকৌশিক রাজার আচারণে প্রীত হইয়া তাঁহাকে একটি ফল প্রদান করেন। রাজা ঋষিকে যথোচিত অভিবাদনপূর্বক গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলে, পত্নীদ্বয় তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হন। রাজা পূর্বকৃত প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া ঋষিদত্ত ফল মহিষীদ্বয়কে সমান অংশে বিভক্ত করিয়া দেন। ঐ ফল ভক্ষণ করিয়া উভয়েই

ঘোর তপস্যায় নিমগ্ন হন। এইরূপে তিনি ছয় বৎসরকাল অতিবাহিত করেন। কথিত আছে যে, ঐ ছয় বৎসরকাল তিনি কখনও কিছু তিল, কখনও কিছু তণ্ডুল আহার করিতেন। এই ঘোরতর কঠিন তপস্যার দ্বারা তাঁহার দিব্য লাবণ্যময় দেহ কঙ্কালে পরিণত হয়। এরূপ কঠোর ব্রতে অবলম্বন করিয়াও অভিলষিত বস্তু প্রাপ্ত হইলেন না দেখিয়া, এবং এরূপ অবস্থায় আর কিছুদিন থাকিলে জীবনান্ত হইবে, উদ্দেশ্য সফল হইবে না ভাবিয়া, তিনি কিছু কিছু আহারে প্রবৃত্ত হন। উরুবিল্ব গ্রামের রমণীগণ তাঁহার আশ্রমে আসিয়া প্রায়ই তাঁহাকে দর্শন করিয়া যাইতেন। ঐ সকলের মধ্যে বলগুপ্তা, প্রিয়া, সুপ্রিয়া, উলুবিল্লিকা, সুজাতা প্রভৃতি কয়েকজন বর্ষীয়সী রমণী তাঁহার আহার যোগাইতেন। সিদ্ধার্থ ক্রমে পান-ভোজন করিতে থাকায়, তাঁহার শরীর পুনরায় সবল হইয়া উঠে। তাঁহার যে পঞ্চজন শিষ্য ছিল, তাহারা গুরুকে এইরূপে পান-ভোজন করিতে দেখিয়া অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া চলিয়া যায়।

সিদ্ধি

সিদ্ধার্থের পঞ্চজন শিষ্য তাঁহাকে অবজ্ঞা করিয়া প্রস্থান করিবার পর তিনি ভগ্নমনোরথ হইয়া পড়েন। ঐ সময়ে নানাবিধ চিন্তা আসিয়া তাঁহার হৃদয়কে অধিকার করে। রাজ্য,

গর্ভবতী হন ও যথাসময়ে দুই জনে দুই অর্ধদেহবিশিষ্ট সন্তান প্রসব করেন। উহাদের প্রত্যেকের এক চক্ষু, এক বাহু, এক চরণ, অর্ধ মুখ, অর্ধ উদর। রাজা উভয় পত্নীকে এতাদৃশ সন্তান প্রসব করিতে দেখিয়া বিশেষ মর্মাহত হন ও উহাদিগকে বনমাঝে নিক্ষেপ করিতে বলেন। ধাত্রী রাজাজ্ঞায়, ঐ অর্ধাঙ্গবিশিষ্ট সন্তান দুইটিকে বনমাঝে নিক্ষেপ করিয়া আসে।

এই ঘটনার অনতিবিলম্বে 'জরা'-নাম্নী এক রাক্ষসী বনপথে ঐ দেহখণ্ডদ্বয় দেখিয়া বহন করিয়া লইয়া যাইবার জন্যে যেমন উহা একত্র করে, অমনি অর্ধ-কলেবরদ্বয় পরস্পর সংযুক্ত হইয়া নবকুমার হইয়া যায়। রাক্ষসী রাজকুমারকে নষ্ট না করিয়া উহা রাজাকে প্রদান করে। জরা রাক্ষসী ইহাকে সন্ধি অর্থাৎ সংযোজিত করিয়াছিল বলিয়া, উহার নাম জরাসন্ধ রাখেন।

বৃহদ্রথ রাজা বানপ্রস্থ ধর্ম অবলম্বন করিয়া বনগমন করিলে, প্রবল-পরাক্রান্ত জরাসন্ধ মগধ রাজ্যে অভিষিক্ত হন, ও পরে ভীমসেন কর্তৃক সমরে নিহত হন। রাজগৃহের পাঁচপাহাড়ের উপত্যকায় যেখানে মহাবলপরাক্রান্ত জরাসন্ধ রাজার রাজধানী ছিল, এক্ষণে তাহা হিংস্রজন্তুপূর্ণ গহন-বনে পরিণত হইয়াছে।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের বক্তিয়ারপুর ষ্টেশন হইতে রাজগৃহ যাইবার সুবিধা।

রাজগৃহে কতকগুলি উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। ঐ প্রস্রবণগুলিকে কুণ্ড বলে। কুণ্ডগুলি ছোট পুষ্করিণীর ন্যায়। ঐ স্থানে যতগুলি কুণ্ড আছে, তন্মধ্যে রামকুণ্ড আশ্চর্যজনক। এই কুণ্ডে দুইটি ধারা পাশাপাশি প্রবাহিত হইতেছে, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ঐ দুইটি ধারার জল একটি উষ্ণ, অপরটি শীতল। রাজগৃহের পাহাড়সকলের উপর অনেকগুলি জৈন মন্দির আছে। জৈনেরা মাঘ মাস হইতে চৈত্র মাস পর্যন্ত দলে দলে এই স্থানে আসিয়া তাহাদের দেবতার আরাধনা করে।

ঐশ্বর্য, ধন, গৌরব, সংসারসুখ, আত্মীয়-স্বজন প্রভৃতি তাঁহার সমক্ষে আসিয়া উপস্থিত হওয়ায় এবং পিতার আন্তরিক কষ্ট, মাতার নয়নজল, প্রেমময়ী গোপার বিরহক্লিষ্ট মলিন-মুখ অন্তরে উদিত হওয়ায়, তিনি চঞ্চল হইয়া পড়েন। যদিও তিনি চঞ্চল হইয়াছিলেন, তথাপি প্রতিজ্ঞা-পালনে পশ্চাৎপদ হন নাই। তিনি ঐ প্রলোভনসমূহকে পরাজয় করিয়া উরুবিল্ব গ্রাম হইতে কিছুদূরে একটি গম্ভীর বটবৃক্ষের তলদেশে আসন রচনা করেন ও মহাযত্নে মহোৎসাহে পুনরায় কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত হন। ভক্তবৎসল দয়াময়, ভক্তকে পরীক্ষা করিয়া যখন বুঝিলেন, তাঁহার সঙ্কল্প কিছুতেই বিচলিত হইবে না, তখন তিনি তাঁহার হৃদয়ের অন্ধকার বিদূরিত করিয়া জ্ঞান জ্যোতিঃ প্রকাশ করিয়া দেন। তাঁহার সুখের নির্বাণ, দুঃখের নির্বাণ, ইন্দ্রিয়ের নির্বাণ ও ইচ্ছার নির্বাণ হয়। তিনি বৌদ্ধত্ব প্রাপ্ত হন। যে বটবৃক্ষের তলে তিনি সিদ্ধ হইয়াছিলেন, সেই বৃক্ষ বোধিদ্রুম* নামে খ্যাত হয়। সিদ্ধার্থ শাক্যবংশের শ্রেষ্ঠপদ অধিকার করিয়াছিলেন বলিয়া 'শাক্যসিংহ' এবং বৌদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া 'বুদ্ধ' এই দুই নামে অভিহিত হন।

ধর্মপ্রচার

বুদ্ধদেব স্বয়ং মুক্ত জীবনের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য-সাধনেব জন্য চেষ্টা করেন। তাঁহার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য, অজ্ঞান ব্যক্তিদিগকে মুক্তির পথ প্রদর্শন করান। তিনি সেই উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য মৃগদাব** গমন করিয়া আপনার পূর্ব পঞ্চজন শিষ্যকে নূতন ধর্মে দীক্ষিত করেন। উহাদিগকে নূতন ধর্মে দীক্ষিত হইতে দেখিয়া অপরাপর ৬০ জন ব্যক্তি তাঁহার ধর্ম গ্রহণ করে। বুদ্ধদেব প্রথমাবস্থায় শিষ্যসংখ্যা অধিক দেখিয়া প্রফুল্লান্তঃকরণে তাহাদিগকে আপন ধর্ম প্রচাব করিতে বলেন। ধর্মপ্রচার-সময়ে শিষ্যেরা বলিত যে, আত্মোৎকর্ষ-সাধনই বৌদ্ধধর্মের উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য-সাধন জন্য দয়া-বৃত্তির পরিচালনা করা আবশ্যক। সদ্দৃষ্টি, সৎসঙ্কল্প, সদ্বাক্য, সদ্ব্যবহার, সদুপায়ে জীবিকা আহরণ প্রভৃতির দ্বারা মনুষ্য ধর্মপথে অগ্রসর হইতে পারে। বৌদ্ধধর্মে জাতি-বিচার নাই। কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, কি শূদ্র সকলেরই আত্মোৎকর্ষ-সাধন জন্য একজাতি হওয়া আবশ্যক।

* এই বোধিবৃক্ষ গয়ার দক্ষিণে বুদ্ধগয়ায়, অমরসিংহের মন্দিরের পশ্চিম পার্শ্বে আজিও দেখিতে পাওয়া যায়। অমরসিংহ ৫০০ খৃষ্টাব্দে বুদ্ধগয়ার মন্দির নির্মাণ করাইয়া দেন। তাহার ভগ্নাবশেষের উপরে বর্তমান মন্দির প্রতিষ্ঠিত। বোধিবৃক্ষ এখন যাহা বর্তমান আছে, তাহা উহার শিকড় হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। বৌদ্ধপরিব্রাজকগণ ঐ বৃক্ষের পূজা করিয়া থাকেন। খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে উক্ত বোধিবৃক্ষের মূলসংযুক্ত (যে ডাল হইতে ঝুরি নামিয়াছে) একটি শাখা সিংহলের অনুরাধাপুরে নীত হইয়া প্রোথিত হয়। শুনিতে পাই, উহা নাকি আজিও বর্তমান আছে।

বুদ্ধদেব শিষ্যদিগকে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করিতে বলিয়া স্বয়ং মহারাজ বিম্বসারের নিকট আসিয়া তর্ক ও যুক্তির দ্বারা তাঁহাকে নূতন ধর্মে দীক্ষিত করেন। রাজাকে নূতন ধর্মে দীক্ষিত হইতে দেখিয়া শত শত প্রজা তাঁহার অনুসরণ করে। বুদ্ধদেব এইরূপে কত ব্যক্তির অনুরাগ ও কত ব্যক্তির বিরাগভাজন হইয়া মহোৎসাহে নব-ধর্মের নূতন তত্ত্ব ঘোষণা করিতে থাকেন। ক্রমে দেশ-বিদেশে ইঁহার নাম ব্যপ্ত হইয়া পড়ে। মহারাজ শুদ্ধোধন, পুত্র 'বুদ্ধ' অর্থাৎ দিব্যজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছেন শুনিয়া, তাঁহাকে কপিলবস্তুতে আনিবার জন্য আট জন দূত প্রেরণ করেন, কিন্তু তাঁহারা শাক্যসিংহের উপদেশের মোহিনীশক্তিতে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার নবপ্রচারিত ধর্মে দীক্ষিত হন। ঐ দূতদিগের মধ্যে সিদ্ধার্থের সংবাদ লইয়া কেহ স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন—কেহ বা তাঁহার সহিত বাস করেন। ঐ দূতদিগের মধ্যে চর্ক নামক রাজমন্ত্রী মগধ হইতে প্রত্যাগত হইয়া, মহারাজ শুদ্ধোদনকে পুত্রের কুশলসংবাদ প্রদান করিয়া এই কথা বলেন, 'মহারাজ! সিদ্ধার্থ আর রাজবাটীতে অবস্থান করিবেন না—আপনি তাঁহার বাসের জন্য একটি মঠ প্রস্তুত করাইয়া রাখুন। তিনি তিন-চারি মাসের মধ্যেই এই স্থানে আগমন করিবেন।' মন্ত্রীর কথায় তিনি ন্যগ্রোধ নামক স্থানে একটি সুরম্য মঠ নির্মাণ করিয়া রাখেন।

সিদ্ধার্থ মগধে আপন উদ্দেশ্য-সাধন করিয়া পিতার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য কপিলবস্তু নগরে যাত্রা করেন। তিনি স্বদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলে, সহস্র সহস্র ব্যক্তি তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য তথায় আসিয়া উপস্থিত হন। মহারাজ শুদ্ধোদন বহুকাল পরে পুত্র-মুখ-দর্শনে অপার আনন্দ লাভ করেন ও রাজবাটীতে পুত্রকে বসবাস করিতে বলেন, কিন্তু সিদ্ধার্থ অসম্মতি প্রকাশ করেন। সিদ্ধার্থ কপিলবস্তুতে উপস্থিত হইয়া, রাজভবনে পদার্পণ না করিয়া পিতার নির্মিত মঠে বাস করেন এবং অযাচিত দান-প্রাপ্তি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করেন।

বহুকাল পরে স্বামী দেশে আসিয়াছেন শুনিয়া গোপা স্বামীসন্দর্শনের জন্য দুই জন পরিচারিকার সহিত ন্যগ্রোধের মঠে গমন করেন। তথায় তিনি প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম স্বামীকে মুণ্ডিতমস্তকে এবং গৈরিকবসনে ভূষিত দেখিয়া, কথা বলিবেন কি, কাঁদিয়াই আকুল হন। গোপার সঙ্গিনীদ্বয়ের মধ্যে একজন সিদ্ধার্থকে সম্বোধন করিয়া বলেন, 'দেব! যে দিবস হইতে আপনি গৃহ পরিত্যাগ করিয়াছেন, সেই দিবস হইতে আপনার পত্নী এই যৌবনাবস্থায় কঠোর ব্রহ্মচর্যব্রত অবলম্বন করিয়া, অনাহারে অনিদ্রায় কোনরূপে দিনযাপন করিতেছেন। ইঁহার অনন্তক্লেশ দেখিলে পাষাণও গলিয়া যায়। অনেকেই ইঁহাকে এই কার্য হইতে নিরস্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কোন ফলোদয় হয় নাই।' বুদ্ধদেব নির্বাক হইয়া পত্নীর দুঃখ-কাহিনী শ্রবণ করেন, পরে তাঁহাকে ধর্মের অমৃত কথা শ্রবণ করাইয়া তাঁহার শোক দগ্ধ হৃদয়কে সান্ত্বনা করেন। গোপা আত্মসংযম করিলে, সিদ্ধার্থ তাঁহাকে নিজধর্মে দীক্ষিত করিয়া লন।

এক দিবস গোপা তাঁহার পুত্র রাহুলকে সুসজ্জিত করিয়া বলেন, 'বৎস রাহুল! তুমি তোমার পিতার নিকট গমন করিয়া তোমার পৈতৃক সম্পত্তির বিষয় জানিয়া আইস।' রাহুল মাতৃবাক্যানুসারে একজন পরিচারিকার সহিত রাজবাটীর নিকটস্থ ন্যগ্রোধ-মঠে গমন করেন। তিনি পিতাকে প্রণাম করিয়া বলেন, 'পিতঃ! অদ্য আমি আপনাকে সন্দর্শন করিয়া ধন্য হইলাম। পিতঃ! আমাকে পৈতৃক সম্পত্তির বিষয় বিবৃত করুন।

আমার জননী আপনার নিকট হইতে পৈতৃক-সম্পত্তির বিষয় জানিয়া লইতে বলিয়া দিয়াছেন।' বুদ্ধদেব, পুত্রের কথা শ্রবণ করিয়া তাহার সহিত তৎসময়োচিত অন্যান্য কথোপকথন দ্বারা পৈতৃক বিষয়-সম্পত্তির কথা চাপিয়া রাখিয়া দেন, কিন্তু পুত্র বারংবার পেতৃক বিত্তের কথা জিজ্ঞাসা করিতে থাকায়, তিনি সরীপুত্র নামক শিষ্যকে আহ্বান করিয়া বলেন, 'সরীপুত্র! রাহুল অতি শিশু, আমি সাধনার দ্বারা যে ধন অর্জন করিয়াছি, তাহা ইহাকে প্রদান করিলে, বালক সকলই নষ্ট করিয়া ফেলিবে। এখন ইহাকে উপদেশ প্রদান করা যাউক, পরে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেই বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করা যাইবে।' সরীপুত্র গুরুদেবের কথায় সম্মতি জানাইয়া বলেন, 'ইহা অতি উত্তম কথা।' রাহুল পিতার নিকট উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করেন। সিদ্ধার্থ প্রায় দেড় মাস কাল সেই মঠে অবস্থিতি করিয়া পিতার এবং অন্যান্য স্বদেশবাসীগণের সহিত সর্বদা ধর্মালাপে যাপন করেন, পরে ধর্ম-প্রারার্থ পুনরায় দেশ-ভ্রমণে বহির্গত হন। ঐ সময়ে আনন্দ, দেবদত্ত, উপালী ও অনিরুদ্ধ* সিদ্ধার্থের নিকট দীক্ষিত হন।

বুদ্ধদেব বৎসরের মধ্যে আটমাস দেশে দেশে পর্যটন করিয়া ধর্মপ্রচার করিতেন এবং অবশিষ্ট চারিমাস অর্থাৎ বর্ষাকালে মঠে থাকিয়া শিষ্যদিগকে উপদেশ দিতেন। যে সময়ে তিনি শ্রাবস্তী নগরের** নিকটবর্তী পূর্বারাম নামক স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময়ে কোন ধনীর কৃষ্ণা-নাম্নী পুত্রবধূর একটি শিশু-সন্তান কালের করালগ্রাসে পতিত হয়। সন্তানের প্রতি মাতার স্নেহ অত্যন্ত প্রবল। যে সময়ে স্নেহময়ী জননী পুত্রশোকে নিতান্ত অধীরা হইয়া উচ্চৈঃস্বরে সকরুণ ক্রন্দন করিতেছিলেন এবং সেই পরিবারস্থ অন্যান্য সকলের হৃদয়বিদারক উচ্চ ক্রন্দনের রোল গগনস্পর্শ করিতেছিল, ঠিক সেই সময়ে একজন ভিক্ষু*** করঙ্ক-হস্তে ঐ ধনীর দ্বারদেশে আসিয়া উপস্থিত হন। কৃষ্ণা গবাক্ষ হইতে, পরিধানে পীতবসন, হস্তে করঙ্ক ও মুণ্ডিতমস্তক সন্ন্যাসীকে দেখিয়া, ভয় ও লজ্জা পরিহারপূর্বক দ্রুতগতিতে আসিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে তাঁহার চরণযুগল জড়াইয়া ধরেন এবং বলেন, 'সাধু! আপনারা দেববলে বলীয়ান, আমার একমাত্র জীবনসর্বস্ব শিশু-সন্তানের প্রাণ, দুর্দান্ত কাল হরণ করিয়াছে, আপনি মন্ত্র বলে তাহাকে জীবিত করিয়া দিন।' কৃষ্ণার বিলাপপূর্ণ বচন শ্রবণ করিয়া ভিক্ষু তাঁহাকে বলেন, 'সাধ্বি! মরা মানুষ বাঁচাইবার ক্ষমতা এখনও আমার জন্মায় নাই। আপনি যদি আপনার মৃত সন্তান লইয়া আমার গুরুদেবের নিকট গমন করিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি আপনাকে সঞ্জীবনী ঔষধ প্রদান করিবেন।' কৃষ্ণা ভিক্ষুর কথায় আশ্বস্ত হইয়া বুদ্ধদেবের নিকট গমন করেন এবং

* শুভোদন, অমৃতোদন, ও ধৌতোদন নামে শুদ্ধোদনের অপর তিন সহোদর ভ্রাতা ছিলেন। আনন্দ ও দেবদত্ত শুভোদনের এবং অনিরুদ্ধ অমৃতোদনের পুত্র।

** শ্রাবস্তীনগর সমৃদ্ধিশালী কোশল রাজ্যের রাজধানী ছিল। প্রসন্নজিৎ নামক নরপতি এখানে রাজত্ব করিতেন। মগধ রাজ্যের অধিপতি বিম্বসার ও কোশলাধিপতি প্রসন্নজিৎ উভয়ে পরস্পরের ভগ্নীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ঘরঘরা নদীর উত্তর-তীরবর্তী অযোধ্যা প্রদেশের নাম কোশল।

*** বুদ্ধদেব শিষ্যদিগকে 'ভিক্ষু' বলিতেন এবং ভিক্ষু সমাজকে 'সংঘ' বলিতেন।

যথাযথ সমস্ত বর্ণন করিয়া ঔষধ প্রার্থনা করেন। বুদ্ধদেব কৃষ্ণাকে আশ্বস্ত করিয়া বলেন, 'বৎসে! আমি ইহার অতি উত্তম ঔষধ অবগত আছি, কিন্তু আমার একটি বস্তুর অভাব হইতেছে, যদি তুমি তাহা আনিয়া দিতে পার, তাহা হইলে তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে।' কৃষ্ণা অতি ব্যগ্রতার সহিত তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'প্রভু! সে বস্তু কি? আমার গৃহে কোন বস্তুরই অভাব নাই। স্বর্ণ, রৌপ্য, হীরক প্রভৃতি আপনি যাহা বলিবেন, আমি আপনাকে তাহাই আনিয়া দিব।'

কৃষ্ণার কথায় বুদ্ধদেব বলেন, আমার ও সকল বস্তুর আবশ্যক নাই। এক মুষ্টি সর্ষপ আনিতে পারিলেই তোমার পুত্র পুনর্জীবিত হইবে, কিন্তু একটি কথা আছে,— যে পরিবারের কখনও কাহারও মৃত্যু হইয়াছে, সেই পরিবার হইতে সর্ষপ আনিলে ঔষধের কার্য নিষ্ফল হইবে।' কৃষ্ণা বুদ্ধের উপদেশমত সর্ষপ আনিতে গমন করেন। পুত্রের জীবন পাইবার আশায়, তিনি লোকলজ্জা, মানসম্ভ্রম, সকল ভুলিয়া গিয়া পাগলিনীর ন্যায় সকল গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে, পল্লীতে পল্লীতে, নগরে নগরে, এক মুষ্টি সর্ষপের জন্য ঘুরিয়া বেড়ান. কিন্তু বুদ্ধের উপদেশমত সর্ষপ কোথাও আর সংগ্রহ করিতে পারিলেন না। তিনি যে গৃহে যাইয়া সর্ষপ প্রার্থনা করেন, গৃহবাসীরা রাশি রাশি সর্ষপ আনিয়া তাঁহাকে দেন, কিন্তু যখন তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তোমাদের গৃহে দাস, দাসী, পুত্র, পৌত্র, কুটুম্বাদির মধ্যে কাহারও কখনও মৃত্যু হইয়াছে কি না? তখন কেহ বলে, আমি সন্তান হারাইয়াছি, কেহ বলে, আমার স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে, আমার দাস-দাসী কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে। সকল গৃহেই এইরূপ শোকবার্তা শ্রবণ করিয়া বুদ্ধের আদেশানুযায়ী সর্ষপ সংগ্রহ করিতে না পারিয়া, কৃষ্ণা বিষণ্ণ-বদনে বুদ্ধেব নিকট প্রত্যাগতা হন। কৃষ্ণা বুদ্ধের নিকট আসিলে তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'বৎসে! সর্ষপ আনিযাছ?' কৃষ্ণা বিষাদিতান্তঃকরণে বলেন, 'না প্রভু! আপনার উপদেশমত সর্ষপ কোথাও পাইলাম না।' তখন তিনি তাঁহাকে বলেন, 'কাল যে কেবল তোমার পুত্রকেই হরণ করিয়াছে, তাহা নহে, এরূপ অনেক জননী তোমার মত পুত্রহীনা হইয়া শোক-সাগরে ভাসিতেছে। বৎসে! তুমি শোকতাপ পরিত্যাগ করিয়া জরাব্যাধির হাত হইতে পরিত্রাণ লাভ কর।' বুদ্ধের উপদেশ-বাক্যে কৃষ্ণা পুত্রশোক বিস্মৃত হইয়া বলেন, 'প্রভু! আমি আপনার শরণাপন্ন হইলাম।' বুদ্ধদেবও তাঁহাকে আপনার নব-প্রচারিত ধর্মে দীক্ষিত করেন।

এক দিবস বুদ্ধদেব করঙ্ক-হস্তে ভিক্ষা করিতে করিতে ভরদ্বাজ নামক একজন বণিকের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হন! ভরদ্বাজ, বুদ্ধদেবকে ভিক্ষা করিতে দেখিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া এই কয়েকটি কথা বলেন, 'ওহে শ্রমণ!* তোমার এমন হৃষ্ট-পুষ্ট নধর আকৃতি দেখিতেছি, তবে কেন তুমি ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছ? তুমি কি পরিশ্রম না করিয়া অন্যের শ্রমোপার্জিত শস্যসকল অনায়াসে লাভ করিতে চাও? তুমি কি জান না, কত কষ্টে শস্য উৎপন্ন হয়? আমরা প্রচণ্ড রৌদ্রে পুড়িয়া, প্রবল বৃষ্টিতে ভিজিয়া, ভূমি কর্ষণ ও বীজ বপন করি, তবে তাহা হইতে শস্য উৎপন্ন হয়। আমাদের এই কঠোর পরিশ্রমের অর্জিত শস্য তুমি অনায়াসে লাভ করিতে চাও! তোমার উচিত আমাদের মত পরিশ্রম করা। তোমার মত বলবান্ ব্যক্তি যদি পরিশ্রম না করিয়া ভিক্ষা

* বৌদ্ধ যোগীদিগকে শ্রমণ বলে।

করে, তাহা হইলে বিকলাঙ্গ ব্যক্তিগণ কি করিবে ? আমি তোমায় একখণ্ড ভূমি দিতেছি, তুমি তাহা কর্ষণ করিয়া শস্য উৎপন্ন কর এবং সেই শস্যের দ্বারা জীবিকানির্বাহ কর।'

বুদ্ধদেব বণিকের কথা শ্রবণ করিয়া বলেন, 'আপনার কথা সত্য, কিন্তু আমিও ভূমি কর্ষণ করিয়া থাকি, তবে আমার কর্ষণোপযোগী ভূমি, বীজ ও শস্য স্বতন্ত্র। মানবের হৃদয় আমার ভূমি, জ্ঞান আমার হল, বিনয় তাহার ফাল এবং উৎসাহ ও উদ্যম আমার বলদ। হৃদয়রূপ ভূমি কর্ষিত হইলে বিশ্বাসরূপ বীজ তাহাতে বপন করিয়া দিই। ঐ বীজ অঙ্কুরিত হইয়া নির্বাণরূপ ফসল উৎপন্ন হয়। ঐ ফসলই আমি তৃপ্তির সহিত আহার করিয়া থাকি।'

ভরদ্বাজ গোতমের* মহদর্থযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া, তাঁহার প্রতি নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগের জন্য তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং তাঁহার উপদেশাবলী শ্রবণ করিয়া তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন।

বুদ্ধদেব ধর্মপ্রচারে বহির্গত হইয়া শ্রবণ করেন, মহারাজ শুদ্ধোদন সাংঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত হইয়াছেন। এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া তিনি শিষ্যগণসহ পিতৃদর্শনে গমন করেন। যে সময়ে তিনি রাজবাটীতে আসিয়া উপস্থিত হন, সেই সময়ে মহারাজের মুমূর্ষু অবস্থা। অন্তিমকালে পুত্রমুখ দর্শন করিয়া শুদ্ধোদনের মুমূর্ষুদেহে বলসঞ্চার হয়। তিনি অন্তিম-শয্যায় শয়ন করিয়া পুত্রের মুখে ধর্মকথা শ্রবণ করিতে করিতে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। বুদ্ধদেব পিতার অন্ত্যেষ্টি-কার্য সমাধা করিয়া, আপন পুত্র রাহুল, বৈমাত্রেয় ভ্রাতা নন্দ, পিতৃস্বসা এবং শাক্যবংশীয় অন্যান্য ব্যক্তিদিগকে নিজ ধর্মে দীক্ষিত করেন। গোপাকে ইতঃপূর্বেই দীক্ষিত করিয়া গিয়াছিলেন, এক্ষণে গোপাকে পুরস্ত্রীদিগের নেত্রী করিলেন। বুদ্ধদেব শাক্যবংশীয়দিগকে নবধর্মে দীক্ষিত করিয়া, রাজগৃহাভিমুখে গমন করেন।

দেহত্যাগ

বুদ্ধদেব ৪৫ বৎসর ধর্মপ্রচার করিয়া অশীতি বৎসর বয়ঃক্রমকালে, ৫৩৪ পূঃ খৃষ্টাব্দে কুশীনগরের** কোন শালবৃক্ষের তলদেশে, উদরাময় রোগে প্রাণত্যাগ করেন। একদা তিনি তাঁহার শিষ্যগণের সহিত রাজগৃহ হইতে কুশীনগরে গমন করিতেছিলেন, হঠাৎ পথিমধ্যে উদরাময় রোগ আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করে। বুদ্ধদেব বুঝিয়াছিলেন যে, এই আক্রমণ হইতে তিনি আর রক্ষা পাইবেন না, সেই জন্য তিনি শিষ্যদিগকে অগ্রসর হইতে নিষেধ করেন। শিষ্যগণ এক সুবৃহৎ শালবৃক্ষের তলদেশে গুরুদেবের শয্যা রচনা করিয়া দিয়া তাঁহার শুশ্রূষা করেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই। তিনি

* মহারাজ শুদ্ধোদনের দ্বিতীয়া পত্নীর নাম গোতমী। মায়াদেবীর দেহান্তর হইলে, সিদ্ধার্থের লালনপালনের ভার গোতমী গ্রহণ করিয়াছিলেন। গোতমী সিদ্ধার্থকে অতিশয় স্নেহ করিতেন বলিয়া, গোতমীর সখীগণ সিদ্ধার্থকে গোতম বলিয়া আদর করিতেন। সেই অবধি সিদ্ধার্থের অপর নাম গোতম হয়।

** এই বিষয়ে দুই মত দেখিতে পাওয়া যায়। কাহারও মতে আসামের অন্তঃপাতী কুশীগ্রামে, আবার কেহ বা বারাণসী ও পাটনার মধ্যবর্তী গণ্ডক নদীতীরস্থ কুশীনগরে তাঁহার মৃত্যুস্থান নির্দেশ করেন।

ক্রমেই দুর্বল হইয়া পড়েন। বুদ্ধদেব অন্তিম সময়ে শিষ্যদিগকে আহ্বান করিয়া নিম্নলিখিত চারিটি উপদেশ প্রদান করেন ঃ—

১। হে বৎসগণ! চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা এবং জিহ্বাকে সংযত করিবে। ইন্দ্রিয়দিগকে দমন করিতে পারিলে নির্বাণ-রাজ্যে শীঘ্রই পেঁাছিতে পারিবে।

২। হে ভিক্ষুগণ! তোমরা আপনাকে আপনি জাগ্রত করিবে, আপনাকে আপনি পরীক্ষা করিবে, এইরূপে সতর্ক এবং আপনা কর্তৃক রক্ষিত হইলে, তোমরা সুখী হইবে। পাপ করিও না, সৎকার্যে রত থাকিও, অন্যের হৃদয়কে সংশোধন করিও।

৩। জলের দ্বারা কর্দম উৎপন্ন হইলে তাহা যেমন জলের দ্বারাই ধৌত হইয়া যায়, সেইরূপ মন কর্তৃক পাপ অনুষ্ঠিত হইলে, মনের দ্বারাই তাহাকে বিনষ্ট করা যায়।

৪। ছায়া যেমন মনুষ্যকে পরিত্যাগ করে না, সেইরূপ যাঁহাদের চিন্তা, বাক্য ও কার্য পবিত্র, সুখ ও শান্তি কদাপি তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করে না।

বুদ্ধদেব শিষ্যদিগকে এই চারিটি উপদেশ প্রদান করিয়া যোগাবলম্বনে দেহত্যাগ করেন। তিনি নির্বাণপ্রাপ্ত হইলে, শিষ্যগণ চন্দন-কাষ্ঠের দ্বারা চিতা সজ্জিত করিয়া ঐ অগ্রে গুরুদেবের চরণ বন্দনা করেন, পরে তাঁহার দেহ চিতার উপর শয়ন করাইয়া দেন। যিনি অতুল ঐশ্বর্যের অধিপতি হইয়া জীবের মুক্তির জন্য ঐশ্বর্য, রাজ্য, পদগৌরব প্রভৃতিকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছিলেন, তাঁহার দেহ আজ ভস্মে পরিণত হইতে চলিল শিষ্যগণ গুরুদেবের দেহ চিতার উপর তুলিয়া ভক্তিভরে তিনবার প্রদক্ষিণ করেন, পরে মহাকাশ্যপ ও অন্যান্য শিষ্যগণের অনুমতি লইয়া চিতা প্রজ্বলিত করিয়া দেন। দেখিতে দেখিতে বুদ্ধদেবের নশ্বর দেহ ভস্মে পরিণত হইয়া গেল। ভিক্ষুগণ ঐ চিতাভস্ম স্বর্ণপাত্রে করিয়া রাজগৃহ, বৈশালী, কপিলবস্তু, অলকাম্বর, রামগ্রাম, উত্থদীপ, পাওয়া এবং কুশীনগর এই আট স্থানে আনয়ন করেন। পরে উহা মৃত্তিকা-মধ্যে প্রোথিত করিয়া তদুপরি চৈত্য নির্মাণ করিয়া দেন।

বুদ্ধদেব দেহরক্ষা করিলে ক্ষেম-নামক তাঁহার একজন শিষ্য তাঁহার একটি দন্ত সংগ্রহ করিয়া কুশীনগরে লইয়া আসেন। কিছুদিন পরে তিনি ঐ দন্ত কলিঙ্গ প্রদেশের রাজা ব্রহ্মদত্তকে প্রদান করেন। ব্রহ্মদত্তের বংশধরেরা ঐ দন্ত জম্বুদ্বীপের অধিপতি পাণ্ডুকে প্রদান করেন। পাণ্ডুর মৃত্যু হইলে গুহসিংহ উহা প্রাপ্ত হন। গুহসিংহ ঐ দন্ত আপন জামাতার দ্বারা সিংহলের অধিপতি মেঘবাহনকে উপহার স্বরূপ পাঠাইয়া দেন। মেঘবাহন ঐ দন্ত কিছুকাল আপনার নিকট রাখিয়া দেন। পরে তিনি ১২৬৮ খৃষ্টাব্দে সিংহলের কাণ্ডী নামক স্থানে একটি মন্দির নির্মাণ করাইয়া মহাসমারোহে ঐ দন্ত তাহাতে প্রতিষ্ঠা করেন।

এ বিষয়ে আবার মতভেদও দেখিতে পাওয়া যায়। বৌদ্ধ-ভাষাজ্ঞ টরনার সাহেব বলেন, ১৩০৩ হইতে ১৩১৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে, পাণ্ডুদেশাধিপতি কুলশেখরের সেনাপতি, সিংহল জয় করিয়া ঐ দন্ত পাণ্ডুনগরে আনয়ন করিয়াছিলেন। এই ঘটনার পর তৃতীয় রাজা, পাণ্ডুদেশের রাজাকে পরাভূত করিয়া ঐ দন্ত পুনরায় সিংহলে আনয়ন করেন। এক্ষণে ঐ দন্ত সিংহলের কাণ্ডী নামক স্থানের মন্দিরে রক্ষিত আছে। ঐ দন্ত দেখিবার জন্য ভারত-সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ড কাণ্ডীর মন্দিরে গমন করিয়াছিলেন। অনেকে বলেন, উহা মনুষ্যের দন্ত নহে, কুম্ভীরের দন্ত।

শাক্যসিংহ রাজকুলে সমুদ্ভূত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি বৃক্ষতলে জন্মগ্রহণ,

বৃক্ষতলে বসিয়াই সন্ন্যাসধর্ম অবলম্বন ও বৃক্ষতলে বসিয়াই জীবলীলা সংবরণ করিয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতে দেহত্যাগ পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে পিতৃমাতৃভক্তি, বিভবসত্ত্বেও বৈরাগ্য, ঈশ্বরে প্রেম, নিঃস্বার্থভাবে পরোপকার, অমানুষিক ক্ষমতা, সত্য জ্যোতিঃ, কামাদি রিপু বিসর্জন প্রভৃতি সদ্‌গুণ রক্ষা করিয়া জীবের মুক্তির জন্য এক নূতন ধর্ম প্রচার করেন।

ঐ সময়ে তাঁহার প্রচারিত ধর্ম, লোকের এত হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল যে, তৎকালে অপর সকল ধর্মই নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিল। প্রায় ২৪৫০ বৎসর হইল, বুদ্ধদেব ইহলোক হইতে অন্তর্হিত হইয়াছেন, কিন্তু আজিও কোটি কোটি মানব তাঁহার প্রচারিত নির্বাণ-ধর্মের অনুসরণ করিতেছে।

বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রের উৎপত্তি

বুদ্ধদেব যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন তাঁহার মত সকল, তাঁহার শিষ্যগণের মুখে মুখে চলিয়া আসিতেছিল। তিনি পরলোকগমন করিলে তাঁহার পাঁচ শত শিষ্য রাজগৃহে সমবেত হইয়া বৌদ্ধধর্মশাস্ত্র সঙ্কলন করেন। তাঁহারা গুরুর উপদেশগুলি তিনটি প্রধান অংশে বিভক্ত করেন। প্রথম 'সূত্র' অর্থাৎ বুদ্ধদেব স্বয়ং শিষ্যদিগকে যে সকল উপদেশ দিয়াছিলেন। দ্বিতীয় 'নিয়ম' অর্থাৎ বৌদ্ধ-সমাজের শাসন-সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী। তৃতীয় 'অভিধর্ম' বা ধর্মনীতি অর্থাৎ দার্শনিক বিচার, মীমাংসা, মতামত প্রভৃতি। বৌদ্ধধর্মশাস্ত্রের এই তিন খণ্ডের নাম ত্রিপিটক।

সঙ্গীতি

বুদ্ধদেব দেহরক্ষা করিবার পর, তাঁহার শিষ্যগণ ত্রিপিটক প্রস্তুত করিবার জন্য একটি সভা করিয়াছিলেন। ধর্মপ্রচারক কাশ্যপ এই সভার সভাপতিত্ব গ্রহণ করেন। কাশ্যপ সূত্র-পিটকের, আনন্দ নিয়ম-পিটকের এবং উপালী অভিধর্ম-পিটকের সংগ্রহ-কর্তা। বৌদ্ধধর্মসভার নাম 'সঙ্গীতি'। প্রথম সঙ্গীতির এক শত বৎসর পরে বৈশালীতে দ্বিতীয় সঙ্গীতির অধিবেশন হয়। সাত শত বৌদ্ধ এই সঙ্গীতিতে উপস্থিত ছিলেন। এই এক শত বৎসরে বৌদ্ধদিগের মধ্যে অনেক বিশেষ মতবিরোধ জন্মে। বিভিন্ন মতের সামঞ্জস্য-বিধান জন্যই দ্বিতীয় সঙ্গীতির অধিবেশন হইয়াছিল, কিন্তু এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই। বৌদ্ধেরা দুইটি পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী সম্প্রদায়ে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন। শেষে ইঁহাদের মধ্যে আবার আঠারটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল হয়। অশোকের সময়ে খৃষ্টাব্দের ২৪৩ বৎসর পূর্বে পাটলীপুত্র নগরে বৌদ্ধদিগের তৃতীয় সঙ্গীতির অধিবেশন হয়। এক হাজার বৌদ্ধপুরোহিত এই সঙ্গীতিতে উপস্থিত ছিলেন। প্রতারক লোকে বৌদ্ধদিগের পবিত্র হরিদ্রাবর্ণ পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া আপনাদের কথা বুদ্ধের উপদেশ বলিয়া সাধারণ্যে প্রচার করিয়াছিল। এই সঙ্গীতিতে তৎসমুদায়ের সংশোধন হয়। খ্রীষ্ট ৪০ অব্দে কণিষ্কের রাজত্বকালে বৌদ্ধদিগের শেষ অর্থাৎ চতুর্থ সঙ্গীতির অধিবেশন হয়। ইহাতে বৌদ্ধপুরোহিতগণ সমবেত হইয়া ধর্মগ্রন্থের তিনখানি টীকা প্রস্তুত করেন।

বৌদ্ধধর্মের বহুল প্রচারের কারণ

মহারাজ অশোক ও কণিষ্কের উৎসাহে বৌদ্ধধর্মের পরিপুষ্টি ও বিস্তৃতি হয়। ২৫৭ খ্রীঃ অব্দে মগধরাজ অশোক এই ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। প্রবাদ আছে যে,

মহারাজ অশোক ৬৪০০০ চৌষট্টি হাজার বৌদ্ধ যাজকের ভরণপোষণ করিতেন এবং চুরাশী হাজার স্তম্ভ নির্মাণ করিয়া বৌদ্ধধর্মের মহিমা ঘোষণা করেন। রোম-দেশীয় সম্রাট কনস্টানটাইন খ্রীষ্টধর্মের যেরূপ সহায়তা করিতেন, বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে মহারাজ অশোক তদপেক্ষা সহস্র গুণে সহায়তা করিয়াছেন। তিনি পঞ্চবিধ উপায়ে এই উদ্দেশ্য-সাধন করিয়াছিলেন, যথা ঃ—

১। ধর্ম সম্বন্ধে মতভেদ মীমাংসার জন্য একটি রাজকীয় সভা স্থাপন। ২। অনুশাসন-পত্র দ্বারা ধর্মনীতির ব্যাখ্যা। ৩। ধর্মের বিশুদ্ধতা রক্ষার উদ্দেশে একটি রাজকীয় ধর্মবিভাগ স্থাপন। ৪। প্রচারক দ্বারা দূরদেশে বৌদ্ধমত প্রচার। ৫। নিজতত্ত্বাবধানে উপযুক্ত ব্যক্তি দ্বারা ধর্মশাস্ত্রের পরিশুদ্ধি-সাধন।

অশোকের সময়ে সিংহলে বৌদ্ধধর্মের প্রসার হইয়াছিল। ঐ সময়ে ধর্মপ্রচারকেরা সিংহল দ্বীপ হইতে ব্রহ্মদেশে গমন করেন। খ্রীঃ ৬৩৮ অব্দে শ্যামদেশবাসিগণ বৌদ্ধধর্ম পরিগ্রহ করে। ইহার কিছুকাল পূর্বে ধর্মপ্রচারকেরা ভারতবর্ষ হইতে যবদ্বীপে যাইয়া বৌদ্ধধর্মের জয়পতাকা উড্ডীন করেন। ক্রমে ধর্মপ্রচারকেরা তিব্বতে, মধ্য-এশিয়ার দক্ষিণাংশে ও চীনে গমন করেন। এদিকে পশ্চিমে কাস্পীয়সাগর ও পূর্বে কোরিয়া পর্যন্ত বৌদ্ধধর্ম প্রসারিত হয়। খ্রীঃ ৩৭২ অব্দে কোরিয়াবাসিগণ বৌদ্ধধর্ম পরিগ্রহ করে। খ্রীঃ ৫৫২ অব্দে কোরিয়ার প্রচারকেরা জাপানে যাইয়া তদ্দেশীয় অধিবাসীদিগকে আপনাদের ধর্মে দীক্ষিত করেন। প্যালেষ্টাইন, আলেকজান্দ্রিয়া, গ্রীস ও রোমেও বৌদ্ধমত প্রচারিত হইয়াছিল, এরূপ শুনিতে পাওয়া যায়।

বিভক্ত বৌদ্ধ সম্প্রদায়

বৌদ্ধগণ একমাত্র বুদ্ধদেবের উপাসক হইলেও, তাঁহাদিগের মধ্যে শ্রেণীভেদ দৃষ্ট হয়। তাঁহারা চারি সম্প্রদায়ে বিভক্ত। যথা—মাধ্যমিক, যোগাচার, সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক। মাধ্যমিকদিগের মতে সকলই শূন্য, জগতে কিছুই নাই। ইঁহাদের মীমাংসা অতি চমৎকার। জগৎ মিথ্যা—কারণ, যাহা জাগ্রদবস্থায় দৃষ্ট হয়, তাহা স্বপ্নাবস্থায় দৃষ্ট হয় না, আর স্বপ্নাবস্থায় যাহা দৃষ্ট হয়, তাহা জাগ্রদবস্থায় দৃষ্ট হয় না। ইহাতেই উঁহারা স্থির করিয়াছেন যে, জগৎ মিথ্যা।

যোগাচারীরা বাহ্যবস্তুকে অলীক ও ক্ষণিক বিবেচনা করেন। বিজ্ঞানরূপ আত্মাই উঁহাদিগের মতে সত্যরূপে প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। উক্ত বিজ্ঞান দ্বিবিধ,—প্রবৃত্তি ও আলয়। জাগ্রৎ বা সুপ্ত অবস্থায় যে জ্ঞান জন্মে, তাহা প্রবৃত্তি-বিজ্ঞান এবং সুষুপ্তি-দশায় যে জ্ঞান জন্মে, তাহাকে আলয়-বিজ্ঞান বলে। সৌত্রান্তিক মতে বাহ্যবস্তু সত্য ও অনুমান-সিদ্ধ। বৈভাষিকেরা বাহ্যবস্তুকে প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ কহে।

বৌদ্ধধর্মে মুমুক্ষু ব্যক্তিদিগের আবার চারিটি অবস্থা আছে, যথা—অর্হৎ, অনাগামী, সকৃদাগামী ও শ্রোতাপত্তি। জীবন্মুক্তদিগকে অর্হৎ বলে। যাঁহাদিগকে আর পৃথিবীতে জন্ম পরিগ্রহ করিতে হইবে না, বর্তমান দেহান্তরের সহিত নির্বাণ-ফললাভ করিবেন, তাঁহাদিগকে অনাগামী বলে। যাঁহারা এক জন্ম পরে নির্বাণ লাভ করিবেন, তাঁহাদিগকে সকৃদাগামী বলে। ধর্মজীবনের চতুর্থ অবস্থার নাম শ্রোতাপত্তি। এই অবস্থায় উপনীত হইলে, লোকে সাত জন্ম পরে নির্বাণ লাভ করে।

অর্হতেরা পাঁচ প্রকার মহাব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, যথা—অহিংসা, অস্তেয়, সুনৃত, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ। জীবাদির বিনাশ না করার নাম অহিংসা, অদত্ত বস্তু

গ্রহণ না করার নাম অস্তেয়, সত্য ও হিতকর অথচ প্রিয়কথনের নাম সুনৃত, কামক্রোধাদি পরিত্যাগের নাম ব্রহ্মচর্য এবং সকল বিষয় হইতে মোহ পরিত্যাগের নাম অপরিগ্রহ।

অর্হৎদিগের মধ্যে আবার বিভিন্ন সম্প্রদায় আছে। ইঁহাদিগের এক সম্প্রদায়ের নাম জৈন।

বুদ্ধদেবের বচন

১। অজ্ঞানের অনুগত না হইয়া জ্ঞানীর সেবা করা ও মাননীয় ব্যক্তিকে সম্ভ্রম করা পরম ধর্ম।

২। হৃদয়ে সাধু ইচ্ছা পোষণ করাই পরম ধর্ম।

৩। আত্মসংযম ও প্রিয়বচনই পরম ধর্ম।

৪। পিতামাতার সেবা করা পরম ধর্ম।

৫। স্ত্রী-পুত্রকে সুখী করা ও শাস্ত্রের অনুসরণ করাই পরম ধর্ম।

৬। পাপ-কার্য হইতে বিরত থাকা ও তৎপ্রতি ঘৃণা, মাদকদ্রব্য সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ ও সৎকার্যে পরিশ্রান্ত না হওয়াই মানবের ধর্ম।

৭। শ্রদ্ধা, বিনয়, সন্তোষ, কৃতজ্ঞতা এবং যথাসময়ে ধর্মতত্ত্ব শ্রবণ করা প্রকৃত শান্তি।

৮। কষ্টসহিষ্ণুতা ও দীনতা গ্রহণ, সাধুসঙ্গ ও ধর্ম চর্চা করা যথার্থ সুখ।

৯। জীবনের পরিবর্তন ও বিচিত্র ঘটনাবলীর মধ্যে যাঁহার চিত্ত বিচলিত না হয় এবং যে হৃদয় শোক, দুঃখ ও ইন্দ্রিয়াতীত এবং স্থির, তাঁহার ধর্ম—উচ্চ ধর্ম।

১০। প্রত্যেক বিষয়ে যাঁহারা পর্বতের ন্যায় অটল ও প্রত্যেক বিষয়ে যাঁহারা নিরাপদ, তাঁহারাই প্রকৃত সাধু।

১১। মনকে বশীভূত করা, মানবের প্রধান কার্য। কারণ, ইহা ক্ষণমুহূর্তে কোথায় দৌড়াইয়া যায় ও কোথায় গিয়া নিবৃত্ত হয়, তাহা কেহ বলিতে পারে না। অতএব, সংযতচিত্ততাই নিত্য সুখাবহ।

১২। যে ব্যক্তি মুখে সাধু ও মিষ্ট কথা বলে, অথচ তদনুরূপ কার্য করে না, তাহার সঙ্গ পরিত্যাগ করিবে।

১৩। একজন সংগ্রামে সহস্র লোককে জয় করিতে পারে, কিন্তু যে আপনাকে জয় করিয়াছে, সেই সর্বশ্রেষ্ঠ বীর।

১৪। পাপকে সামান্য লঘু জ্ঞান করা উচিত নহে। যদি কেহ মনে মনে চিন্তা করে যে, পাপ আমায় পরাস্ত করিতে পারিবে না, তবে তাহার নিতান্ত ভ্রান্তি। কারণ, কোন ভাসমান জলপাত্রের একদেশে বিন্দুমাত্র ছিদ্র থাকিলে, তাহা ক্রমে ক্রমে জলপূর্ণ হইয়া নিমগ্ন হইয়া যায়।

১৫। কখনও ধর্মের নিয়ম লঙ্ঘন করিও না। যে ব্যক্তি ধর্মের কোন এক নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিতে পারে, সে ব্যক্তি সকল পাপকার্যই করিতে সমর্থ হয়।

১৬। অক্রোধের দ্বারা ক্রোধকে জয় করিবে, সাধুভাবের দ্বারা অসাধুভাবকে জয় করিবে, সত্যের দ্বারা মিথ্যাকে জয় করিবে।

১৭। সত্য কথা, ক্ষমা ও নিঃস্ব ব্যক্তিকে দান, এই ত্রিবিধ কার্যের দ্বারা মনুষ্যদেহ প্রকীর্তি লাভ করিতে সমর্থ হয়।

১৮। জীবহিংসা, পরের দ্রব্য হরণ, মিথ্যাকথা বলা, সুরাপান করা, পরস্ত্রী হরণ, এই সকল মহাপাপ।

শঙ্করাচার্য*

কেরল** রাজ্যের অধিপতি মৃগনারায়ণ, পূর্ণা-নাম্নী নদীতীরে কয়েকটি শিবমন্দির নির্মাণ করাইয়া তাহাতে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন এবং উহাদের পূজার্চনাদির জন্য সর্বশাস্ত্রে পারদর্শী বিদ্যাধিরাজ নামক জনৈক ব্রাহ্মণকে নিযুক্ত করেন। ঐ ব্রাহ্মণের শিবগুরু নামে একটি সন্তান জন্মে। শিবগুরু শৈশবে মাতাপিতার স্নেহে প্রতিপালিত হন, পরে কৃতোপনয়ন হইলে শাস্ত্রালোচনার জন্য গুরুগৃহে বাস করেন। কিছুকাল অতিবাহিত হইলে পর, গুরুদেব শিবগুরুকে পরীক্ষা করেন। তিনি শিষ্যকে বিদ্যালাভে কৃতকৃতার্থ দেখিয়া, গার্হস্থ্যধর্ম আশ্রয় ও মাতাপিতার শুশ্রূষা করিতে আদেশ করেন। শিবগুরু গুরুর নিকট এইরূপ আদিষ্ট হওয়ায়, গুরু-দক্ষিণা প্রদানানন্তর স্বগৃহে প্রত্যাগমন করেন। পুত্র গুরুগৃহ হইতে প্রত্যাগত হইলে, বিদ্যাধিরাজ পাত্রী অন্বেষণ করিয়া শুভলগ্নে তাঁহার পরিণয়-কার্য নির্বাহ করেন। বিবাহ-কার্য সমাধা হইবার পর শিবগুরু রূপবতী, গুণবতী ও পতিব্রতা ভার্যা লাভ করিয়া দাম্পত্য-সুখসম্ভোগে কালযাপন করিতে থাকেন।

শঙ্করাচার্যের জন্ম

শিবগুরুর ভার্যার নাম সুভদ্রা। এক দিবস সুভদ্রা পতি-সন্নিধানে বসিয়া আপনার মনের কষ্ট এই বলিয়া নিবেদন করেন যে, 'স্বামিন্! আমাদের যৌবন অতীতপ্রায়, কিন্তু এখনও পুত্রমুখ দর্শন করিতে পারিলাম না। যে রমণীর কুক্ষিতে পুত্র না জন্মে, সে বন্ধ্যা বলিয়া সকলের ঘৃণার্হা হয়। নাথ! পুত্র যখন আধ আধ স্বরে মধুমাখা বুলিতে 'মা-মা' বলিয়া ডাকে, তখন জননীর হৃদয়ে যে কি অনির্বচনীয় সুখের

* মহাত্মা শঙ্করাচার্যের জীবনী সম্বন্ধে শঙ্কর-বিজয় ও শঙ্কর-দিগ্বিজয় এই দুই গ্রন্থে অনেকস্থলে অনৈক্য আছে। শঙ্কর-বিজয়ে এইরূপ লিখিত আছে যে, এক দিবস নারদ মুনি পৃথিবীতে নানারূপ অসদ্ধর্মের প্রচার দেখিয়া, কাপালিক, ভৈরব, বৌদ্ধ, জৈন, ক্ষপণক প্রভৃতি বিবিধ মতের প্রভাবে বৈদিক ধর্মের বিলোপ হইতেছে দেখিয়া ব্রহ্মার নিকটে উপস্থিত হইলেন। ব্রহ্মা নারদকে লইয়া মহাদেবের নিকট আসিলেন। ঐ স্থানে অন্যান্য দেবতাগণ সকলে একত্র হইয়া এই স্থির করিলেন যে, মহাদেব শঙ্করাচার্যরূপে অবতীর্ণ হইবেন। যথাসময়ে দেবাদিদেব মহাদেব চিদম্বরম্ নামক দেশে আকাশ-লিঙ্গ-নামক শিবমূর্তিতে অধিষ্ঠিত হইলেন। চিদম্বরমে মহেন্দ্র পণ্ডিতের বংশে সর্বজ্ঞ-নামক এক জন ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার পত্নী কামাক্ষী, চিদম্বরেশ্বর শিবের আরাধনা করিয়া বিশিষ্টা নামে এক তনয়া লাভ করেন। বিশ্বজিৎ নামক এক ব্রাহ্মণের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। বিশিষ্টা, 'আমার স্বামী বিশ্বজিৎ আর আকাশ-লিঙ্গ-শিব দুই এক' এই ভাবনা করিয়া এক সন্তান লাভ করেন। সেই সন্তানই অদ্বৈত মতের গুরু শঙ্করাচার্য।

** বর্তমান মালবর প্রদেশ।

আবির্ভাব হয়, তাহা ত আমি জানিতে পারিলাম না। আমি এমনি অভাগী যে, সে রসাস্বাদনে বঞ্চিত রহিলাম। নাথ! আমি পুত্রমুখ দর্শন করিয়া কি পুন্নাম নরক হইতে উদ্ধার পাইব না? শাস্ত্রে এরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, ভোলানাথের আরাধনা করিয়া এ পর্যন্ত কেহই বিফল-মনোরথ হন নাই, তবে আমরাও কেন তাঁহার অর্চনা করি না?' শিবগুরু প্রণয়িনীর এইরূপ করুণ খেদোক্তি শুনিয়া সবিশেষ মর্মাহত হইলেন, এবং আপনাদের মনোভীষ্ট-সিদ্ধির জন্য সপত্নীক শিবারাধনা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া, রাজ-প্রতিষ্ঠিত শিবালয়ে প্রত্যহ শূলপাণি মহাদেবের অর্চনা করিতে লাগিলেন। কয়েক বৎসর কাল ঐরূপ পূজার্চনা করিবার পর, এক দিবস শিবগুরু স্বপ্ন দেখেন যে, একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তাঁহার শিয়রে দণ্ডায়মান হইয়া বলিতেছেন, 'বৎস! তোমাদের অর্চনায় আমি প্রীত হইয়াছি, এক্ষণে বর প্রার্থনা কর।' শিবগুরু স্বপ্নাবস্থাতেই এই বর প্রার্থনা করেন যে, 'হে দেবাদিদেব! আমি আপনার মত গুণসম্পন্ন একমাত্র পুত্র প্রার্থনা করি।' ব্রাহ্মণ 'তথাস্তু' বলিয়া অন্তর্হিত হন। কালক্রমে সুভদ্রা অন্তঃসত্ত্বা হইয়া শুভলগ্নে পূর্ণ-শশধর সদৃশ এক পুত্রসন্তান প্রসব করেন। সুভদ্রা, জগদ্‌গুরু শঙ্করের আরাধনায় পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করেন বলিয়া পুত্রের নাম শঙ্কর রাখেন।

শঙ্করাচার্যের বাল্যাবস্থা

শঙ্করাচার্য* ভূমিষ্ঠ হইবার পর হইতে সিতপক্ষীয় শশিকলার ন্যায় দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকেন। ইঁহার বয়ঃক্রম যখন এক বৎসর মাত্র, সেই সময়ে ইনি মাতৃভাষা অভ্যাস করেন। দ্বিতীয় বৎসর বয়সে মাতৃক্রোড়ে থাকিয়া অদ্ভুত স্মরণশক্তি-প্রভাবে মাতার মুখনিঃসৃত পুরাণাদি শ্রবণ করিয়া তাহা কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলেন। তৃতীয় বৎসরে ইঁহার পিতৃ বিয়োগ হয়। চতুর্থ বৎসর বয়ঃক্রমকালে মহেশ্বরের সর্বশক্তি ইঁহাতে প্রাদুর্ভূত হওয়ায়, ইনি সুকুমার বয়সে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতদিগের ন্যায় জ্ঞানবান হন। পঞ্চম বৎসর বয়সে ইনি যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিয়া গুরুগৃহে গমন করেন। ষষ্ঠ বৎসর বয়ঃক্রমকালে মহাত্মা শঙ্করাচার্য সর্বশাস্ত্রে ও সর্ববিদ্যায় সুপণ্ডিত হইয়া উঠেন। ঐ সময়ে তিনি বেদে ব্রহ্মার সমান, তাৎপর্য-বোধে বৃহস্পতির সমান, এবং সিদ্ধান্তে ব্যাসের সমান হন।

মহাত্মা শঙ্করাচার্য কোন্ সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা সঠিক জানিবার উপায় নাই। এ বিষয়ে নানাজনের নানা মত দেখিতে পাওয়া যায়। নিম্নে ইহার কতকগুলি উল্লেখ করিলাম—

১) শঙ্করাচার্যের জন্মস্থান মালবর প্রদেশ। ঐ দেশীয় ব্যক্তিদিগের মত এই যে, ইনি সহস্র বৎসর পূর্বে জীবিত ছিলেন।

২। তেলুগু ভাষাতে 'কেরল উৎপত্তি' নামক গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রায় সহস্র বৎসর পূর্বে কৃষ্ণরাও যখন শিওরাও-এর সহিত যুদ্ধে পরাজিত হন, তখন শঙ্করাচার্য মালবর প্রদেশে বর্তমান ছিলেন।

৩। যে সময়ে শঙ্করাচার্য কাশ্মীর দেশে গমন করিয়া বিপক্ষদিগকে জয় করিয়াছিলেন, সেই সময়ে ললিতাদিত্য তথাকার রাজা ছিলেন। রাজতরঙ্গিণীর মতে ১১৮৬ বৎসর পূর্বে ললিতাদিত্যের রাজত্বকাল শেষ হয়। তাহা হইলে ৭২১ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে শঙ্করাচার্য জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

আধুনিক নব্য-যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেরই শঙ্করাচার্যের অদ্ভুত স্মরণ-শক্তির কথা পাঠ করিয়া গ্রন্থকর্তাকে গঞ্জিকা-সেবক অথবা বাতুল বলিয়া উপহাস করিতে পারেন, কিন্তু আমরা এ বিষয়ে অধিক কিছু না বলিয়া, ১৩১৫ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসের ১১ই তারিখের 'হিতবাদী' পত্রিকায়, 'অদ্ভুত স্মরণশক্তি'-শীর্ষক যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার অবিকল এই স্থানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। পাঠক-পাঠিকাগণ, আপনারা ইহার দ্বারাই অনুমান করিয়া লইবেন যে, যখন—আমাদের এই অধঃপতনের সময়েও মনুষ্য-সমাজের মধ্যে এরূপ স্মরণশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায়, তখন যিনি শঙ্করের অংশ লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার ঐরূপ অসাধারণ স্মরণশক্তি না হইবে কেন? 'হিতবাদী' পত্রিকায় যাহা প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা এই—

'ভারতে বর্ণাশ্রম-ধর্মের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে আর্য-জাতির শীর্ষস্থানীয় ব্রাহ্মণগণের ঘোর অধঃপতন হইয়াছে। ব্রাহ্মণদিগের যে অসাধারণ মেধা ও অলোকসামান্য প্রতিভা, সেই নিস্পৃহতা ও তেজস্বিতা এখন বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে সত্য, কিন্তু এ ঘোর দুর্দিনেও ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যে বুদ্ধিমত্তা ও স্মৃতিশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, পৃথিবীর অন্য কোনো স্থানে কোনো জাতির মধ্যে সেই প্রকার বুদ্ধিমত্তা ও স্মৃতিশক্তির পরিচয় পাওয়া যায় না। এক বৎসর হইল, পুণ্যতীর্থ বারাণসীতে দুইটি ব্রাহ্মণ-বালক আসিয়াছে। বালক দুইটি অত্যন্ত মেধাবী ও বুদ্ধিমান। আমরা পাঠকদিগের কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য ঐ বালক দুইটির প্রতিকৃতি প্রকাশ করিলাম।'

'যে বালকটি দণ্ড, কমণ্ডলু, অজিন, মেখলা, কৌপীন এবং বহির্বাস ধারণপূর্বক দণ্ডায়মান আছে, ওটি পাঁচ বৎসর বয়সে হিন্দী, বাংলা, ইংরাজী এবং সংস্কৃত ভাষায় অনেকগুলি গ্রন্থ অধ্যয়ন এবং অষ্টাধ্যায়ী পঞ্চাবরবী, পাণিনি ব্যাকরণ সমগ্র কণ্ঠস্থ করে। সংবৎসর হইল, যজ্ঞসূত্র ধারণ করিয়া বেদোক্ত কঠোর ব্রহ্মচর্য পালন এবং সামবেদ অধ্যয়ন করিতেছে। সম্প্রতি বালকটি অষ্টম বৎসরে পদার্পণ

৪। পণ্ডিত বেঙ্কটরাম বলেন, 'শঙ্করাচার্য ৭৮৮ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।'

৫। অধ্যাপক উইলসন্ সাহেব বলেন, 'শঙ্করাচার্য ৮০০ কি ৯০০ খৃষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন।'

৬। প্রাচীন দিগ্বিজয় নামক গ্রন্থের ১৫৭ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, ১১৪৩ খৃষ্টাব্দে গুজরাটের রাজা কুমারপালের সভাসদ্ হেমচন্দ্রের সহিত শঙ্করাচার্যের বিচার হয়।

৭। 'দি ইণ্ডিয়ান এণ্টিকুইরি' নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যে, ইনি ৮০০ অথবা ৯০০ খৃষ্টাব্দে বর্তমান ছিলেন।

৮। হগ্সন সাহেব তাঁহার 'মিস্লেনিয়াস্ এসেজ' নামক গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ২২৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়া গিয়াছেন যে, শঙ্করাচার্য ৮০০ খৃষ্টাব্দের পূর্বে জীবিত ছিলেন।

এই সকল এবং আরও অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থসমূহ পাঠ করিয়া অনুমান দ্বারা আমি ৭০০ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে শঙ্করাচার্যের জন্মকাল স্থির করিলাম।

করিয়াছে। অপর বালকটি ইহারই কনিষ্ঠ ভ্রাতা, এটিও চার পাঁচটি ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইয়াছে, সম্প্রতি পাণিনি অধ্যয়ন করিতেছে, উহার বয়ঃক্রম পাঁচ বৎসর। গণিতশাস্ত্রেও ইহাদিগের অধিকার অসামান্য। ইহাদিগের পিতা এবং গুরু শ্রীমদ্‌বংশধর সরস্বতী অগ্নিহোত্রী মহাশয় বাঙালীদিগের মধ্যে একমাত্র সাগ্নিক ব্রাহ্মণ। ইনি বেদ-বিধানানুসারে অরণীকাষ্ঠ হইতে বিশুদ্ধ অগ্নি উদগার করিয়া শ্রৌত এবং স্মার্ত পঞ্চাগ্নির আধানপূর্বক বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছেন এবং ব্রহ্মচারীশিষ্যগণকে বেদাধ্যাপন করাইতেছেন। ৺কাশীধামে আগন্তুক মহোদয়গণ সম্প্রতি ২০৭নং মদনপুরা নামক স্থানে ইহাদিগের আশ্রম দেখিতে পাইবেন। সেখানে উক্ত বালক দুইটিকে এবং যজ্ঞশালায় হোতা, অধ্বর্যু, উদ্গাতা অগ্নীধ্রঃ এবং ব্রহ্মাপরিবৃত আচার্যপাদকে ও তাঁহার চিরপ্রজ্বলিত অগ্নিদেবতাকে দর্শন এবং বেদধ্বনি শ্রবণ করিয়া আনন্দিত হইবেন।'

শঙ্কর গুরুগৃহে অবস্থানসময়ে, এক দিবস ভিক্ষার জন্য বহির্গত হন। তিনি ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিয়া অবশেষে একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণের বাটীতে আসেন এবং তথায় কিঞ্চিৎ ভিক্ষা প্রার্থনা করেন। ঐ সময়ে ব্রাহ্মণ বাটীতে ছিলেন না। তিনিও দারিদ্র-দশাপ্রপীড়িত হইয়া ভিক্ষার জন্য বহির্গত হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ-পত্নী, ভিখারীর গৃহে ভিক্ষুক আসিতে দেখিয়া, অতিশয় মর্মাহত হন এবং অতি ম্রিয়মাণা হইয়া এই কথা বলেন যে, 'বৎস! আমরা অতি ভাগ্যহীন, দেব কর্তৃক বঞ্চিত, ঈশ্বর, ভিক্ষা প্রদান করিবার ক্ষমতা পর্যন্ত আমাদের দেন নাই। অতিথিকে বিমুখ করিতে নাই, সেই জন্য তোমায় এই আমলক ফল প্রদান করিতেছি, গ্রহণ কর।' মহাত্মা শঙ্করাচার্য বিপ্র-পত্নীর বিলাপপূর্ণ বাক্য শ্রবণে দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ পদ্মালয়া কমলাকে স্তব করিতে আরম্ভ করেন। হরিপ্রিয়া শঙ্করের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া, অবিলম্বে শঙ্কর-সন্নিধানে আসিয়া উপনীত হন এবং শঙ্করকে বর গ্রহণ করিতে বলেন। মহাত্মা শঙ্করাচার্য কমলাকে সন্তুষ্ট করিয়া এই বর প্রার্থনা করেন যে, 'এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ দম্পতী অতুল ধনের অধীশ্বর হইয়া যেন সুখে কালযাপন করে।' লক্ষ্মীও 'তথাস্তু' বলিয়া অন্তর্হিতা হন। অকস্মাৎ ব্রাহ্মণের পর্ণকুটির সুবর্ণ-অট্টালিকায় পরিণত হওয়ায়, শঙ্করের অদ্ভুত ক্ষমতার বিষয় তড়িদ্বেগে চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। ঐ সময়ে তদ্দেশীয় রাজা রাজশেখর অপুত্রক ছিলেন। তিনি শঙ্করের অসামান্য ক্ষমতার বিষয় শ্রবণ করিয়া অযুত স্বর্ণমুদ্রাসহ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন এবং তাঁহার চরণোপান্তে অযুত সুবর্ণমুদ্রা রাখিয়া সাষ্টাঙ্গ হইয়া প্রণিপাত করেন। শঙ্করদেব তাঁহাকে আশীর্বাদ করেন এবং ঐ অর্থ দরিদ্রদিগকে দান করিতে বলেন। ঐ আশীর্বাদে রাজা রাজশেখর পুত্রমুখ দর্শন করিয়া পরম প্রীতিলাভ করেন।

বৈরাগ্যের উদয় ও সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ

শঙ্করাচার্য অষ্টম বৎসরের হইলে, তিনি ঐহিকের সকল সুখে জলাঞ্জলি দিয়া সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণের জন্য মাতার অনুমতি প্রার্থনা করেন। সুতবৎসলা জননী একমাত্র পুত্রকে ছাড়িয়া কিরূপে জীবনযাপন করিবেন, তাহাই ভাবিয়া আকুল হন, সুতরাং তিনি পুত্রকে সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণের পূর্বে গার্হস্থ্যধর্ম অবলম্বন করিতে বলেন। শঙ্করাচার্য সহজে জননীর অনুমতি না পাওয়ায়, এই কৌশলে কার্যসিদ্ধি করেন,—

এক সময়ে শঙ্করাচার্য মাতার সহিত নদী পার হইয়া কোন আত্মীয়ের বাটী

গিয়াছিলেন। তথা হইতে প্রত্যাগমনকালে দেখেন যে, যাইবার সময় যে নদী অনায়াসে পার হইয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা জলে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। শঙ্করাচার্য জলে নামিয়া কিয়দ্দূর গমন করিলে তাঁহার আকণ্ঠ জলমগ্ন হইয়া গেল। তখন তিনি মাতাকে সম্বোধন করিয়া বলেন, 'জননী! আপনি যদি আমাকে সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণে অনুমতি না দেন, তাহা হইলে আমি জলমগ্ন হইব।' ইহাতে শঙ্কর-জননী সমূহ বিপদ বুঝিয়া তখনই পুত্রকে সন্ন্যাসগ্রহণে অনুমতি দেন।

শঙ্করাচার্য জননীর অনুমতি পাইয়া প্রথমে পূজ্যপাদ শ্রীমৎ গোবিন্দ স্বামীর শিষ্য হন। তথায় তিনি ব্রহ্মত্বলাভ করিয়া গুরুদেবের উপদেশানুসারে মোক্ষক্ষেত্র কাশীধামে গমন করেন। ঐ স্থানে চোল দেশবাসী সনন্দন* তাঁহার প্রথম শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন ও পরে অনেকে তাঁহার শিষ্য হন।

এক দিবস শঙ্করাচার্য কাশীতে মণিকর্ণিকার ঘাটে স্নান করিয়া নিদিধ্যাসন করিতেছেন, এরূপ সময়ে একটি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'তুমি না ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছ ? বল দেখি, কোথায় অর্থ করিতে তোমার বড়ই কষ্ট পাইতে হইয়াছে ?' শঙ্কর বলেন, 'যদি আপনি কোথাও বুঝিতে না পারিয়া থাকেন বলুন, আমি তাহার অর্থ করিয়া দিতেছি।' শঙ্করের কথা শুনিয়া বৃদ্ধ 'তদনন্তরপ্রতিপত্তৌ, রংহতি সম্পরিষ্বক্তঃ প্রশ্ননিরূপণাভ্যাম্', এই সূত্রের অর্থ জিজ্ঞাসা করেন। দুই জনে দুই প্রকার অর্থ করেন। ক্রমে দুই সূত্রের ব্যাখ্যা লইয়া উভয়ের বাগবিতণ্ডা আরম্ভ হয়। শঙ্করাচার্য বৃদ্ধের গণ্ডদেশে এক চপেটাঘাত করিয়া পদ্মপাদ নামক তাঁহার শিষ্যকে বলেন, 'এই বুড়াটাকে দূর করিয়া দাও।' গুরুর আদেশ শ্রবণ করিয়া পদ্মপাদ আচার্যকে নমস্কার করিয়া বলেন—

'শঙ্করঃ শঙ্করঃ সাক্ষাৎ ব্যাসো নারায়ণঃ স্বয়ম্।
তয়োর্বিবাদে সম্প্রাপ্তে, ন জানে কিং করোম্যহম্ ॥'

'শঙ্কর সাক্ষাৎ মহাদেব, ব্যাস মূর্তিমন্ত নারায়ণ, এই উভয়ের বিবাদে এ দাস কি

সনন্দনের অপর নাম পদ্মপাদ। এই নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে এরূপ কথিত আছে যে, কোন সময়ে শঙ্করাচার্য জাহ্নবী-তীরে বসিয়া আছেন, গঙ্গার অপর পারে শিষ্যপ্রবর সনন্দন অধ্যাসীন রহিয়াছেন, শঙ্করাচার্য পারান্তর হইতে সনন্দনকে আহ্বান করিলেন। সনন্দন গুরুর আদেশ শ্রবণমাত্র গমনোদ্যত হইয়া মনে মনে বিবেচনা করিলেন, যিনি অপার ও সুদুস্তর সংসার-পারাবার হইতে ভক্তজনগণকে পরিত্রাণ করিতেছেন, সামান্য স্রোতস্বতীতে কি তিনি তারণ করিবেন না? —অবশ্যই করিবেন। সনন্দন মনে মনে দৃঢ় ভক্তিসহকারে এইরূপ নিশ্চয় ও নির্ভর করিয়া জাহ্নবী-সলিলে যেমন পদনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, পদস্থাপনার্থ অমনি জলের উপর এক একটি পদ্ম সমুদ্ভূত হইতে লাগিল। সেই পদ্মে পাদ-বিন্যাসপূর্বক সনন্দন ক্রমে ক্রমে শ্রীগুরুর চরণান্তিকে সমুপস্থিত হইলেন। শিষ্যের এরূপ অদ্ভুত শক্তি সন্দর্শন করিয়া এবং প্রতি পাদবিন্যাসে পদ্মের উদ্ভব হইতে দেখিয়া, শঙ্কর সনন্দনকে 'পদ্মপাদ' আখ্যা প্রদান করিলেন। সেই অবধি সনন্দন পদ্মপাদ নামে বিখ্যাত হইয়াছেন।

করিবে ?' শঙ্করাচার্য পদ্মপাদের কথা শুনিয়া ব্যাসকে* স্তবে তুষ্ট করেন। ব্যাসদেব শঙ্করের স্তবে তুষ্ট হইয়া বলেন, 'আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইলাম। তুমি ব্রহ্মসূত্রের তাৎপর্য সহিত জগতে অদ্বৈতবাদ প্রচার কর।' ইহার উত্তরে শঙ্কর বলেন, 'আমি অল্পায়ু হইয়া পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, আমার ভোগকাল ষোল বৎসর মাত্র, সুতরাং আমার দ্বারা আর অধিক কি হইবে ?' ব্যাসদেব শঙ্করের উক্তি শ্রবণ করিয়া বলেন, 'হে শঙ্কর ! এখনও তোমার কর্তব্যকর্ম অবশিষ্ট আছে। মীমাংসা, ন্যায়, বেদ, বেদান্ত, ব্যাকরণ, সাংখ্য এবং যোগে তোমার সদৃশ ভূমণ্ডলে আর কাহাকেও দেখিতে পাই না। আমার কৃত বহু অর্থ ও তাৎপর্যগর্ভ সূত্রসকল তুমি ভিন্ন অন্য কেহ আমার মনোবর্তী ভাব ও মর্ম অবগত হইয়া ভাষ্য করিতে সমর্থ হইবে না। তুমি ইহার মধ্যে জীবন ত্যাগ করিলে বেদান্তসকল নিরাশ্রয় হইবে। অতএব তোমার পরমায়ু আরও ষোড়ষ বর্ষ হউক।' আয়ু বৃদ্ধি হওয়ায় শঙ্করাচার্য দশোপনিষদ, গীতা ও বেদান্তের ভাষ্য নৃসিংহতাপিনী ব্যাখ্যা ও উপদেশ সহস্রাদি রচনা করিয়া 'অদ্বৈত মত' প্রচারের জন্য দিগ্বিজয়ে** বহির্গত হন।

'শঙ্কর বিজয়' প্রণেতা আনন্দগিরি লিখিয়াছেন, 'শঙ্করাচার্য বেদব্যাসের সহিত বিচার করিয়াছেন। কিন্তু অনেকে বলেন, বেদব্যাস, শঙ্করাচার্য জন্মাইবার হাজার বৎসর পূর্বে স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। কাশী ব্যাসশূন্য হয় না। যত দিন কাশী থাকিবে তত দিন কাশীতে বেদব্যাস থাকিবেন। কাশীর পণ্ডিতমণ্ডলী এক এক জন পণ্ডিতকে 'বেদব্যাস' এই উপাধি প্রদান করিয়া থাকেন। এই শ্রেণীর একজন বেদব্যাসের সহিত শঙ্করাচার্যের বিচার হইয়াছিল। কিন্তু আনন্দগিরি যেরূপ লিখিয়াছেন, তাহাতে ভগবান বেদব্যাসকেই বুঝায়।

বেদব্যাস—পরাশর মুনির ঔরসে মৎস্যগন্ধার গর্ভে মহামুনি বেদব্যাসের জন্ম হয়। একজন মৎস্যজীবি মৎস্যগন্ধাকে পাইয়া কন্যারূপে পালন করে। মৎস্যগন্ধা অত্যন্ত রূপবতী ছিলেন। একদা ইনি পিতার আদেশে নদীতে নৌকা-চালনা করিতেছিলেন, এরূপ সময়ে পরাশর মুনি পরপারে গমনের জন্য সেইস্থানে আগমন করেন। মৎসগন্ধা তাঁহাকে লইয়া নদীবক্ষে গমন করিতেছেন, এরূপ সময়ে তাঁহার অনুপম সৌন্দর্যদর্শনে মুনিবরের কামোদ্রেক হয়। মুনি নিজের অভিলাষ প্রকাশ করিলে, মৎস্যগন্ধা বলেন 'মহাশয় ! দেখুন নদীর উভয় কুলে লোক গমনাগমন করিতেছে, এ অবস্থায় যদি আমি আপনাকে আপনার অভিলাষ পূর্ণ করিতে দেই, তাহা হইলে লোকে নিশ্চয়ই দেখিতে পাইবে ও আমার কলঙ্ক রটনা করিবে।' কুমারীর কথা শুনিয়া মুনিবর তখনই তপঃপ্রভাবে কুজ্ঝটিকার সৃষ্টি করেন। চারিদিক এরূপ ধোঁয়ার মত হইয়া যায় যে, নিকটের বস্তু পর্যন্ত আর দেখিতে পাওয়া যায় না। তখন মৎস্যগন্ধা সম্মতা হইলে, মুনিবর আপনার অভিলাষ পূর্ণ করেন। ইহার ফলে দ্বৈপায়ন ব্যাসদেবের জন্ম হয়।

সেকেন্দার তৈমুরলঙ্গ যেমন দিগ্বিজয় করিয়াছিলেন, ইহা সেরূপ নহে। এই দিগ্বিজয়ের অস্ত্র বিদ্যা এবং কণ্ঠনিঃসৃত গালি বালি শাণিত দ্রুত উচ্চারিত বচনসমূহ, এখনও আমাদের দেশে অনেকেই তুমি দিগ্বিজয়ী হও এই বলিয়া আশীর্বাদ করিয়া থাকেন। পূর্বে একজন যোদ্ধা অপর কোন যোদ্ধার নিকট

ধর্ম প্রচার

শঙ্করদেব কাশীতে অবস্থানকালে, কর্মবাদী, চন্দ্রোপাসক, গ্রহোপাসক ত্রিপুরসেবী, গরুড়োপাসক প্রভৃতি বিবিধ উপাসক-সম্প্রদায়কে পরাস্ত করিয়া স্বীয় মত স্থাপন করেন। তিনি কাশী হইতে কুরুক্ষেত্র দিয়া বদরিকাশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি এই স্থানে বদরীনারায়ণ দর্শন করিয়া কিছুদিন তথায় অবস্থান করেন। ঐ সময়ে তিনি তথায় একটি মঠ স্থাপন করিয়া অথর্ববেদ প্রচারের জন্য, অথর্ববেদজ্ঞ নন্দ-নামক একজন শিষ্যকে ঐ মঠের অধ্যক্ষ-পদে নিযুক্ত করেন। ঐ মঠ যোষিশান নামে খ্যাত।

শঙ্করাচার্য বদরিকাশ্রমে মঠ স্থাপন করিয়া হস্তিনাপুরের অগ্নিকোণস্থ 'বিদ্যালয়' নামক একটি প্রদেশে আসিয়া উপস্থিত হন। বিদ্যালয় বিজিলবিন্দু নামে সুপ্রসিদ্ধ। এই বিজিলবিন্দুর তালবনে, মণ্ডনমিশ্র নামক একজন মহাপণ্ডিত ছিলেন। তিনি জ্ঞানকাণ্ডাবলম্বীদিগের ঘোর বিদ্বেষী। যে সময়ে শঙ্করাচার্য মিশ্র মহাশয়ের নিকট আসিয়া উপস্থিত হন, সেই সময়ে তিনি পুরদ্বার বন্ধ করিয়া শ্রাদ্ধ করিতেছিলেন। এবং স্বয়ং ব্যাসদেব মন্ত্রবলে আহূত হইয়া তথায় শ্রাদ্ধ কার্যাদি দর্শন করিতেছিলেন।

শঙ্কর পুরদ্বার রুদ্ধ দেখিয়া যোগবলে ভিতরে প্রবেশ করেন। সন্ন্যাসী দেখিয়াই মিশ্র ঠাকুর অগ্নিশর্মা হন। ক্ষণেক বচসার পর ব্যাসদেবের কথায় স্থির হইল যে, আহারান্তে বিচার আরম্ভ হইবে। যিনি পরাজিত হইবেন, তিনি জেতার মত অবলম্বন করিবেন। মণ্ডন মিশ্রের স্ত্রী সারসবানী মধ্যস্থ থাকিবেন। আহারান্তে বিচার আরম্ভ হয় এবং মণ্ডন মিশ্র পরাজয় স্বীকার করেন। বিচারে পরাস্ত হইয়া মণ্ডন সন্ন্যাসী হন। পতিব্রতা সারসবানী স্বামীর যত্যাশ্রম স্বীকারের পূর্বেই স্বামী থাকিতে বিধবার ন্যায় হইতে হইল দেখিয়া, ব্রহ্মলোকে গমনোদ্যতা হন। সারসবানীকে ব্রহ্মলোকে যাইতে দেখিয়া শঙ্করাচার্য বলেন, 'সারসবানি! আমার কাছে তোমাকেও পরাভব স্বীকার করিতে হইবে।' সারসবানি 'তথাস্তু' বলিয়া বিচারে প্রবৃত্ত হন। সন্ন্যাসীকে সর্ব-শাস্ত্রবিশারদ দেখিয়া তিনি প্রথমেই কামশাস্ত্রের আলাপ করিতে প্রবৃত্ত হন। শঙ্করাচার্য সারসবানীকে কামশাস্ত্রের আলাপ করিতে দেখিয়া একেবারে বিস্মিত হন এবং একটু অপ্রতিভ হইয়া বলেন, 'মাতঃ, আপনি ছয়মাস কাল এইভাবে অবস্থান করুন, আমি কামশাস্ত্র শিক্ষা করিয়া আসি।' এই কথা বলিয়া শঙ্করাচার্য কামশাস্ত্র শিক্ষা করিবার জন্য বহির্গত হন।

শঙ্করাচার্য সারসবানীর নিকট বিদায় লইয়া পথিমধ্যে যাইতে যাইতে দেখেন, এক রাজার মৃতদেহ শ্মশানে নীত হইতেছে। ইহা দেখিয়া তিনি মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা-প্রভাবে রাজার দেহ-মধ্যে প্রবেশ করেন এবং স্বদেহরক্ষার্থ চারিজন শিষ্যকে নিযুক্ত করিয়া যান। রাজদেহপ্রবিষ্ট শঙ্করাচার্য রাণীর নিকট সমস্ত কামশাস্ত্র শিক্ষা করেন, কিন্তু রাণী অতি চতুরা, ইদানীং রাজার আচার-ব্যবহার তাঁহার কাছে ভাল লাগিত না, কেমন একটু সন্দেহ হইত। এক দিবস তিনি কর্মচারীদিগের প্রতি এই আদেশ করেন যে, তোমরা

'যুদ্ধং দেহি' বলিয়া দাঁড়াইলে প্রতিপক্ষের যুদ্ধ করিতেই হইত, সেইরূপ একজন পণ্ডিত আর একজন পণ্ডিতের নিকট 'বিচার কর' বলিয়া দাঁড়াইলে তাঁহাকে বিচার করিতেই হইত। যিনি বিচার করিতে ইতস্ততঃ করিতেন, তিনি পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট অপদস্থ হইতেন। মহাত্মা শঙ্করাচার্য সেই দিগ্বিজয়ীদিগের অগ্রগণ্য।

ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিয়া দেখ, কোথাও মৃতদেহ পড়িয়া আছে কি না, যদি থাকে, তবে তাহা দাহ করিয়া ফেল।' কর্মচারীরা অনুসন্ধান করিয়া শঙ্করের শবদেহ দেখিতে পায় এবং শিষ্যদিগের নিকট হইতে উহা কাড়িয়া লইয়া দাহ করিবার উদ্যোগ করে। এ দিকে শিষ্যেরা ছদ্মবেশধারী শঙ্করের নিকট গিয়া সমস্ত বিষয় নিবেদন করে। শঙ্করাচার্য গিয়া দেখেন, তাঁহার চিতা ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে। তিনি আর কালবিলম্ব না করিয়া রাজদেহ হইতে নিজ দেহে প্রবেশ করেন ও জ্বলন্ত চিতা হইতে লাফাইয়া পড়েন। তিনি দগ্ধ শরীরেব প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া নৃসিংহদেবের স্তব করিতে প্রবৃত্ত হন। নৃসিংহদেব অমৃতবৃষ্টি করিয়া তাঁহাকে আরোগ্য করেন। আচার্য সেই স্থান হইতে সারসবানীব নিকট গমন করেন। সারসবানী* দেখিলেন, অশ্লীল আলাপ হইবার সম্ভাবনা, সুতরাং বিনা বিচারেই পরাজয় স্বীকার করিয়া তিনি ব্রহ্মলোকে গমন করিবার উদ্যোগ করিতে থাকেন, কিন্তু, আচার্য যোগবলে তাঁহার গতিরোধ করেন। শঙ্কর সরস্বতীকে এইরূপে আয়ত্ত করিয়া শৃঙ্গগিরি নামক স্থানে যাত্রা করেন। শৃঙ্গগিরি তুঙ্গভদ্রা নদীব তীরে অবস্থিত। শঙ্করাচার্য সেখানে মঠ নির্মাণ করিয়া সরস্বতীকে বলেন, 'তুমি এই স্থানে চিরকাল স্থির থাক।' শৃঙ্গগিরিস্থ মঠের নাম 'বিদ্যামঠ' রাখা হয় এবং ঐ মঠের শিষ্যমণ্ডলীর নাম হইল—'ভারতী সম্প্রদায়।'**

শঙ্করাচার্য বিদ্যামঠে কিছুদিন বাস করিয়া, সুরেশ্বর নামে একজন শিষ্যের উপর মঠের সমস্ত ভারার্পণ করিয়া আবার স্বধর্ম-প্রচারার্থ বহির্গত হন। ঐ স্থান হইতে তিনি মল্ল, মরুন্ধ, মগধ, গয়া, অযোধ্যা, প্রযাগ প্রভৃতি স্থানে স্বধর্ম প্রচার করিয়া বরুণ, বায়ু, ভূমি, উদক, বৌদ্ধ প্রভৃতি উপাসকদিগকে স্বমতে আনয়ন করেন, প্রয়াগ হইতে উজ্জয়িনী নগরে আসিয়া শঙ্করাচার্য কাপালিক ভৈরবোপাসকদিগের হস্তে পড়েন। কাপালিকেরা আচার্যের উপর অত্যাচার করিতে থাকায়, তিনি সুধন্বা নামক নরপতির কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন। সুধন্বা রাজা প্রথমে বৌদ্ধ ছিলেন, নাস্তিকমণ্ডলীতে সর্বদা পরিবেষ্টিত হইয়া থাকিতেন। একদিন ভট্টপাদ রাজসভায় উপস্থিত হইয়া বলেন—

'মলিনৈশ্চেন্ন সংসর্গো নীচৈঃ কাককুলৈঃ পিক।
শ্রুতিদূষক-নির্হ্রাদৈঃ শ্লাঘনীয়স্তদা ভবে॥'

'হে কোকিল, তোমার যদি শ্রুতিদূষক (বেদনিন্দক) শব্দকারী কাককুলের সহিত সংসর্গ না থাকিত, তাহা হইলে তুমি শ্লাঘার পাত্র হইতে।' ভট্টপাদের কথা শুনিয়া রাজা তাঁহাকে বিশেষরূপে পরীক্ষা করেন এবং যথার্থ মর্ম অবগত হইয়া তাঁহার শিষ্য হন।

---

* শঙ্কর-দিগ্বিজয় নামক গ্রন্থপ্রণেতা বলেন, মহাদেব শঙ্করাচার্যরূপে অবতীর্ণ হইবার সময় কার্তিককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'তুমি ভট্টপাদ কুমারিল নামে অবতার হইয়া বৈদিক কর্মকাণ্ডের উদ্ধার কর, জৈমিনির যে পূর্ব-মীমাংসা আছে, তাহার টীকা কর। ইন্দ্র, তুমি সুধন্বা নামে রাজা হইয়া ভট্টপাদের সহায়তা কর। ব্রহ্মা, মণ্ডন মিশ্র হইয়া ভট্টপাদের সহকারী হও। সারসবানী স্বয়ং ব্রহ্মপত্নী সরস্বতী।

** এই সম্প্রদায়ে মূর্খ লোক ছিল না এবং এই সম্প্রদায়ের লোকই সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক পূজনীয়, কিন্তু এক্ষণে ভারতীদিগের অনেকের বর্ণজ্ঞান পর্যন্ত নাই।

কাপালিকেরা সুধন্বা রাজার সৈন্যদিগের নিকট পরাস্ত হইয়া শঙ্করাচার্যের মত গ্রহণ করে। ইহার পর শঙ্কর সৌরাষ্ট্র ও দ্বারকায় গমন করিয়া স্বধর্ম প্রচার করেন। তিনি দ্বারকাক্ষেত্রে মঠ স্থাপন করিয়া উহার নাম 'সারদা-মঠ' রাখেন এবং সামবেদজ্ঞ বিশ্বরূপ নামক একজন শিষ্যকে ঐ মঠের আচার্য ও প্রচারকের পদে নিযুক্ত করিয়া পুরুষোত্তম তীর্থে যাত্রা করেন। পুরুষোত্তমে আসিবার সময় কিছুদিন কুবলয়পুরে এবং একমাস কাল ভবানীনগরে অবস্থিতি করেন। ঐ সময়ে তিনি হিরণ্যগর্ভ, আদিত্য, অগ্নিহোত্র, গাণপত্য প্রভৃতি উপাসক-সম্প্রদায়দিগকে পরাজিত করিয়া স্বমতে আনয়ন করেন।

ঐ সময়ে বৌদ্ধধর্ম, হিন্দুধর্মকে অস্তমিত সূর্যের ন্যায় নিষ্প্রভ করিয়া ভারতবর্ষের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হইতেছিল। মহাত্মা শঙ্করাচার্য হিন্দুধর্মের এতাদৃশী অবস্থা দেখিয়া শূন্যবাদী বৌদ্ধধর্মের উচ্ছেদসাধন করিবার জন্য 'বৌদ্ধধর্ম অলীক', ইহার চতুর্দিকে প্রচার করিতে থাকেন। শঙ্করাচার্যের ঈদৃশ ব্যবহারে বৌদ্ধগণ রোষপরবশ হইয়া তাঁহাকে রাজদ্বারে নীত করেন। তথায় তিনি বৌদ্ধধর্মের অলীকতা প্রমাণ করিবার জন্য বিচার প্রার্থনা করেন। বিচারের অকাট্য যুক্তিবলে বৌদ্ধদিগের কূটতর্কজাল বিচ্ছিন্ন করিয়া তিনি তাঁহাদিগকে পরাস্ত করেন। বৌদ্ধ পণ্ডিত বা পুরোহিতগণ পরাজয় স্বীকার করিলে অনেকেই তাঁহার মতের অনুবর্তী হইতে আরম্ভ করেন। সেই দিবস হইতে বৌদ্ধধর্মের শক্তি নিস্তেজ হইতে আরম্ভ হয় ও হিন্দুধর্ম পুনরায় পরিপুষ্ট হইতে থাকে।

এক দিবস শঙ্করাচার্য সমাধি অবস্থায় থাকিয়া, তাঁহার জননীর মনোগত ভাব অবগত হন এবং যোগশক্তিপ্রভাবে মুহূর্তের মধ্যে জননী-সমীপে আসিয়া তাঁহার চরণবন্দনা করেন। বহুদিবসান্তে মাতা, পুত্রের মুখাবলোকন করিয়া সকল দুঃখ বিস্মৃত হইয়া যান এবং তাঁহার শরীরে ঐশ্বরিক ক্ষমতা জন্মিয়াছে দেখিয়া অপার আনন্দ অনুভব করেন। শঙ্কর-মাতা পুত্রের সহিত অন্যান্য কথোপকথনের পর আপনার মনোগত ভাব পুত্রের নিকট এই বলিয়া ব্যক্ত করেন যে, 'আমি বৃদ্ধা হইয়াছি, আমি আমার অকর্মণ্য দেহকে আর বহন করিতে ইচ্ছা করি না। অতএব তুমি আমার সদ্গতি করাইয়া দাও।' পুত্র মাতার ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার সদ্গতির জন্য মহাদেবের স্তব করিতে আরম্ভ করেন। শঙ্কর শঙ্করের স্তবে তুষ্ট হইয়া শঙ্করজননীকে শিবলোকে আনিবার জন্য শঙ্কর-গৃহে জটাজুটমণ্ডিত প্রমথগণকে প্রেরণ করেন। প্রমথগণ শঙ্করজননী-সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইলে, তিনি পুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলেন, 'বৎস! শিবলোকে যাইতে আমার ইচ্ছা নাই, আমি শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী বনমালা-বিভূষিত শ্রীবৎস-শোভান্বিত পীতাম্বর-পরিধেয় শ্রীহরিকে দর্শন করিতে করিতে বিষ্ণুলোকে গমন করিতে ইচ্ছা করি।' শঙ্করাচার্য জননীর এবংবিধ ভক্তিরসপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনরায় নারায়ণের স্তব করিতে থাকেন। বিপত্তারণ মধুসূদন শঙ্করের স্তবে প্রীত হইয়া শঙ্করজননীকে লইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করেন। ইহার পর শঙ্করাচার্য মাতার পরিত্যক্ত দেহের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাধা করিয়া পুরুষোত্তমে আসেন এবং ঋগ্বেদ প্রচারের জন্য ঐ স্থানে গোবর্ধন* নামে একটি মঠ স্থাপন করেন। তিনি ঋগ্বেদজ্ঞ পদ্মপাদকে ঐ মঠের আচার্য ও প্রচারকের পদে অভিষিক্ত করিয়া মধ্যার্জুন নামক স্থানে গমন করেন। যাইবার পথে প্রভাকর

* গোবর্ধন মঠের আচার্যেরা 'তীর্থস্বামী' নামে অভিহিত হন

নামক একজন ব্রাহ্মণের বাটীতে কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম করেন। ঐ ব্রাহ্মণের জড়ভাবাপন্ন একটি পুত্র ছিল। ব্রাহ্মণ শঙ্করকে সাক্ষাৎ ভগবান্ জানিতে পারিয়া ঐ পুত্রকে তাঁহার কাছে লইয়া আসেন এবং রোগের বিষয় আদ্যোপান্ত তাঁহার নিকট নিবেদন করেন। শঙ্করাচার্য বালককে রোগমুক্ত করিয়া সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করিতে আজ্ঞা করেন। ঐ রোগমুক্ত বালক 'হস্তামলক' বলিয়া বিখ্যাত হন এবং তাঁহার শ্লোকসকলও 'হস্তামলক' বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। ক্রমে তিনি অহোবল নামক স্থানের নৃসিংহোপাসকদিগকে অদ্বৈতবাদী করিয়া, কৈবল্যগিরি পার হইয়া কাঞ্চী নামক দেশে আসিয়া উপস্থিত হন।

কাঞ্চী দেশের অধিপতি হিমশীতল নরপতি বৌদ্ধধর্মের নিতান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। প্রধান প্রধান বৌদ্ধ পণ্ডিতগণে তাঁহার সভা পরিপূর্ণ থাকিত। শঙ্করাচার্য ঐ রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া বৌদ্ধধর্মের অলীকতা সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন। শঙ্করের এবংবিধ আচরণ দেখিয়া রাজা স্বয়ং এবং তাঁহার পণ্ডিতমণ্ডলী অগ্নিশর্মা হইয়া উঠেন এবং তাঁহাকে শাস্তিপ্রদান করিতে উদ্যত হন। শঙ্করাচার্য বিচার প্রার্থনা করেন এবং পরাজিত হইলে সকল প্রকার শাস্তি গ্রহণ করিতে সম্মত হন। শঙ্করের কথায় রাজা নানা স্থান হইতে প্রধান প্রধান বৌদ্ধপণ্ডিতদিগকে আমন্ত্রণ করিয়া আনয়ন করেন। তাঁহাদিগের সহিত শঙ্করাচার্যের বিচার হয়। বিচারে পণ্ডিতগণ পরাভব স্বীকার করেন। রাজা পণ্ডিতদিগকে সমুচিত দণ্ড প্রদান করিয়া স্বয়ং শঙ্করমতের অনুবর্তী হন। শঙ্করাচার্যের এই বিজয়-বিবরণ শিবকাঞ্চী-নামক স্থানের শ্মশানেশ্বর শিবের মন্দিরের দ্বারদেশে ও ভগবতী নদীর তীরস্থিত তেরুকোভেরুলির দেবমন্দিরে প্রস্তর-ফলকে অঙ্কিত আছে। শঙ্কর কাঞ্চীনগরের অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদিগকে অদ্বৈতমতাবলম্বী করিয়া এবং শিব ও বিষ্ণুর নামানুসারে শিবকাঞ্চী ও বিষ্ণুকাঞ্চী নামক দুইটি নগর প্রতিষ্ঠা করিয়া তিরুপতি-নামক স্থানে যাত্রা করেন। ঐ স্থানে বৌদ্ধদিগকে পরাস্ত করিয়া মধ্যার্জুন-নামক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হন। ঐ স্থান রামেশ্বর নামে খ্যাত। রাবণকে নিধন করিবার জন্য রামচন্দ্র ঐ স্থানে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা করিয়াছিলেন এবং ঐ স্থান হইতে লঙ্কাপুরী (বর্তমান নাম সিংহল) পর্যন্ত সমুদ্রের উপর সেতু-নির্মাণ করিয়াছিলেন। রামেশ্বর হইতে উহার কিয়দংশ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। আর্যদেব ঐ স্থানে যজুর্বেদ প্রচার করিবার জন্য 'শৃঙ্গগিরি' নামক মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়া যজুর্বেদজ্ঞ শিষ্য পৃথিবধরকে মঠের আচার্য ও প্রচারক-পদে নিযুক্ত করেন। ঐ মঠধারীরা গিরীপুরী-ভারতী নামে অভিহিত হন।

শঙ্করদেব মধ্যার্জুন হইতে প্রত্যাগমন করিয়া চিদম্বরম্ নামক প্রদেশে আগমন করেন। ঐ স্থানে দুই-চারি দিন অবস্থান করিয়া অনন্তশয়ন নামক স্থানে উপস্থিত হন। অনন্তশয়ন বৈষ্ণবদিগের কেন্দ্রস্থান। ঐ স্থানে ছয় প্রকারের বৈষ্ণব আসিয়া তাঁহার সহিত বিচার করিতে প্রবৃত্ত হন। পরিশেষে উহারা বিচারে পরাজিত হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করেন। অনন্তশয়নে কিছুদিন অবস্থান করিয়া তিনি কামরূপ তীর্থে গমন করেন। কামরূপে অভিনব গুপ্ত নামক একজন খ্যাতনামা পণ্ডিত বাস করিতেন। শঙ্কর তাঁহাকে বিচারে পরাস্ত করেন। অভিনব গুপ্ত পরাস্ত হইয়া আপনাকে অবমানিত মনে করেন এবং প্রতিশোধ লইবার জন্য তাঁহাকে মারিয়া ফেলিবার চেষ্টা করেন।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে শঙ্করদেব উৎকট ভগন্দর রোগে আক্রান্ত হন। জনশ্রুতি এইরূপ যে, অভিনব গুপ্ত তাঁহার প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার জন্য কোন উপায় না

পাইয়া, অবশেষে অভিচার দ্বারা তাঁহার এই রোগ উৎপন্ন করাইয়া দেন। ঐ সময়ে আচার্যদেবের সহিত যে কয়েকজন শিষ্য ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে যিনি প্রধান, তিনি সিদ্ধমন্ত্র জপ করিয়া অতি অল্প দিবসের মধ্যেই ঐ দুরারোগ্য রোগ হইতে গুরুদেবকে মুক্ত করেন।

এক দিবস শঙ্করাচার্য ব্রহ্মপুত্র নদীতে স্নান করিবার সময় কয়েকজন তীর্থযাত্রীর নিকট হইতে শ্রবণ করেন যে, এই পৃথিবীর মধ্যে জম্বুদ্বীপ সকলের প্রধান, তন্মধ্যে ভারতবর্ষ সর্বশ্রেষ্ঠ, আবার ভারতবর্ষের মধ্যে কাশ্মীর দেশ সর্বাপেক্ষা উত্তম স্থান। ঐ স্থানে সর্ব-বিদ্যা-প্রকাশিনী সারদাদেবী নিরন্তর বিরাজমানা রহিয়াছেন। যেমন বেদান্তের সমান শাস্ত্র নাই, মেরুর সদৃশ পর্বত নাই, তত্ত্বজ্ঞান অপেক্ষা তীর্থ নাই এবং হরির তুল্য আর দেবতা নাই, সেইরূপ কাশ্মীরের ন্যায় সুন্দর স্থানও আর নাই।

এই কথা শ্রবণ করিয়া শঙ্করের হৃদয়ে কাশ্মীর-দর্শন-লালসা বলবতী হইয়া উঠে। তিনি অনতিবিলম্বেই শিষ্যদিগকে সঙ্গে লইয়া কাশ্মীর যাত্রা করেন। কাশ্মীর-গমন-সময়ে পথিমধ্যে গৌরীপাদ স্বামীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তিনি শঙ্করকে সম্বোধন করিয়া বলেন, 'শঙ্কর! তোমার ভাষ্য রচনার কথা শুনিয়া আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। ইতঃপূর্বে আমি মাণ্ডুক্যোপনিষদের বার্তিক প্রণয়ন করিয়াছিলাম; শুনিলাম, তুমি তাহাতে ভাষ্য রচনা করিয়াছ। ঐ ভাষ্য শ্রবণ করিবার জন্য আমি তোমার নিকট গমন করিতেছিলাম।' মহাযোগী গৌরীপাদ স্বামীর কথা শ্রবণ করিয়া শঙ্করদেব ভাষ্যখানি তাঁহার করে অর্পণ করেন। যোগিবর আদ্যোপান্ত উহা পাঠ করিয়া আনন্দাশ্রুতে বক্ষঃস্থল প্লাবিত করেন এবং শত শত প্রশংসাবাদ করিতে করিতে গৃহে প্রত্যাগমন করেন। শঙ্করাচার্য ক্রমে ভূস্বর্গ কাশ্মীরে আসিয়া উপস্থিত হন।

এক দিবস তিনি বিদ্যাভদ্রাসনে আরোহণ করিতেছেন, এরূপ সময়ে সারদাদেবী দৈববাণীতে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলেন, 'শঙ্কর! তোমার দেহ অশুদ্ধ। ঐ পীঠে আরোহণ করিতে হইলে দেহশুদ্ধির আবশ্যক। অঙ্গনা উপভোগ করিয়া তুমি কামকলা ও কামশাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছ। সেই জন্য তোমার দেহ অপবিত্র রহিয়াছে।

দৈববাণী শ্রবণ করিয়া শঙ্করাচার্য বলেন, 'দেবি! আমি আজন্ম এ দেহে কোনরূপ পাপ কার্য করি নাই, অন্য শরীরে যাহা কৃত আছে, তাহাতে কদাচ আমার দেহ অশুচি হইতে পারে না। দেবি! পূর্বজন্মে যে ব্যক্তি শূদ্র ছিল, পরজন্মে সুকৃতিবশে ব্রাহ্মণ-কুলে তাহার জন্ম হইলে সে কি বেদে অনধিকারী হইবে?' শঙ্করের এই যুক্তি-পূর্ণ কথা শ্রবণ করিয়া সারদাদেবী বিদ্যাভদ্রাসনে আসিতে অনুমতি দেন। শঙ্করাচার্য ঐ স্থানে কিছুদিন থাকিয়া কেদারনাথ গমন করেন।

ভগবান্ শঙ্করাচার্য বেদব্যাসের বরে বত্রিশ বৎসর কাল মাত্র জীবিত থাকিয়া, কেদারনাথ পর্বত-সান্নিধানে অপ্রকট হন। এই অল্প কালের মধ্যে তিনি সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়া বৌদ্ধমত খণ্ডন, আর্যধর্মের উদ্ধার, ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য, দশোপনিষদ্-ভাষ্য, শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্-ভাষ্য, ভারতৈকপঞ্চরত্নের ভাষ্য*, আনন্দলহরী, মোহমুদ্গর,

* 'গীতা সহস্রনামৈব স্তোত্ররাজমনুস্মৃতিঃ।
গজেন্দ্রমোক্ষণঞ্চৈব পঞ্চরত্নানি ভারতে॥'

গীতা, বিষ্ণুর সহস্রনাম, স্তোত্ররাজ, অনুস্মৃতি এবং গজেন্দ্রমোক্ষণ এই কয়েকটিকে ভারতের পঞ্চরত্ন কহে।

সাধন-পঞ্চক, যতিপঞ্চক, আত্মবোধ, অপরাধভঞ্জন, বেদসার-শিবস্তব, গোবিন্দাষ্টক, যমক-ষট্‌পদী স্তুতি প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া জগতে অক্ষয় কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন। ইনি দীর্ঘজীবি হইলে আরও কি করিতেন, তাহা বলা যায় না।

ভগবান্ শঙ্করাচার্যের মোহমুদ্গর ভারতের এক অমূল্য রত্ন। পাঠক-পাঠিকার অবগতির জন্য সেই অমূল্য রত্ন 'মোহমুদ্গর' এই স্থানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

মোহমুদ্গর

(১)

মূঢ় জহীহি ধনাগমতৃষ্ণাং
কুরু তনুবুদ্ধেমনঃসি বিতৃষ্ণাম্।
যল্লভসে নিজ-কর্মোপাত্তং,
বিত্তং তেন বিনোদয় চিত্তম্ ॥

মূঢ়! ধনলাভ-তৃষ্ণা কর পরিহার,
অল্পমতী! কর মনে বৈরাগ্য-সঞ্চার।
আপনার কর্মফলে লভিবে যে ধন,
তাহাতেই কর নিজ চিত্ত-বিনোদন।

(২)

কা তব কান্তা, কস্তে পুত্রঃ,
সংসারোঽয়মতীববিচিত্রঃ।
কস্য ত্বং বা কুত আয়াত-
স্তত্ত্বং চিন্তয় তদিদং ভ্রাতঃ ॥

কে বা তব কান্তা আর কে তব কুমার,
অতীব বিচিত্র এই মায়ার সংসার।
কোথা হতে আসিয়াছ, তুমি বা কাহার,
ভাবনা করহ ভাই, এই তত্ত্ব সার।

(৩)

নলিনীদলগত-জলমতিতরলং
তদ্বজ্জীবনমতিশয়-চপলম্।
বিদ্ধি ব্যাধিব্যালগ্রস্তং,
লোকং শোকহতঞ্চ সমস্তম্ ॥

পদ্মপত্রে বারিবিন্দু যেমন চঞ্চল,
জীবন তেমন হয় অতীব চপল।
জানিও, করেছে গ্রাস ব্যাধি-বিষধর,
সমস্ত সংসার তাই শোকে জরজর।

(৪)

অঙ্গং গলিতং পলিতং মুণ্ডং
দন্তবিহীনং জাতং তুণ্ডম্ ।
করধৃত-কম্পিত-শোভিতদণ্ডং,
তদপি ন মুঞ্চত্যাশাভাণ্ডম্ ॥

ধবল বরণ কেশ, শরীর গলিত,
বদন দশনহীন দেখিতে ঘৃণিত,
চলিয়া যাইতে যষ্টি কাঁপে সদা করে,
তবু আশাভাণ্ড নর নাহি ত্যাগ করে ।

(৫)

দিনযামিন্যো সায়ংপ্রাতঃ,
শিশির-বসন্তৌ পুনরায়াতঃ ।
কালঃ ক্রীড়তি গচ্ছত্যায়ু-
স্তদপি ন মুঞ্চত্যাশাবায়ুঃ ॥

দিবস, যামিনী আর সায়াহ্ন, প্রভাত,
শিশির, বসন্ত পুনঃ করে যাতায়াত ;
এইরূপে গেলে কাল, ক্ষয় পায় আয়ু
তথাপি মানব নাহি ছাড়ে আশাবায়ু ।

(৬)

যাবজ্জননং তাবন্মরণং,
তাবজ্জননী-জঠরে শয়নম্ ।
ইতি সংসারে স্ফুটতর-দোষঃ,
কথমিহ মানব তব সন্তোষঃ ॥

যাবৎ জনম হয় তাবৎ মরণ,
জননীর জঠরেতে আবার শয়ন ;
এ সংসার এইরূপ দুঃখের আগার,
তবে কেন হে মানব ! সন্তোষ তোমার ?

(৭)

সুরবরমন্দির-তরুতল-বাসঃ,
শয্যা ভুতলমজিনং বাসঃ ।
সর্ব-পরিগ্রহ-ভোগ-ত্যাগঃ,
কস্য সুখং ন করোতি বিরাগঃ ॥

দেবের মন্দিরে কিম্বা তরুতলে বাস,
ভুতলে শয়ন আর মৃগচর্ম বাস,

সমুদয় পরিজন-ভোগ-পরিহার,
এ হেন বিরাগে সুখ, নাহি হয় কার ?

(৮)

অষ্ট-কুলাচল-সপ্ত-সমুদ্রাঃ,
ব্রহ্ম-পুরন্দর-দিনকর-রুদ্রাঃ।
ন ত্বং নাহং নায়ং লোক-
স্তদপি কিমর্থং ক্রিয়তে শোকঃ ॥

অষ্ট-কুলাচল আর সপ্ত রত্নাকর,
ব্রহ্মা, পুরন্দর কিম্বা রুদ্র, দিনকর,
তুমি, আমি, এই বিশ্ব সকলি স্বপন ;
তবে কেন শোকে তুমি হও হে মগন ?

(৯)

বালস্তাবৎ ক্রীড়াসক্ত-
স্তরুণস্তাবৎ তরুণীরক্তঃ।
বৃদ্ধস্তাবচ্চিন্তামগ্নঃ,
পরমে ব্রহ্মণি কোঽপি ন লগ্নঃ ॥

খেলায় আসক্ত যত বালকের দল
তরুণীতে অনুরক্ত তরুণ সকল,
সংসার-চিন্তায় মগ্ন বৃদ্ধ সমুদয়,
পরমব্রহ্মেতে মগ্ন কেহই ত নয়।

(১০)

যাবদ্বিত্তোপার্জ্জন-শক্ত-
স্তাবন্নিজ-পরিবারো রক্তঃ
তদনু চ জরয়া জর্জ্জরদেহে,
বার্ত্তাং কোঽপি ন পৃচ্ছতি গেহে ॥

যত দিন করে নর ধন উপার্জন,
তত দিন থাকে বশে নিজ পরিজন ;
পরে যবে বৃদ্ধকালে জীর্ণ হয় দেহ,
ডেকেও জিজ্ঞাসা ঘরে, নাহি করে কেহ।

(১১)

অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যং
নাস্তি ততঃ সুখলেশঃ সত্যম্।
পুত্রাদপি ধনভাজাং ভীতিঃ,
সর্বত্রৈষা বিহিতা রীতিঃ ॥

'অর্থ অনর্থের মূল' ভাব সদা মনে,
যথার্থই লেশমাত্র সুখ নাহি ধনে ;
তনয় হতেও হয় ধনশালী ভীত,
সর্বত্রই এই রীতি আছয়ে বিহিত।

(১২)

মা কুরু ধন-জন-যৌবন-গর্বং,
হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্বম্ !
মায়াময়মিদমখিলং হিত্বা,
ব্রহ্মপদং প্রবিশাশু বিদিত্বা ॥

ধন, জন, যৌবনের ত্যজ অহঙ্কার,
নিমেষে কৃতান্ত করে সকলি সংহার ;
পরিহর এ সংসার ঘোর মায়াময়,
জানি, ব্রহ্মপদ সবে করহ আশ্রয়।

(১৩)

শত্রৌ মিত্রে পুত্রে বন্ধৌ,
মা কুরু যত্নং সমরে সন্ধৌ।
ভব সমচিত্তঃ সর্বত্র ত্বং,
বাঞ্ছস্যচিরাদ্ যদি বিষ্ণুতম্ ॥

শত্রু, মিত্র, পুত্র, বন্ধু, সন্ধি কিংবা রণ,
এ সব বিষয়ে নাহি করিও যতন ;
সর্বভূতে সমভাব ভাব নিরন্তর,
বিষ্ণুপদ বাঞ্ছা যদি করহ সত্বর।

(১৪)

ত্বয়ি ময়ি চান্যত্রৈকো বিষ্ণু-
র্ব্যর্থং কুপ্যসি মধ্যসহিষ্ণুঃ ;
সর্বং পশ্যাত্মন্যাত্মানং,
সর্বত্রোৎসৃজ ভেদজ্ঞানম্ ॥

তোমাতে আমাতে সর্বজীবে এক হরি,
বৃথা কেন কর ক্রোধ ধৈর্য পরিহরি ?
আপন আত্মায় হের আত্মা সবাকার,
সর্বভূতে ভেদজ্ঞান কর পরিহার।

(১৫)

কামং ক্রোধং লোভং মোহং
তত্ত্বাত্মান পশ্য হি কোঽহম্।

আত্মজ্ঞানং-বিহীনা মূঢ়া-
স্তে পচ্যন্তে নরকে নিগূঢ়াঃ ॥

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, করি পরিহার,
'কে আমি' তা আপনারে দেখ একবার।
আত্মজ্ঞান-পরিহীন যত মূঢ়জন,
দুস্তর নরকে ডুবি পচে অনুক্ষণ।

(১৬)

তত্ত্বং চিন্তয় সততং চিত্তে,
পরিহর চিন্তাং নশ্বর-বিত্তে।
ক্ষণমিহ সজ্জন-সঙ্গতিরেকা,
ভবতি ভবার্ণব-তরণে নৌকা ॥

পরমাত্ম-তত্ত্ব সদা করহ চিন্তন,
অনিত্য ধনের চিন্তা করহ বর্জন,
ক্ষণকাল সাধুসঙ্গ কেবল সংসারে,
একমাত্র তরি ভবসিন্ধু তরিবারে।

ষোড়শ-পজ্ঝটিকাভিরশেষঃ,
শিষ্যাণাং কথিতোঽভ্যুপদেশঃ ;
যেষাং নৈষ করোতি বিবেকং,
তেষাং কঃ কুরুতামতিরেকম্ ॥

পজ্ঝটিকা ছন্দে শ্লোক ষোড়শ রচিত,
শিষ্য-উপদেশ তরে হইল কথিত ;
ইহাতেও না হইবে বিবেক যাহার,
কে বা আর উপদেশে কি করিবে তার ?

—০—

চৈতন্যদেব

১৪০৭ শকে বা ১৪৮৫ খ্রীস্টাব্দে ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমাতিথিতে চৈতন্যদেব নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম জগন্নাথ মিশ্র। পুরন্দর তাঁহার আর এক উপাধি ছিল। জগন্নাথ বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি বিদ্যাশিক্ষার্থে বা গঙ্গাস্নানার্থে শ্রীহট্ট হইতে নবদ্বীপ আগমন করেন। তিনি নবদ্বীপ-নিবাসী নীলাম্বর চক্রবর্তীর কন্যা শচীদেবীর পাণিগ্রহণ করিয়া নবদ্বীপেই বাস করিয়াছিলেন। এই শচীদেবীর গর্ভে চৈতন্যদেবের জন্ম হয়। কথিত আছে, চৈতন্যদেব ত্রয়োদশ মাস গর্ভবাস করেন। জগন্নাথ মিশ্র অতি শান্তপ্রকৃতি ও পরম ধার্মিক ছিলেন। দেবার্চনা, তপজপাদি এবং শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠেই সমস্ত সময় অতিবাহিত করিতেন। শচীদেবীও পরম ভক্তিমতী ও পতিপরায়ণা ছিলেন।

শচীদেবীর গর্ভে মিশ্র মহাশয়ের একে একে আটটি কন্যা জন্মিয়া অকালে গতাসু হইলে, সৌভাগ্যক্রমে একটি পুত্র জন্মে। তিনি ঐ পুত্রের নাম বিশ্বরূপ রাখেন। বিশ্বরূপ বয়োবৃদ্ধি সহকারে উত্তমরূপে বিদ্যাশিক্ষা করেন। তিনি প্রায় যৌবন-সীমায় পদার্পণ করিয়াছেন, এরূপ সময়ে চৈতন্যদেব আবির্ভূত হন।

চৈতন্যের আবির্ভাব-সময়ে চন্দ্রগ্রহণ হইয়াছিল। গ্রহণ-সময়ে ভারতের চিরপ্রচলিত প্রথানুসারে সর্বসাধারণে নানাপ্রকার দানধর্ম করিয়া থাকেন। যদিও উহা অন্য অভিপ্রায়ে হইয়াছিল, তথাপি অনেকের বিশ্বাস যে, এরূপ শুভ সময়ে যাঁহার জন্ম হইয়াছে, তিনি অবশ্যই কোন মহাপুরুষ হইবেন।

চৈতন্যদেব ভূমিষ্ঠ হইবার পর অদ্বৈতাচার্য* ও অন্যান্য বৈষ্ণবগণ দেশীয় প্রথানুসারে সিন্দুর ও হরিদ্রা প্রভৃতি সূতিকাগারে পাঠাইয়া দেন। অদ্বৈতের সহধর্মিণী সীতাদেবী, শিশুর নাম 'নিমাই' রাখেন। ডাকিনী-শাঁখিনীর হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য 'নিমাই' এই মরাণ্ডে নাম রাখা হইয়াছিল। আজও আমাদের দেশে মৃতবৎসার সন্তান হইলে ঐরূপ নাম রাখিয়া থাকে। নামকরণ-সময়ে তাঁহার নাম বিশ্বম্ভর হয়।

এরূপ জনশ্রুতি আছে যে, একদা অদ্বৈতাচার্য নবদ্বীপের ঘাটে গঙ্গাস্নান করিবার সময় দেখিতে পান, একটি তুলসীপত্র স্রোতের প্রতিকূলে ভাসিয়া যাইতেছে। তিনি এই আশ্চর্য ঘটনা দেখিয়া উক্ত তুলসীপত্রের অনুসরণ করেন। তিনি যাইয়া দেখিলেন, ঐ তুলসীপত্র ক্রমে স্নানায়মানা শচীদেবীর গর্ভ স্পর্শ করিল। শচীদেবী তৎকালে গর্ভবতী ছিলেন। এই আশ্চর্য ঘটনা দেখিয়া অদ্বৈতাচার্য শচীর গর্ভে ভগবানের

*অদ্বৈতাচার্যের নিবাস শান্তিপুর, ইঁহার অপর নাম কমলাক্ষ। ইঁহার শিষ্যগণ ইঁহাকে ঈশ্বর হইতে অভেদে পূজা ও ভক্তি করিত, সেইজন্য ইঁহার নাম অদ্বৈত হয়। অধ্যাপনা উপলক্ষ্যে ইনি নবদ্বীপে বাস করেন। ইনি মাধবাচার্য সম্প্রদায়-ভুক্ত মাধবেন্দ্রপুরীর নিকট দীক্ষিত হন। সেই অবধি ইঁনি বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ ও ভক্তি-মাহাত্ম্য প্রচার করিয়া আসিতেছিলেন।

আবির্ভাব হইয়াছে, ইহা বুঝিতে পারেন এবং সেই জন্যই তিনি চৈতন্যদেবের জন্ম-সময়ে সীতাদেবীকে সূতিকাগারে পাঠাইয়া দেন।

চৈতন্যদেব শৈশবকালে অতিশয় চঞ্চল এবং বিলক্ষণ উদ্ধত ছিলেন। তিনি প্রতিবেশীদিগের বাটিতে যাইয়া অত্যন্ত উৎপাত করিতেন, কাহারও ছেলেকে কাঁদাইতেন, কাহারও ঘুমন্ত শিশুকে জাগাইয়া দিতেন, আবার কাহারও ঘরে প্রবেশ করিয়া খাদ্য-সামগ্রী লইয়া পলায়ন করিতেন। চৈতন্যদেব গঙ্গাস্নানে যাইয়া লোকের উপর অত্যন্ত উপদ্রব করিতেন। তিনি কলকুচা করিয়া সেই জল লোকের গায়ে দিতেন, কখনও জল ছিটাইয়া কাহারও ধ্যানভঙ্গ করিয়া দিতেন, কখনও স্নানার্থীদিগের শুষ্ক কাপড় লইয়া লুকাইয়া রাখিতেন, কখনও ডুবসাঁতার কাটিয়া স্ত্রীলোকদিগের পদদ্বয়ের মধ্যে ভাসিয়া উঠিতেন, আবার কাহারও বা পা ধরিয়া টানিতেন। তাঁহার দৌরাত্ম্যের কথা লইয়া প্রায় সকলেই শচীদেবীর নিকট অনুযোগ করিতে আসিত। শচীদেবী কাহাকেও মিষ্ট কথা বলিয়া, কাহারও কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া, তাহাদিগকে বিদায় করিতেন।

একদিবস শচীদেবী নিমাইয়ের দুর্বৃত্ততার জন্য অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে প্রহার করিতে উদ্যত হইলে, তিনি পলাইয়া আস্তাকুঁড়ে যাইয়া দাঁড়াইয়া থাকেন। তিনি জানিতেন যে, মা কখনই এই স্থানে আসিতে পারিবেন না। যাহা হউক, তিনি পুত্রকে স্নান করিয়া আসিতে বলেন। নিমাই মাতার কথা শুনিয়া বলেন, 'মা! এই আস্তাকুঁড় অপবিত্র নহে, মানুষ যাহাতে অপবিত্র হয়, তাহা মানুষের হৃদয়েই আছে।'

কিছুদিন পরে জগন্নাথ পুত্রকে পাঠশালায় পাঠাইয়া দেন। নিমাই অতিশয় বুদ্ধিমান ছিলেন। অল্প দিবসের মধ্যেই পাঠশালার পাঠ শেষ করিয়া সংস্কৃত পড়িতে আরম্ভ করেন। ঐ সময়ে বিশ্বরূপ প্রায় যৌবন-সীমায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। নানা-শাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ জ্ঞানলাভ হইয়াছিল। জগন্নাথ মিশ্র পুত্রের বিবাহকাল উপস্থিত দেখিয়া, তাঁহার বিবাহ দিবার জন্য চেষ্টা করেন। বাল্যকাল হইতেই বিশ্বরূপ সংসারের প্রতি বীতরাগ ছিলেন। তিনি বিবাহের প্রস্তাব শুনিয়া রাত্রি যোগে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করেন। বৃদ্ধ মাতা-পিতা পুত্র-বিরহে শোক-সাগরে নিমগ্ন হন। ঐ সময়ে তাঁহারা কেবল চৈতন্যের মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করিয়া বিশ্বরূপের কথা কিয়দংশ ভুলিয়াছিলেন। নিমাই-এর যাহা কিছু চাঞ্চল্য ছিল, তাহা এই সময় হইতে একেবারে তিরোহিত হয়। ১৪১৬ শকে নিমাই-এর উপনয়ন হয়। ঐ সময়ে তিনি 'গৌরহরি' নাম প্রাপ্ত হন।

নিমাই গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করেন। তাঁহার বুদ্ধি ও স্মরণশক্তি এত অধিক ছিল যে, তিনি একবার যাহা পড়িতেন, তাহা কণ্ঠস্থ করিতে পারিতেন। একবার ব্যাখ্যা শুনিলে আর ভুলিতেন না।

দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে নিমাই-এর পিতৃ-বিয়োগ হয়। পিতৃ-বিয়োগে চৈতন্যদেব মহা কষ্টে পড়েন। তিনি কষ্টে পড়িয়া বিদ্যাভ্যাসে অধিকতর মনোনিবেশ করেন এবং অসাধারণ প্রতিভাবলে অচিরে গঙ্গাদাসের টোলে প্রধান ছাত্র হইয়া উঠেন। ইহার পর তিনি বাসুদেব সার্বভৌমের নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন।

চৈতন্যদেব সুপুরুষ ছিলেন। তাঁহার গৌরবর্ণ কমনীয় কান্তি, মনোহর মুখচ্ছবি এবং মোহিনী-শক্তি-পূর্ণ আয়ত লোচনদ্বয় দেখিলে, লোকের মন মোহিত হইত। যৌবন-সীমায় পদার্পণ করায় তাঁহার সৌন্দর্য আরও ফুটিয়া উঠিয়াছিল। শচীদেবী পুত্রের

বিবাহকাল উপস্থিত দেখিয়া তাঁহার বিবাহের জন্য ব্যস্ত হন ; কিন্তু বিবাহ-প্রস্তাবে পাছে নিমাই বিশ্বরূপের মতো সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করে, ইহা তাঁহার বিশেষ ভয় ছিল। নিমাই মাতার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া বিবাহ করিতে মত প্রকাশ করেন। নিমাই পিতার মৃত্যুর প্রায় তিন বৎসর পরে নবদ্বীপ নিবাসী বল্লভাচার্যের কন্যা লক্ষ্মীদেবীর পাণিগ্রহণ করেন।

এই বিবাহের কয়েক বৎসর পরে, নিমাই মুকুন্দসঞ্জয়ের চণ্ডীমণ্ডপে চতুষ্পাঠী করিয়া অধ্যাপনায় প্রবৃত্ত হন। অল্পদিবসের মধ্যেই তাঁহার খ্যাতি-প্রতিপত্তি চারিদিকে বিস্তীর্ণ হয়। এই সময়ে একজন দিগ্বীজয়ী পণ্ডিত, নানা দেশের পণ্ডিতবর্গকে বিচারে পরাস্ত করিয়া নবদ্বীপের পণ্ডিত-মণ্ডলীর সহিত বিচারার্থ আসিয়া উপস্থিত হন। যে সময়ে নিমাই সশিষ্য গঙ্গাতীরে আহ্নিক করিতেছিলেন, সেই সময়ে তথায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হয়। নিমাই তাঁহার নাম এবং বিদ্যাবত্তার কথা পূর্বেই শুনিয়াছিলেন। তিনি পণ্ডিতকে গঙ্গার একটি স্তব আবৃত্তি করিতে বলেন। দিগ্বিজয়ী নিজকৃত গঙ্গার স্তব পাঠ করিয়া তাহার ব্যাখ্যা করেন। নিমাই ব্যাখ্যা শুনিয়া ঐ ব্যাখ্যার নানাপ্রকার দোষ দেখাইয়া দেন। পণ্ডিত মহাশয় নিমাই-এর নিকট পরাস্ত হইয়া প্রস্থান করেন।

নিমাই এতাদৃশ পণ্ডিত হইয়াও আপন বিদ্যার গৌরব করিতেন না। কথিত আছে যে, ন্যায়দর্শনে নবদ্বীপ ভারতবর্ষের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য। নিমাই সেই ন্যায়-সম্বন্ধীয় গৌতম শাস্ত্রের টীকা করিয়াছিলেন ; কিন্তু নিমাই-এর অসাধারণ ঔদার্যবশতঃ ঐ গ্রন্থ নষ্ট হইয়া যায়।

এক দিবস নিমাই নৌকাযোগে গঙ্গা পার হইতেছিলেন। ঐ নৌকায় একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন। কথায় কথায় দুইজনে পরস্পর আলাপ হয়। নিমাই-এর হস্তে একখানি পুঁথি দেখিয়া ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করেন, 'এখানি কি পুঁথি ?' নিমাই বলেন, 'ইহা আমার রচিত ন্যায়শাস্ত্রের টীকা।' সেই কথা শুনিবামাত্র ব্রাহ্মণের মুখ মলিন হইয়া যায়। নিমাই তাহা বুঝিতে পারিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করায়, ব্রাহ্মণ বলেন, 'আমিও একখানি টীকা রচনা করিয়াছি ; কিন্তু আপনার টীকার নাম শুনিলে আমার টীকা আর কেহ গ্রাহ্য করিবে না।' ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া নিমাই ঐ পুঁথিখানি নদীগর্ভে ফেলিয়া দেন। এরূপ নিঃস্বার্থতার দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে অতি বিরল।

একদিবস নিমাই সশিষ্য রাজপথ দিয়া যাইতেছিলেন, সেই সময়ে মুকুন্দ দত্তও গঙ্গাস্নানে যাইতেছিলেন। মুকুন্দ দত্ত চৈতন্যের সহাধ্যায়ী ছিলেন , কিন্তু এক্ষণে তিনি বিশুদ্ধ হরিভক্তিপরায়ণ হইয়াছিলেন ও হরিগুণ-গানেই সময় অতিবাহিত করিতেন। মুকুন্দ নিমাইকে অবৈষ্ণব বলিয়া জানিতেন, সুতরাং তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে সম্ভাষণ করিতে হইবে, এই ভয়ে অন্য পথ অবলম্বন করেন। নিমাই ইহা বুঝিতে পারিয়া বলেন, 'আমি এমন বৈষ্ণব হইব যে, যাহারা আমাকে দেখিয়া পলায়ন করিতেছে, তাহারাও আমার গুণকীর্তন করিবে।'

নিমাই প্রথম হইতেই শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠে অনুরক্ত ছিলেন। তাহাতেই তাঁহার মন বৈষ্ণব-ধর্মে আস্থাযুক্ত হয়। এক্ষণে এই ঘটনায় তিনি বৈষ্ণবধর্মাচরণে প্রবৃত্ত হন। এই সময়ে ঈশ্বরপুরী* নামক একজন পরম ভাগবত নবদ্বীপে আগমন করেন। তিনি

* হালিসহরের সন্নিকটে মারহট্ট নামক গ্রামে ঈশ্বরপুরী জন্মগ্রহণ করেন। তিনি

শ্রীবাসের গৃহে অবস্থিতি করিতেন। শ্রীবাসের আদি নিবাস শ্রীহট্ট ছিল। তিনি বিদ্যাশিক্ষার জন্য নবদ্বীপে আসিয়া বাস করেন। শ্রীবাস পরম বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি আপন বাটীতে থাকিয়া উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম কীর্তন ও লোকের সহিত ধর্মসম্বন্ধে নানা তর্ক-বিতর্ক করিতেন। এই স্থানে ঈশ্বরপুরীর সহিত নিমাই-এর বিশেষ সম্প্রীতি হইয়াছিল।

নিমাই ঊনিশ বৎসর বয়সে পূর্ববঙ্গে যাত্রা করেন। তিনি শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম প্রভৃতি নানা স্থান পরিদর্শন করিয়া পদ্মা নদীর তীরে কিছুদিন অবস্থিতি করেন। তাঁহার পূর্ববঙ্গে অবস্থানকালে তাঁহার সহধর্মিণী লক্ষ্মী দেবী মৃত্যুমুখে পতিত হন। এরূপ জনশ্রুতি আছে যে, সর্পদংশনে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল।

নিমাই গৃহে আসিয়া মাতাকে দুঃখিত দেখিয়া তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। মাতাঠাকুরাণী কোন উত্তর না দিয়া কেবল ক্রন্দন করিতে থাকেন। পরে নিমাই লক্ষ্মী দেবীর প্রাণ-বিয়োগের কথা শ্রবণ করিয়া শোকে অধীর হন, পরে ধৈর্যাবলম্বন করিয়া বলেন, 'কস্য কে পতিপুত্রা মোহ এব হি কেবলম্' ইতি। এই বলিয়া তিনি মাতাকে নানা মতে বুঝাইয়া সান্ত্বনা করেন।

এই সময় হইতে নিমাই-এব ধর্মানুরাগ প্রবল হয়। এদিকে শচী দেবী পুত্রের পুনর্বার বিবাহ দিবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হন, এবং অল্প দিবসের মধ্যেই সনাতন মিশ্রের কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত তাঁহার বিবাহ দেন। নবদ্বীপ-নিবাসী জনৈক কায়স্থ-বংশোদ্ভব ধনাঢ্য ব্যক্তি, তাঁহার এই বিবাহের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করেন।

দ্বিতীয়বার বিবাহেব প্রায় এক বৎসর পরে অর্থাৎ একুশ বৎসর বয়সে তিনি পিতৃ-লোকের সদ্গতির জন্য গয়াক্ষেত্রে গমন করেন। তিনি তথায় বিষ্ণুপদ-মন্দিরে ব্রাহ্মণ-দিগের স্তবস্তুতি, পূজা, বন্দনা প্রভৃতি দর্শন ও শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ হন। তাঁহার হৃদয়ে ভক্তির উচ্ছ্বাস প্রবাহিত হয়। ঐ স্থানে পূর্বপরিচিত ঈশ্বরপুরীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তাঁহার সহিত আলাপে নিমাই-এর ভক্তিযোগ আরও বৃদ্ধি পাওয়ায়, তিনি উক্ত পুরীর নিকট দশাক্ষর মন্ত্র গ্রহণ করেন। এই সময় হইতেই তাঁহার জীবন নববেশ ধারণ করে। যে ভক্তিতে ভক্তেরা বিমোহিত হয়, সেই ভক্তির বীজ এই সময় হইতেই তাঁহার হৃদয়ে অঙ্কুরিত হইয়াছিল।

মন্ত্রগ্রহণেব পর চৈতন্যদেব নবজীবন লাভ করিয়া নবদ্বীপে আসেন। তিনি আপনার অভিমান, জ্ঞানের গরিমা, শাস্ত্রাভিজ্ঞতার জ্বলন্ত মূর্তি, তর্কপ্রিয়তার জীবন্ত উচ্ছ্বাস প্রভৃতি সমস্তই পরিত্যাগ করিয়া একেবারে ভক্তিপ্রেমে মগ্ন হইয়া পড়েন। এরূপ শুনিতে পাওয়া যায় যে, একদিবস চৈতন্যদেব শুক্লাম্বর নামক একজন বৈষ্ণবের গৃহে হরিনাম শুনিয়া ভাবে বিভোর হইয়া 'কোথায় আমার দয়াল হরি' এই কথা বলিতে বলিতে কুটীরের একটি খুঁটি এরূপ ভাবে জড়াইয়া ধরেন যে, তাহা ভাঙ্গিয়া তিনি

গৃহাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন। ঈশ্বরপুরী মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য ছিলেন এবং তাঁহার নিকটই ভক্তিতত্ত্ব শিক্ষা করিয়াছিলেন; মাধবেন্দ্রপুরী অযাচক সন্ন্যাসী ছিলেন। তিনি ভিক্ষা করিতে কাহারও দ্বারে যাইতেন না। কেহ যদি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে কিছু আহার করিতে দিত, তিনি তাহাই গ্রহণ করিতেন, অন্যথা উপবাসী থাকিতেন।

আমাকে ছাড়িয়া সন্ন্যাসী হইবে? আমি যে তোমাকে পতি পাইয়া বড় ভাগ্যবতী হইয়াছিলাম। আমার যে কত আশা ছিল। নাথ! আমি আমার জন্য ভাবিতেছি না, তোমার জন্যই ভাবিতেছি। তুমি কেমন করিয়া এই নবীন বয়সে সন্ন্যাসীর কঠোর দুঃখ বহন করিবে? তোমার সন্ন্যাস-গ্রহণে, তোমার অনাথিনী মাতা নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিবেন। ধর্ম-সাধন করিতে যাইয়া মাতৃহত্যা-পাপে লিপ্ত হইয়া পড়িবে? আমাদিগকে এ অবস্থায় পরিত্যাগ করিয়া যাইলে, লোকে তোমার বিশুদ্ধ চরিত্রে কলঙ্ক রটনা করিবে। আমি সে সকল কিরূপে সহ্য করিব?'

গৌরাঙ্গ, পত্নীর ঐ সকল কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে নানাবিধ প্রবোধবাক্যের দ্বারা বুঝাইয়া বলেন, 'দেখ, বিষ্ণুপ্রিয়া! শ্রীকৃষ্ণ সকলের পতি। তুমি তাঁহাকেই পতিরূপে বরণ করিয়া যোগাভ্যাস কর; তাঁহাকে পতিরূপে বরণ করিতে পারিলে আর কখন বিচ্ছেদ হইবে না। সে প্রেমের সমান আর প্রেম নাই।' বিষ্ণুপ্রিয়া স্বামীকে সন্ন্যাসী হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার অনেক চেষ্টা করেন। স্বামীর সহিত বাদানুবাদ করিয়া যখন বুঝিতে পারিলেন, আর কোন উপায় নাই, তখন তিনি স্থির ও গম্ভীর স্বরে বলিয়াছিলেন, 'নাথ! তুমি ভগবানের আদেশপালনে ব্রতী, আমি সে ব্রত ভঙ্গ করিয়া পাপভাগিনী হইতে চাহি না। আমার সাংসারিক সুখে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। তোমার যাহাতে সুখ, আমারও তাহাতেই সুখ, আমি আর তোমাকে দুঃখ জানাইয়া তোমার কর্তব্য কার্যের বাধা দিতে চাহি না।' গৌরাঙ্গ এইরূপে পত্নীর নিকটে বিদায় গ্রহণ করেন।

১৪৩১ শকে বা ১৫০৯ খৃষ্টাব্দে উত্তরায়ণ সংক্রান্তির পূর্ব-দিবসে নিমাই গৃহত্যাগ করেন। শচী দেবী শোকাতুরা এবং পাগলিনীপ্রায় হইয়া বিলাপ করিতে থাকেন। বিষ্ণুপ্রিযা শোকে অধীরা হইয়া ধরাতলে পড়িয়া মূর্ছিতা হন। গৌড়ের আনন্দময় ভবন শ্মশানের ন্যায় হইয়া উঠে। পরদিবস প্রাতে শ্রীগৌরাঙ্গদেবেব প্রস্থান-বার্তা প্রকাশ হইলে, নদীয়াবাসী ভক্তগণ একেবারে শোকসাগরে নিমগ্ন হন। ভক্তগণ সকলে মিলিত হইয়া পরামর্শ করিয়া গৌরাঙ্গকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য কাটোয়ায় গমন করিতে উদ্যত হন। সকল ভক্তেরই মনের অবস্থা সমান, সকলেই প্রভুর বিরহে একবারে অধীর, সকলেই প্রভুকে আনিতে যাইবার জন্য ব্যগ্র ও প্রস্তুত হন। কিন্তু বিজ্ঞ শ্রীবাস, বিবেচনা করিয়া বলেন যে, 'সকলে নদীয়া পরিত্যাগ করিয়া যাইলে প্রভুর ঘর-বাটী কে রক্ষা করিবে এবং শোকসন্তপ্তা শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়াকে কে সান্ত্বনা করিবে?' এই কথা বলিয়া শ্রীবাস সকলকে বুঝান এবং কয়েকজন যাইলেই যথেষ্ট হইবে, এইরূপ উপদেশ দেন। অবশেষে শ্রীবাসের উপদেশমত নিতাই, বক্রেশ্বর, মুকুন্দ, চন্দ্রশেখর ও দামোদর এই পাঁচজনে গমন করেন। প্রথম দিনে ঐ পাঁচজন ভক্ত কাটোয়া গিয়াছিলেন; কিন্তু দ্বিতীয় দিবসে গঙ্গাধর ও নরহরি নামক আরও দুইজন ভক্ত প্রভুর বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া তথায় গমন করেন।

নিমাই গৃহত্যাগ করিয়া কাটোয়াভিমুখে যাত্রা করেন। কাটোয়ায় সেই সময়ে কেশব ভারতী নামে একজন সন্ন্যাসী ছিলেন। নিমাই উত্তরায়ণ সংক্রান্তি দিবসে তাঁহার নিকটে সন্ন্যাসগ্রহণ করেন। এই সময়ে তাঁহার বয়স পঁচিশ বৎসর হইয়াছিল। তিনি এই নবীন বয়সে সংসারসুখে জলাঞ্জলি দিয়া পথের ভিখারী হন। সন্ন্যাসগ্রহণের পর

ভারতী মহাশয় কি নাম রাখিবেন, তাহাই চিন্তা করিতেছেন, এরূপ সময়ে কে যেন বলিয়া দেয়, 'উহার নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রাখুন।' ভারতী মহাশয় তাহাই করেন। তিনি নিমাই-এর নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রাখেন।

চৈতন্যদেব কয়েক দিবস পথে পথে হরি-সঙ্কীর্তন করিয়া, অবশেষে শান্তিপুরে আসিয়া উপস্থিত হন এবং নবদ্বীপ হইতে মাতাকে আনাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। শচীদেবী নিমাই-এর সন্ন্যাস বেশ দেখিয়া অবিরলধারে অশ্রুবিসর্জন করিতে থাকেন। তিনি নিমাইকে সম্বোধন করিয়া বলেন, 'বৎস নিমাই! বিশ্বরূপের ন্যায় নিষ্ঠুর ব্যবহার করিও না, সন্ন্যাসী হইয়া আমাকে ভুলিয়া থাকিও না, মধ্যে মধ্যে দেখা দিয়া আমার প্রাণরক্ষা করিও।' মাতার কথা শ্রবণ করিয়া নিমাই বলেন, 'মা! এ জীবনে আপনার ঋণ হইতে মুক্ত হইতে পারিব না। আপনি যে শরীর পোষণ করিয়াছেন, সেই আমার দেহ, আপনারই আছে জানিবেন। আপনি যখন যাহা আজ্ঞা করিবেন, আমি তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পন্ন করিব। সন্ন্যাসী বলিয়া আমার মন, পার্থিব বস্তু সকল হইতে নিস্পৃহ থাকিতে পারে, কিন্তু আপনাকে কখনই ভুলিতে পারিব না।' তিনি এই স্থানে মাতৃ-আজ্ঞা লইয়া নীলাচলে থাকিতে মনস্থ করেন।

চৈতন্যদেব আরও কয়েক দিবস শান্তিপুরে থাকিয়া, মাতা ও সঙ্গীগণের নিকট বিদায় লইয়া, নিতাই গদাধর প্রভৃতি কয়েকজন শিষ্য সমভিব্যাহারে পুরী যাত্রা করেন।* তিনি শ্রীমন্দিরে উপস্থিত হইলে জগন্নাথ-দর্শনে তাঁহার প্রেম-সিন্ধু একেবারে উদ্বেল হইয়া উঠে। তিনি জগন্নাথদেবকে ভাবাবেশে আলিঙ্গন করিবার ইচ্ছায় যেমন অগ্রসর হইবেন, অমনি প্রেম-বিহ্বল হইয়া মূর্ছিত হইয়া পড়েন। ঐ সময়ে সার্বভৌম ভট্টাচার্য মহাশয় তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি চৈতন্যের ঐরূপ অলৌকিক ভাবাবেশের অবস্থা দেখিয়া বাহক দ্বারা তাঁহাকে তুলিয়া নিজগৃহে লইয়া যান। তথায় নিত্যানন্দ প্রভৃতি শিষ্যগণ উচ্চৈঃস্বরে হরি-সংকীর্তন করিতে থাকায়, বেলা তৃতীয় প্রহরের সময় তাঁহার চৈতন্যসঞ্চার হয়। সার্বভৌম যখন শুনিলেন যে সন্ন্যাসী নবদ্বীপ-নিবাসী জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র এবং নীলাম্বর চক্রবর্তীর দৌহিত্র তখন তাঁহার আর আনন্দের সীমা রহিল না। সার্বভৌমেরও নিবাস নবদ্বীপ। তাঁহার পিতা ও নিলাম্বর সমসাময়িক লোক ছিলেন।

এক দিবস সার্বভৌমের সহিত চৈতন্যদেবের ঈশ্বর-সম্বন্ধীয় নানাবিধ তর্ক-বিতর্ক হয়। ঐ সময়ে চৈতন্যদেব সার্বভৌমকে বলিয়াছিলেন যে, 'আপনি যে বিদ্যায় বিভূষিত, তাহাতে ঐশ্বরিক কোন বিষয় জানিতে সমর্থ নহেন। ঈশ্বরকে জানিতে হইলে, তাঁহাকে বিশ্বাস ব্যতীত পাওয়া যায় না। ভগবানের সহিত আমাদের চির-সম্বন্ধ। ভক্তিযোগে সেই সম্বন্ধ বুঝিতে পারা যায়। ধর্মের যদি কোন উদ্দেশ্য থাকে, তবে সে ভগবানের প্রেম ও ভক্তি। আত্মারাম মুনিগণও ভগবানের ভক্তি করিয়া থাকেন। এই বলিয়া তিনি ভাগবতের নিম্নলিখিত শ্লোক আবৃত্তি করেন।

* চৈতন্যদেবের গৃহত্যাগের পর বিষ্ণুপ্রিয়া সন্ন্যাস-ব্রতধারিণী হইয়া গৌরাঙ্গের পাদুকা পূজা ও বৃদ্ধা শচীদেবীর সেবা-শুশ্রূষা করিতেন। তাঁহার সেবায় শচীদেবীর অপত্য-বিরহ অনেক প্রশমিত হইয়াছিল।

'আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥'

ভগবানের এতাদৃশ গুণ যে, যাঁহারা আত্মারাম ঋষি ও মৌনব্রতাবলম্বী, যাঁহাদের হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হইয়াছে, তাঁহারাও তাঁহাকে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন।

সার্বভৌম ঐ শ্লোকের ব্যাখ্যা শুনিতে চাহিলে চৈতন্যদেব বলিয়াছিলেন, 'আপনি মহাপণ্ডিত, আপনি ব্যাখ্যা করিয়া আমায় কৃতার্থ করুন।' চৈতন্যের কথা শুনিয়া সার্বভৌম আপনার পাণ্ডিত্যের বলে উক্ত শ্লোকের ত্রয়োদশ প্রকার ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু চৈতন্যদেব এ সকল ব্যাখ্যা ব্যতীত আরও আঠার প্রকার নূতন ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইয়া দেন। চৈতন্যদেবের ব্যাখ্যা শ্রবণে সার্বভৌম আপনার বিদ্যা-বুদ্ধিতে ধিক্কার দিয়া চৈতন্যের শরণাপন্ন হন।

এক দিবস সার্বভৌম গৌরাঙ্গকে সাধনের উপায় জিজ্ঞাসা করেন। ইহা শুনিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, 'কলিতে নামসংকীর্তন করাই শ্রেষ্ঠ সাধন।'

'তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥'

তৃণ অপেক্ষাও সুনীচ, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু এবং অভিমানশূন্য হইয়া সর্বদা হরিনাম করিবে। মায়াবাদী সার্বভৌম, চৈতন্যের কৃপায় ভক্তি-পথ অবলম্বন করিয়াছেন শুনিয়া, নীলাচলবাসী কাশী মিশ্র প্রভৃতি প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণ চৈতন্যের পথাবলম্বী হন।

অনন্তর চৈতন্যদেব ফাল্গুন মাসে জগন্নাথদেবের দোল দর্শন করিয়া বৈশাখ মাসে তীর্থ-পর্যটন-মানসে দাক্ষিণাত্য যাত্রা করেন। তিনি ক্রমে জীয়ড-নৃসিংহ-ক্ষেত্র অতিক্রম করিয়া কয়েক দিবস পরে গোদাবরী-তীরে আসিয়া উপস্থিত হন। এই স্থানের নাম বিদ্যানগর বা রাজমহেন্দ্রী। ঐ গোদাবরী-তীরে, গোদাবরী প্রদেশের শাসনকর্তা পরম বৈষ্ণব রামানন্দ রায় মহাশয়ের সহিত ইঁহার সাক্ষাৎ হয়। চৈতন্যদেব সার্বভৌমের মুখে রামানন্দের কথা শ্রবণ করিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই রাজপুরুষকে দর্শন করিয়া এবং তাঁহার সহিত শাস্ত্রালাপ করিয়া বিশেষ প্রীত হন। রামানন্দের সহিত সাক্ষাতের পর তিনি দাক্ষিণাত্যে যাত্রা করেন। তিনি দক্ষিণাবর্তের নানাস্থান পর্যটন করিয়া এবং শৈব ও রামাৎ সম্প্রদায়ের অনেক ব্যক্তিকে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত করিয়া শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হন। ঐ স্থানে বেঙ্কট ভট্টের আলয়ে চারি মাস থাকিয়া সেতুবন্ধ রামেশ্বর গমন করেন। রামেশ্বর হইতে দ্বারকা তীর্থ ও দণ্ডকারণ্য হইয়া পুনরায় নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করেন।

গৌরাঙ্গদেব নীলাচলে কিছুদিন বাস করিয়া পুনরায় বঙ্গদেশে আগমন করেন। তিনি প্রথমে পানিহাটি, পরে কাঁচড়াপাড়ায় শিবানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, সার্বভৌমের ভ্রাতা বাচস্পতি মহাশয়ের বাটীতে উপনীত হন। নিমাই আসিয়াছেন শুনিয়া, নানা-স্থান হইতে বহুতর লোক তাঁহাকে দেখিতে আসে; তথায় বহুলোক সমাগত হওয়ায় চৈতন্যদেব তথা হইতে সকলের অজ্ঞাতসারে রাত্রিযোগে ফুলিয়া গ্রামে গমন করেন। ঐ স্থানে কয়েক দিন থাকিয়া তিনি রামকেলি নামক স্থানে আসেন। রামকেলি বাঙলার প্রাচীন রাজধানী। ইহা গৌড়নগরের নামান্তর মাত্র। রামকেলিতে থাকিবার সময়, রূপ ও সনাতন নামক দুই ভ্রাতা চৈতন্যদেবের মোহিনী শক্তিতে মুগ্ধ হইয়া রাত্রি দুই

প্রহরের সময় গললগ্নীকৃতবাসে চৈতন্যের নিকট আসিয়া উপস্থিত হন। চৈতন্যদেব উঁহাদিগের প্রাগাঢ় ভক্তি দেখিয়া, উঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া শিষ্যরূপে গ্রহণ করেন। ঐ স্থান হইতে চৈতন্যদেব শান্তিপুরে গমন করেন। তথায় কিছুদিন থাকিয়া মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পুনরায় শ্রীক্ষেত্রে ফিরিয়া আসেন।

শ্রীক্ষেত্রে বর্ষা চারিমাস অতিবাহিত করিয়া একমাত্র শিষ্যসমভিব্যাহারে বৃন্দাবন যাত্রা করেন। তিনি তথায় কয়েক দিবস থাকিয়া পথ হাঁটিয়া কাশীধামে আসেন। কাশীধামে মায়াদেবী সন্ন্যাসী ও দণ্ডিগণের বিষম প্রাদুর্ভাব। চৈতন্যদেব কাশীতে উপস্থিত হইলে, তথাকার দণ্ডী, সন্ন্যাসী ও পণ্ডিতবর্গ তাঁহার সহিত বিবিধ বিষয়ের বিচার করেন। উঁহাদিগের মধ্যে প্রকাশানন্দ স্বামী চৈতন্যদেবকে সম্বোধন করিয়া বলেন, 'হে সন্ন্যাসী! তুমি সন্ন্যাসীর ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া উন্মাদের ন্যায় কালযাপন করিতেছ কেন?' ইহার উত্তরে চৈতন্যদেব বলেন, 'আমার গুরু আমাকে মূর্খ জানিয়া এই উপদেশ দিয়াছেন যে, 'তোমার বেদান্তে অধিকার নাই, কলিতে নাম-জপই সার। তুমি কেবল কৃষ্ণ নাম জপ কর। কৃষ্ণ নাম জপ ও কৃষ্ণভক্তি করাই শ্রেষ্ঠ সাধন।' এই বলিয়া তিনি বৃহন্নারদীয় পুরাণের—

'হরেনাম হরেনাম হরেনামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥'

এই বচন আমাকে উপদেশ দেন। আমি সেই গুরুদেবের আদেশ-পালনে পাগল হইয়াছি।' এই কথা বলিয়া চৈতন্যদেব হরিনামের মহিমাসূচক বিচার করেন। তাঁহার সহিত বিচারে পরাভূত হইয়া প্রকাশানন্দ স্বামী প্রভৃতি মায়াবাদিগণ হরিধ্বনি করিয়া গৌরাঙ্গের সহিত প্রেমরসে মত্ত হন। এইরূপে কাশীতে হরিনামের ধ্বজা তুলিয়া চৈতন্যদেব পুনরায় নীলাচলে যাত্রা করেন।

এই সময় হইতে চৈতন্যদেবের প্রেম-বিহ্বলতা অতিশয় বর্ধিত হয়। একদা তিনি নিশীথসময় পূর্ণিমা তিথিতে চন্দ্ররশ্মি-বিভাসিত সুনীল জলধিবক্ষ দেখিয়া, যমুনায় রাধাকৃষ্ণের জলকেলি মনে করিয়া সমুদ্রে ঝম্পপ্রদান করেন। কিন্তু এক ধীবরের জালে পড়িয়া তীরে উত্তীর্ণ হন। ১৪৫৫ শকের আষাঢ় মাসে তিনি যে কোথায় গমন করেন, তাহার আর কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

চৈতন্যদেবের অন্তর্ধানের কয়েক বৎসর পূর্বে শচীদেবী ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। গৌরাঙ্গের অন্তর্ধানের কয়েক দিবস পরেই বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী গৌরাঙ্গের মূর্তি স্থাপন করিয়া দেবতাজ্ঞানে পূজা করিতেন। বিষ্ণুপ্রিয়ার দেহত্যাগের পর তাঁহার ভ্রাতা মাধবাচার্য ঐ সেবার অধিকারী হন। নবদ্বীপে যে চৈতন্যদেবের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহা তাঁহার পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়ার সংস্থাপিত।

—ঃ০ঃ—

বৈষ্ণব-তত্ত্ব-নিরূপণ

১। উপাস্যদেবের প্রতি অসাধারণ প্রীতি ও অনুরাগ জন্মাইবার নাম ভক্তি। কায়মনোবাক্যে ভগবানের অনুগত হওয়াই ভক্তি।

২। ভক্তির অবস্থা তিন প্রকার ;—১ম সাধন-ভক্তি, ২য় ভাব-ভক্তি, ৩য় প্রেম-ভক্তি।

৩। জগতে মানব-জন্ম অতি দুর্লভ। চৌরাশী লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া জীব মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হয়। এই মনুষ্যত্ব লাভ করিয়া যিনি ভগবচ্চরণে ঐকান্তিকী ভক্তি রাখিয়াছেন, তিনিই ধন্য।

৪। অহৈতুকী অর্থাৎ অন্য বস্তুর অভিলাষশূন্য ও জ্ঞানকর্মাদির ব্যবধানরহিত ভক্তির দ্বারাই শ্রীভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

৫। নাস্তিক, একমাত্র নৈতিক ও বিড়াল-তপস্বী প্রভৃতির সঙ্গ গ্রহণ, কুশিষ্য ও কুগুরু গ্রহণ, বৈষ্ণব সম্ভাষণে বা সদ্ব্যবহারে ত্রুটি করা ও আলস্য করা, শোক দুঃখাদি, কুসংস্কার রক্ষা, পরনিন্দা করা, জীবহিংসা করা, কলহ করা, পরস্ত্রী কামনা করা, সেবার অযত্ন করা, অহঙ্কার করা, হরিনামের মহিমা একমাত্র প্রশংসা ভিন্ন কিছুই নহে, এরূপ ধারণা করা, হরিনামের অপব্যবহার করা, কোন না কোন শ্রেষ্ঠ বিষয়ের সহিত হরিনামের তুলনা করা, ভগবানের নিন্দার অনুমোদন করা বা শ্রবণ করা, এইগুলি ধর্মজগতের সর্বনাশকারী অপরাধ বলিয়া সতত স্মরণ রাখিবে।

৬। প্রথমে বিশ্বাস, পরে সাধুসঙ্গ, পরে অর্চনা, পরে বিঘ্ননিবৃত্তি, পরে নিষ্ঠা, পরে রুচি, পরে ভাব, তাহার পরে প্রেমোদয় হইয়া থাকে।

৭। একমাত্র শুদ্ধ ভগবানের ভজনা কর, কিন্তু অন্যের অন্যরূপ সাধনা-প্রণালীর নিন্দা করিও না। বাহ্য পৃথক্ ভাব দেখিয়া তর্ক করিও না।

৮। বিশুদ্ধ প্রেমই যথার্থ ধর্ম। কৃষ্ণ-প্রেমই সুবিমল। অবস্থাবিশেষে প্রেমের নামই ভক্তি।

৯। ভক্তির উন্নতিসাধনই কৃষ্ণভক্তের সর্বস্ব।

১০। সেবায় প্রীতি-সঞ্চার, রসিকগণের সহিত মধুর ভাগবতের রসাস্বাদ, সাধুসঙ্গ, নাম-সংকীর্তন, ইহার যাহাতে যখন যাহার রুচি থাকে, সে তখন তাহারই আলোচনা করিবে।

১১। রস অর্থে আনন্দ ; সেই আনন্দ দুই প্রকার ;—জড়ানন্দ ও চিদানন্দ। চিৎরস অর্থে শুদ্ধ আনন্দ আর জড়রস অর্থে সাংসারিক সুখ-দুঃখ মাত্র। পরমানন্দ বা চিৎরস বিকৃত হইয়া দাম্পত্য-প্রণয়, অপত্য-স্নেহ, সখ্য, আনুগত্য ও ক্রীড়া-কৌতুক প্রভৃতিতে পরিণত হইয়াছে।

১২। সর্বজাতীয় লোকই প্রেমভক্তির অধিকারী। কি হিন্দু, কি ম্লেচ্ছ, সকল লোকই প্রেমভক্তির অনুষ্ঠানে সমর্থ। সেই পরাৎপর পরমেশ্বরকে একান্ত প্রেম, ভক্তি ও অনুরাগভরে ভজনা না করিলে, তিনি কখনই জীবসমূহের পক্ষে সুলভ নহেন। তিনি রস বা ভাববিশেষের বশীভূত। সেই রস বা ভাব পাঁচ প্রকার ;—শান্ত,

দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর কান্তা। উপাসনার পূর্ণ বিকাশ হইলে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পঞ্চ ভাব দৃষ্ট হয়। মধুর বা কান্তা ভাব সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সতী স্ত্রী যেমন প্রিয়পতিকে দেহ, মন প্রভৃতি সমর্পণ করেন, তেমনি ভাবে ভগবানকে আত্মসমর্পণ করাই শ্রেষ্ঠ সাধন। ইহাতে শান্তরসের অচঞ্চলতা, দাস্যের সেবা, সখ্যের বিশ্বাস, বাৎসল্যের স্নেহ এবং কান্তার আত্মসমর্পণ সকলই আছে; অতএব সূক্ষ্মরূপে দেখিতে গেলে এই কান্তা-ভাবই সর্বশ্রেষ্ঠ।

১৩। প্রথমে সাধন-ভক্তি, পরে ভাব-ভক্তি, তাহার পর প্রেম-ভক্তি। ভাবের অপর এক নাম রতি, কিন্তু তাহা কেবল চিন্ময় অবস্থাতেই হইয়া থাকে।

১৪। কৃষ্ণ-কৃপাতেই রতির উৎপত্তি, কিন্তু তাহা শিক্ষা দেওয়া কঠিন। সাধুসঙ্গই রতি পুষ্ট হয়। স্বেদ, কম্প, অশ্রু, পুলক, বিবর্ণতা ইত্যাদি রতির লক্ষণ।

১৫। রতি এই কয়েক প্রকার—ভাগবতী রতি, ছায়া রতি, জড় রতি ও কপট রতি। ভাগবতী রতির কিঞ্চিৎ উদয় হইলে, তাহাকে ছায়া রতি বলে। আর মদ্যপায়ী, বেশ্যাসক্ত ও প্রণয়ীর যে লক্ষণ, তাহা জড় রতির লক্ষণ। সংকীর্তনে লোককে দেখাইবার জন্য যে ধূল্যবলুণ্ঠন ও ভ্রষ্টা নারীর স্বামিদর্শনে যে পুলক, তাহাই কপট রতির লক্ষণ জানিবে।

১৬। কোন কোন বৈষ্ণব, বৈষ্ণবধর্মই শ্রেষ্ঠ মনে করেন, কিন্তু নিজে বৈষ্ণব নহেন। কেহ বৈষ্ণব-চিহ্ন ধারণ করেন, কিন্তু যথার্থ বৈষ্ণব নহেন। আবার কেহ বৈষ্ণব-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সকলই বৈষ্ণবের মত, কিন্তু যথার্থ বৈষ্ণব হইতে পারেন নাই। এ সকলই বৈষ্ণবপক্ষীয় বটে, কিন্তু একমাত্র ভক্তের সঙ্গেই রসালাপ করিবে, অন্যের সহিত করিবে না।

১৭। হরিনাম শ্রবণমাত্রেই পাপ দূর হইয়া শরীর পবিত্র বোধ হয়। যেখানে কোন বিষম অপরাধ হেতু তাহা না হয়, সেই স্থানে বারবার কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিতে থাকিবে। ক্রমে শরীরের পবিত্রতা সম্পাদিত হইবে। মন যখন ভগবানে একনিষ্ঠ হয়, তখন সকলই সহজ হইয়া উঠে। আর কিছুরই আশঙ্কা থাকে না।

১৮। অন্তরিন্দ্রিয় বশীভূত করার নাম শম, বাহ্যেন্দ্রিয় বশীভূত করার নাম দম, দুঃখাদি সহ্য করিতে অভ্যাস করার নাম তিতিক্ষা এবং সমস্ত নশ্বর বস্তুকে অবস্তু জ্ঞান করার নাম বৈরাগ্য।

১৯। তিতিক্ষা ও বৈরাগ্য বৈষ্ণব সন্ন্যাসীদিগের প্রধান ধর্ম।

২০। শ্রদ্ধা, সাধুসঙ্গ, ভজন ও নিবৃত্তি ইত্যাদির দ্বারা যখন ভাগবতী রতির উদয় হয়, তখন বিরক্তি নামে একটি ধর্ম বৈষ্ণব-হৃদয়ে উদয় হইয়া থাকে। ঐ সময়ে বৈষ্ণবগণ কৌপীনাদি ধারণ ও ভিক্ষা দ্বারা জীবনযাত্রা নির্বাহ করেন। ইহাই বৈষ্ণবদিগের ভেক। এইরূপ ভেক দুই প্রকার;—ভবজনিত বিরক্তি লাভ করিয়া কোন সাধুর নিকটে ভেক গ্রহণ অথবা স্বয়ং ঐরূপ ভাবে বিচরণ।

২১। যে পর্যন্ত গৃহত্যাগ করিতে অক্ষম, সে পর্যন্ত কামনা ও তাহার শেষফল দুঃখজনক ও মন্দ জানিয়া ভগবানকে প্রীতিপূর্বক ভজনা কর। ইহাই গৃহস্থ বৈষ্ণবের লক্ষণ।

২২। যখন ভেক ধারণ করিবে, তখন আশ্রম সকল পরিত্যাগ করিয়া সকল বিধির অতীত যে পরমহংস বৈষ্ণব আশ্রম, তাহাতেই বিচরণ করিবে।

২৩। জলের ধর্ম শীলতা, অগ্নির ধর্ম উত্তাপ এবং মনুষ্যের ধর্ম শুদ্ধ প্রেম।

২৪। সংসাররূপ সর্প যাহাকে দংশন করিয়াছে, তাহার আর অন্য ঔষধ নাই। বৈষ্ণব-মন্ত্র কৃষ্ণনামই জপ করিতে করিতে তিনি পরিত্রাণ পাইবেন।

২৫। ত্রেতা ও দ্বাপরে ধ্যান, যজন ও যজ্ঞ দ্বারা ব্রহ্মলাভ হইয়াছিল ; কলিতে নাম সংকীর্তন দ্বারাই ভগবানকে লাভ করা যায়।

২৬। 'হরি' এই দুইটি অক্ষর যাঁহার জিহ্বাগ্রে সতত বর্তমান, তাঁহার আর কুরুক্ষেত্র, কাশী ইত্যাদি তীর্থে প্রয়োজন কি ?

২৭। বহু শাস্ত্রালোচনা করিয়া, বহুদিন হইতে বারংবার বিচার করিয়া ইহাই একমাত্র সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, নিত্য নারায়ণের ধ্যান কর।

২৮। ধ্যানেতে যেরূপ পাপশোধন হয়, সেইরূপ আর কিছুতেই হয় না। হরিনামরূপ অগ্নিই পুনর্জন্মরূপ পাপকে দগ্ধ করিয়া ফেলে।

২৯। গৃহমধ্যে বদ্ধ অগ্নি যেমন মন্দ মন্দ বাতাস পাইয়া সমস্ত দগ্ধ করিয়া ফেলে, সেইরূপ চিত্তস্থিত বিষ্ণু, যোগীদিগের অন্তরস্থ সমুদয় পাপ দগ্ধ করিয়া থাকেন।

৩০। ইহ-সংসারে সকলেরই কর্মানুসারে ফললাভ হইয়া থাকে। কিন্তু সিদ্ধ ধান্যে যেমন অংকুর হয় না, সেইরূপ বৈষ্ণবে কদাচ কর্মফল ঘটিতে পারে না। সেই ভক্তবৎসল কৃপা করিয়া ভক্তের কর্মফল পূর্বেই সংহার করিয়া থাকেন।

ঃ০ঃ —

ত্রৈলিঙ্গ স্বামী

মান্দ্রাজ প্রদেশের অন্তর্গত ভিজিয়ানা গ্রামের হোলিয়া নামক স্থানে ১৫২৯ শতাব্দীর পৌষমাসে মহাত্মা ত্রৈলিঙ্গ স্বামী ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার আদি নাম শিবরাম। ইঁহার পিতা নৃসিংহ দেব যথাসময়ে পুত্রমুখ দর্শনে বঞ্চিত হওয়ায় পুনর্বার বিবাহ করেন। তাঁহার প্রথমা স্ত্রী যখন দেখিলেন যে, তাঁহার দাম্পত্য-প্রণয়ের মধ্যে আবার একজন অংশীদার হইল, তখন তিনি পুত্রপ্রার্থী হইয়া ব্রতানুষ্ঠান করেন। ঈশ্বরের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ও অবিচলিত বিশ্বাস থাকায় ব্রতানুষ্ঠানের কয়েক বৎসর কাল পরেই তিনি এক পুত্র লাভ করেন। ঈশ্বরারাধনা করিয়া পুত্র প্রাপ্ত হওয়ায় ইঁহার মাতা পুত্রের নাম শিবরাম রাখেন। শিবরামের জননী অতি বুদ্ধিমতী, ধর্মপরায়ণা ও সদ্‌গুণসম্পন্না ছিলেন। শিবরাম মাতার সকল সদ্‌গুণই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতেই কোন প্রকার মিথ্যা বা কুৎসিত ব্যবহার ইঁহার নিকট প্রশ্রয় পাইত না। পঞ্চম বৎসর বয়সের সময় শিবরামের পিতৃ-বিয়োগ হয়। পিতা পরলোকগত হইলে ইঁহার জননী বিদ্যাভ্যাসের জন্য ইঁহাকে গ্রাম্য পাঠশালায় পাঠাইয়া দেন। অসাধারণ মেধা ও বুদ্ধিশক্তি থাকায় অল্পকালের মধ্যে ইঁনি সকল বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া উঠেন।

ইঁহার বিবাহ করিবার আদৌ ইচ্ছা ছিল না, কেবল মাতার অনুরোধে বিবাহ করিয়া সংসারী হইয়াছিলেন। মাতা যতদিন জীবিতা ছিলেন, ইঁনিও ততদিন সংসারাশ্রম করিয়াছিলেন। ২৮ বৎসর বয়সে ইঁহার মাতৃ-বিয়োগ হয়। মাতার অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সমাপন করিবার সময় ইঁহার মনে এরূপ বৈরাগ্য জন্মে যে, ইঁনি আর গৃহে প্রত্যাগমন না করিয়া সেই স্থানে অবস্থিতি করেন। ইঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ও ইঁহার আত্মীয় স্বজন কত অনুরোধ করেন, কিন্তু ইঁনি কিছুতেই আপনার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করেন নাই। শিবরাম আপনার স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি আপন বৈমাত্রেয় ভ্রাতাকে প্রদান করিয়া বলেন 'ভাই! আমি আর পাপসংসারে প্রবেশ করিব না। এতদিন মাতার অনুমতি পাই নাই বলিয়া, পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় সংসারাশ্রমে অবস্থিতি করিতেছিলাম, এক্ষণে মাতার অনুমতি পাইয়াছি, সুতরাং এ অমূল্য সুযোগ আর পরিত্যাগ করিব না।' ইঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা যখন বুঝিলেন, জ্যেষ্ঠের প্রতিজ্ঞা অটল, সংসারে আর লিপ্ত থাকিবেন না, তখন তিনি ঐ সমাধিস্থানে একটি কুটীর নির্মাণ ও আহারাদির বন্দোবস্ত করিয়া দেন। শিবরাম সংসারের সকল জ্বালা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া সানন্দে তথায় যোগ অভ্যাস করিতে থাকেন।

শিবরাম কয়েক বৎসর কাল তথায় অবস্থিতি করিয়া তীর্থ-পর্যটনে বহির্গত হন। ঘটনাক্রমে একজন অতি প্রাচীন সাধু ইঁহার নয়নপথে পতিত হন। শিবরাম ঐ যোগীকে প্রকৃত যোগী জানিতে পারিয়া তাঁহার শিষ্য হন। শিবরাম বিনা চেষ্টায় সদ্‌গুরু প্রাপ্ত হইয়া অতি অহ্লাদসহকারে তাঁহার নিকট যোগশিক্ষা করেন। গুরুও শিবরামকে উপযুক্ত শিষ্য বিবেচনা করিয়া অকপটচিত্তে ইঁহাকে যোগশিক্ষা দেন।

শিবরাম ইঁহার নিকট দীক্ষিত হইয়া 'ত্রৈলিঙ্গ স্বামী' উপাধি প্রাপ্ত হন। তদবধি ইঁনি জনসমাজে 'ত্রৈলিঙ্গ স্বামী' বলিয়া বিখ্যাত।

ত্রৈলিঙ্গ স্বামীর গুরুদেব দেহত্যাগ করিলে ইঁনি সেতুবন্ধ রামেশ্বরে গমন করেন, তথায় ইঁহার কয়েকজন শিষ্য হয়। ত্রৈলিঙ্গ স্বামী মনে করিয়াছিলেন যে, ঐ স্থানেই তিনি তাঁহার জীবনের অবশিষ্ট সময় অতিবাহিত করিবেন, কিন্তু তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। ইঁনি তথাকার কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে কালের করালগ্রাস হইতে মুক্ত করায় এবং অনেককে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান কালের অবস্থা সকল বলিয়া দেওয়ায়, ইঁহার নিকট বিস্তর জনসমাগম হইত। অনবরত লোকজনের যাতায়াতে ইঁহার যোগাভ্যাসের ব্যাঘাত হওয়ায়, ইঁনি ঐ স্থান পরিত্যাগ করিয়া নেপাল রাজ্যে গমন করেন; তথায় ইঁহার গুণ-গরিমা প্রকাশ হইয়া পড়ায় পুনরায় লোকে ইঁহাকে অত্যন্ত বিরক্ত করে। উহাতে তিনি বিরক্ত হইয়া তিব্বতে গমন করেন; পরে তথা হইতে মানস সরোবরে গিয়া মনের আনন্দে যোগাভ্যাস করেন। বহুদিবসাবধি নির্জনে যোগসাধনা করিয়া সিদ্ধ হইলে মোক্ষক্ষেত্র কাশীধামে আগমন করেন। ইঁনি কাশীতে আসিয়া প্রথমে কিছুকাল দশাশ্বমেধঘাটের উপর বসবাস করেন; পরে অসিঘাট, তুলসীঘাট প্রভৃতি কয়েকটি ঘাটে থাকিয়া পঞ্চগঙ্গার ঘাটে যোগাশ্রম নির্মাণ করেন। ঐ সময়ে ইঁনি অনেককে যোগশিক্ষা দেন এবং অমানুষিক কার্যকলাপ দ্বারা সকলকে স্তম্ভিত করেন।

হুগলী জেলার অন্তর্গত শ্রীরামপুরের নাম বোধ হয়, আপনারা অনেকেই শ্রবণ করিয়াছেন। শ্রীরামপুরে জয়গোপাল কর্মকার নামক এক ব্যক্তি বাস করিতেন। তাঁহার মনে বৈরাগ্যের উদয় হওয়ায় তিনি সংসারের সকল ভার পুত্রদিগের উপর ন্যস্ত করিয়া কাশীধামে গমন করেন। তিনি পূর্ব হইতেই স্বামীজীর নাম শ্রবণ করিয়াছিলেন, বারাণসীতে উপস্থিত হইয়া তিনি প্রায় প্রতিদিনই তাঁহাকে দর্শন করিতে যাইতেন। সাধু সন্ন্যাসীদিগের উপর তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। তিনি নিত্য দেবসেবার ন্যায় ইঁহার জন্য প্রায় প্রত্যহ কিছু ফলমূল এবং দুগ্ধ লইয়া যাইতেন। কয়েক দিবস এইরূপ যাতায়াত করিবার পর, কর্মকারের উপর স্বামীজীর দৃষ্টি পড়ে। কর্মকার মহাশয় স্বামীজীর অনুগ্রহ লাভ করিয়া আপনাকে সৌভাগ্যবান মনে করেন। এক দিবস কর্মকার কিছু ব্যস্তভাবে স্বামীজীর নিকট আসিয়া বলেন, 'গুরুদেব! আজ আমার বুকের ভিতর বড় ধড় ফড় করছে, কেন যে এমন হচ্ছে, বলতে পারি না, বোধ হয়, কোন অমঙ্গল ঘটে থাকবে।' স্বামীজী কর্মকারকে বিশেষ চিন্তিত দেখিয়া তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করিয়া বলেন, 'এখনই তোমার বাটীর খবর আনিয়া দিতেছি, একটু অপেক্ষা কর।' স্বামীজী ক্ষণেকের জন্য চক্ষু মুদ্রিত করিয়া যাহা জানিতে পারিলেন, তখন আর তাহা কর্মকারের নিকট প্রকাশ করিলেন না। তিনি কর্মকার মহাশয়কে আহারাদি করিয়া সন্ধ্যার সময় আসিতে বলেন। কর্মকার সন্ধ্যার সময় আসিয়া উপস্থিত হইলে, স্বামীজী তাঁহাকে এই কয়েকটি কথা বলেন—'আজ ভোর ছয়টার সময় তোমার জ্যেষ্ঠ পুত্র বিসূচিকা রোগে মারা গিয়াছে। তুমি আজ রাত্রেই তাহাকে স্বপ্ন দেখিতে পাইবে।' স্বামীজীর মুখে এই নিদারুণ সংবাদ শ্রবণ করিয়া জয়গোপাল বাবু বিশেষ মর্মাহত হন এবং অশ্রুবেগ সংবরণ করিতে না পারিয়া কাঁদিয়া ফেলেন। কর্মকার মহাশয়কে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া স্বামীজী যে কয়েকটি উপদেশ-বাক্য বলেন, তাহা এই;—

'দেখ বাপ্ন! এক ঈশ্বর ব্যতীত সকলই অনিত্য, কিছুই চিরস্থায়ী নয়। যাহা চিরস্থায়ী নয়, যাহা ক্ষণেক আছে, ক্ষণেক নাই, এমন যে সমস্ত বস্তু, তাহার জন্য দুঃখ প্রকাশ করা অজ্ঞানের কার্য। এই অজ্ঞানতাই মানুষের মনের একমাত্র আবরণ। এই সংসারের মধ্যে যাহাদের হৃদয় অজ্ঞানরূপ অন্ধকারে আচ্ছন্ন, তাহারা কখনই মনে শান্তি পায় না। জ্ঞান ও অজ্ঞান এই দুইয়ে কত প্রভেদ, তাহা একটা সামান্য দৃষ্টান্তে বুঝিয়া লও। আলোক ও অন্ধকারে যেমন প্রভেদ, জ্ঞান ও অজ্ঞানে সেইরূপ প্রভেদ। অন্ধকার বিপদ ও ভ্রমজনক, আলোক বিপদ ও ভ্রমনাশক। অন্ধকারে পথ চলিতে চলিতে গাছকে যেমন মানুষ বলিয়া ভ্রম হয়, দড়িকে সাপ বলিয়া ভয় হয়, ঠিক পথে চলিলেও যেমন মনে হয়, কোন বিপথে পড়িয়াছি; কিন্তু আলোকের দ্বারা যেমন সেই ভ্রম দূর হয়, সেইরূপ অজ্ঞানী ব্যক্তি ঐরূপ ভ্রমে পতিত হইয়া দুঃখ পায়। যখন তাহাদের জ্ঞানের বিকাশ হয়, তখন তাহারা ঐ ভ্রম বুঝিতে পারে। তুমি জিজ্ঞাসা করিতে পার, অন্ধকারে এরূপ ভ্রম হয় কেন? অন্ধকাররূপ আবরণে ঐ সকল বস্তু আবৃত থাকে বলিয়াই ঐরূপ ভ্রম হয়। আলোক ঐ আবরণ উন্মোচন করিয়া, উহাদের স্ব স্ব রূপ আমাদের নিকট প্রকাশ করিয়া দেয় বলিয়াই, আমাদের আর ভ্রম হয় না। তোমার হৃদয় অজ্ঞান-রূপ আবরণে আবৃত, সেই জন্য তুমি তোমার পুত্রের মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া কাঁদিতেছ। যখন তোমার জ্ঞান জন্মিবে, তখন বুঝিতে পারিবে যে, ঐ পুত্র তোমার কেহই নয়।' জয়গোপাল বাবু, স্বামীজীর নিকট পুত্রের মৃত্যুসংবাদ এবং উপদেশপূর্ণ বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া রাত্রিতে বাসায় আসিয়া শয়ন করেন। শেষ রাত্রিতে তিনি পুত্রকে স্বপ্নে দেখেন। পরদিন জরুরি (urgent) টেলিগ্রাফ করিয়া জানিতে পারেন, স্বামীজীর সকল কথাই সত্য।

কাশীর অসিঘাটের সন্নিকটে এক ব্যক্তির সর্পাঘাতে মৃত্যু হয়। মৃতব্যক্তির আত্মীয়-স্বজন তাহাকে গঙ্গার জলে ভাসাইয়া দিবার সঙ্কল্প করে। যে স্থানে তাহারা সমস্ত আয়োজন করিয়া শবটি ভাসাইয়া দিবার উপক্রম করিতেছিল, দেবযোগে স্বামীজী সেই স্থানের জলে ভাসিতেছিলেন। তিনি রোরুদ্যমানা ধূল্যবলুণ্ঠিতা অল্পবয়স্কা বিধবার মনোবেদনা জানিতে পারিয়া সর্পদষ্ট ব্যক্তির নিকট আগমন করেন। তিনি কাহারও সহিত কোনরূপ বাক্যালাপ না করিয়া অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনীর দ্বারা কিঞ্চিৎ গঙ্গামৃত্তিকা লইয়া, সর্পদষ্ট ব্যক্তির ক্ষতস্থানে টিপিয়া দিয়া গঙ্গাসলিলে নিমজ্জিত হইয়া গেলেন। যাহারা মৃত ব্যক্তির সংকার করিতে আসিয়াছিল, তাহাদিগের মধ্যে কেহই ইতিপূর্বে স্বামীজীকে দর্শন করে নাই। এদিকে স্বামীজী গঙ্গাগর্ভে বিলীন হইতে-না-হইতে সর্পদষ্ট ব্যক্তির অল্প অল্প জ্ঞানের সঞ্চার হইতে লাগিল। চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখিল, সে একটি বাঁশের খাটুলীতে বাঁধা রহিয়াছে। তাহার রূপ-যৌবনসম্পন্না ষোড়শী স্ত্রী একপার্শ্বে বসিয়া ক্রন্দন করিতেছে। ক্রমে জ্ঞান-বৃদ্ধি হইতে থাকায় ও শরীরে একটু শক্তিসঞ্চার হওয়ায়, উঠিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহাকে নাড়িতে দেখিয়া তত্রত্য সকলেই আশ্চর্য হইয়া গেল। সর্পদষ্ট ব্যক্তি কথা কহিয়া বলিল, 'আমার বাঁধন খুলিয়া দাও, কেন তোমরা আমাকে এরূপ অবস্থায় এখানে আনিয়াছ?' মৃতব্যক্তিকে পুনর্জীবিত হইতে দেখিয়া তাহার আত্মীয়-স্বজনের চমক ভাঙ্গিল এবং লোকপরম্পরায় জানিতে পারিল, মৃতব্যক্তির জীবনদাতা স্বামীজী ব্যতীত আর কেহই নহেন।

অনেকেই স্বামীজীকে ঘোরতর শীতে আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া দুই তিন দিবস গঙ্গার জলে ভাসিয়া বেড়াইতে এবং গ্রীষ্মকালে প্রচণ্ড রৌদ্রের উত্তাপে উত্তপ্ত প্রস্তরোপরি বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছেন। কাশীতে আসিয়া অবধি ইনি কয়েকজন শিষ্য ব্যতীত অন্য কাহারও সহিত বড় একটা কথা কহিতেন না, এবং অন্বেষণ করিয়া কখনও আহার করিতেন না। ভক্তগণ যে যাহা শ্রদ্ধা করিয়া ইঁহার মুখে ধরিতেন, তাহাই ভক্ষণ করিয়া জীবনধারণ করিতেন। কতকগুলি দুষ্টলোক ইঁহাকে ভণ্ড তপস্বী মনে করিয়া উপযুক্ত শাস্তিপ্রদান করিবার জন্য প্রায় একসের আন্দাজ কলিচূণ জলে গুলিয়া দুগ্ধের মত করে, পরে উহা পান করাইবার জন্য স্বামীজীর নিকট লইয়া যায়। স্বামীজী দুষ্টদিগের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া একবার তাহাদিগের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করেন; পরে অম্লানবদনে তাহার সমস্তই পান করিয়া ফেলেন। দুষ্টেরা ভাবিয়াছিল যে, তাহাদের কৃত দুগ্ধের আস্বাদন পাইলেই স্বামীজী ক্রোধোন্মত্ত হইবেন, সেইজন্য উহারা উঁহার নিকট হইতে কিছুদূরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। যখন দুষ্টেরা দেখিল, স্বামীজী কোনরূপ মুখবিকৃতি না করিয়া সমস্ত গোলা চূণ পান করিয়া ফেলিলেন, তখন দুষ্টেরা স্বামীজীর চরণপ্রান্তে পতিত হইয়া সকল অপরাধ ক্ষমা করিতে বলে। স্বামীজী উহাদের কোন কথায় কর্ণপাত না করিয়া তাহাদের সম্মুখেই সেই পরিমাণ চূণ-গোলা প্রস্রাবের সহিত বাহির করিয়া দেন। স্বামীজীর এই অসাধারণ ক্ষমতা দেখিয়া দুষ্টেরা একেবারে স্পন্দহীন জড়পদার্থের ন্যায় বসিয়া রহিল।

বৃটিশ-রাজ্যের মধ্যে সর্বসাধারণ সমক্ষে উলঙ্গাবস্থায় বসবাস করা আইনবিরুদ্ধ, সুতরাং কেহই উলঙ্গাবস্থায় থাকে না। কিন্তু স্বামীজী উলঙ্গ হইয়া কাশীর পথে, ঘাটে, মাঠে সর্বত্র বিচরণ করিতেন। পুলিশপ্রহরীরা কয়েক বার তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দেয়, কিন্তু ইনি তাহাদের কথায় কর্ণপাত করেন নাই। এক দিবস স্বামীজী উলঙ্গাবস্থায় ভাগীরথীতীরে বসিয়া আছেন, এরূপ সময়ে একজন পুলিশ-প্রহরী ইঁহার নিকট আগমন করিয়া ইঁহাকে থানায় যাইতে বলে। স্বামীজী ঐ সময়ে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া বসিয়াছিলেন; সুতরাং প্রহরীর কথায় কোন উত্তর দিলেন না। কোন উত্তর না পাওয়ায় সে আপনাকে কিছু অপমানিত বোধ করে এবং আপনার কটিদেশ হইতে রুল খুলিয়া লইয়া, তাহা দ্বারা প্রহার করে। স্বামীজীর কয়েকজন শিষ্য তথায় উপস্থিত ছিল। তাহারা ঐ কার্যে বাধা প্রদান করায় প্রহরী রাগে অগ্নিশর্মা হইয়া থানায় সংবাদ প্রদান করে। এই সংবাদে কয়েকজন কনেষ্টবল আসিয়া বাহ্যজ্ঞানশূন্য স্বামীজীকে ঝোলায় করিয়া থানায় লইয়া যায়। পরদিবস ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট ইঁহার বিচার হয়। স্বামীজীর শিষ্যগণ স্বামীজীকে উদ্ধার করিবার জন্য উকীল নিযুক্ত করিয়াছিল। ঐ উকীল বিচারপতিকে বুঝাইয়া দেন যে, 'ইনি মহাপুরুষ, ইঁহার চিত্ত নির্বিকার, সুতরাং বস্ত্র পরিধান করিবার আবশ্যক করে না।' বিচারপতি উকীলের বক্তৃতা শুনিয়া স্বামীজী কিরূপ নির্বিকারচিত্ত সাধু, তাহা পরীক্ষার জন্য আপনার মধ্যাহ্ন জলযোগের ভোজনাবশিষ্ট আহারীয় সামগ্রী ইঁহাকে আহার করিতে দেন। স্বামীজী সাহেবের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া বলেন, 'যদ্যপি আপনি আমার খানার কিয়দংশমাত্র আস্বাদন করেন, তাহা হইলে আমি আপনার প্রদত্ত খানা খাইতে কিছুমাত্র আপত্তি করিব না।' এই কথা বলিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ আপনার হস্তে মলত্যাগ করিয়া সর্বসমক্ষে অম্লানবদনে তাহা ভক্ষণ করিয়া ফেলেন। স্বামীজীর এই অমানুষিক কার্য দেখিয়া

বিচারপতি ইঁহাকে উলঙ্গাবস্থায় সর্বত্র বিচরণ করিতে অনুমতি দেন।

কোন সময়ে একজন প্রধান রাজপুরুষ কাশীর রাজবাটী রামনগর হইতে নৌকা-যোগে ৺কাশীধামে আসিতেছিলেন। তিনি কিছুদূর আসিয়া স্বামীজীকে গঙ্গার জলে ভাসিতে দেখিতে পান। কাশীর মাঝী-মাল্লারা সকলেই স্বামীজীকে জানিত। রাজ-পুরুষ স্বামীজীকে জলের উপর পদ্মাসনে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করেন, 'ইনি কে ?' মাঝীরা বলে, 'উঁহার নাম ত্রৈলিঙ্গ স্বামী, উনি বড় সাধু।' রাজপুরুষের সহচর পূর্বে স্বামীজীর নাম শুনিয়াছিলেন মাত্র, চোখে কখন দেখেন নাই। তিনি স্বামীজীর নাম শুনিয়া উঁহার বিশেষ সুখ্যাতি করেন। সহচর ব্যক্তির মুখে স্বামীজীর সুখ্যাতি শ্রবণ করিয়া তিনি নৌকাখানি তাঁহার নিকট লইয়া যান। নৌকা নিকটস্থ হইলে তিনি বিশেষরূপে অনুনয় বিনয় করিয়া তাঁহাকে নৌকায় উঠিতে বলেন, স্বামীজীও বিনা আপত্তিতে নৌকায় উঠেন। রাজপুরুষ স্বামীজীকে পাইয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হন এবং তাঁহাকে নানাবিধ প্রশ্ন করিতে থাকেন ; কিন্তু স্বামীজীর সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই, তিনি কালা ও বোবার ন্যায় চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। নৌকাখানি প্রায় মাঝ-গঙ্গায় আসিয়াছে, এরূপ সময়ে স্বামীজী মনের খেয়ালে, রাজপুরুষের নিকট যে একখানি তরবারি ছিল, তাহা দেখিতে অভিলাষ প্রকাশ করেন। রাজপুরুষ তাঁহার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া আপনার কটিদেশ হইতে তরবারিখানি নিষ্কাশন করিয়া তাঁহাকে প্রদান করেন ; কিন্তু দৈববশতঃ উহা স্বামীজীর হস্ত হইতে নদীজলে পড়িয়া যায়। ইংরাজ-বাহাদুর-প্রদত্ত সম্মানসূচক অসি, নদীগর্ভে নিহিত হইল দেখিয়া তিনি স্বামীজীর প্রতি অতিশয় রুষ্ট হন এবং কয়েকটি কটুবাক্য প্রয়োগ করেন। নৌকা পরপারে আসিয়া উপস্থিত হইলে, স্বামীজীর প্রধান শিষ্য রাজপুরুষকে রাগান্বিত দেখিয়া যোড়হস্তে মিনতি করিয়া তাঁহাকে বলেন, 'মহাশয়, আপনি রুষ্ট হইবেন না, আমি ডুবরীর দ্বারা আপনার তরবারি উঠাইয়া দিতেছি।' এই বলিয়া তিনি ডুবুরীর অন্বেষণে প্রস্থান করেন। এদিকে স্বামীজী শিষ্যকে বিস্তর কষ্ট পাইতে হইবে ভাবিয়া, সেই নৌকাপার বসিয়া জলে হস্ত ডুবাইয়ামাত্র তিনখানি তরবারি তাঁহার হস্তে আসে। তিনি সেই তিনখানি তরবারি লইয়া রাজপুরুষের হস্তে প্রদান করেন এবং তাঁহার খানি চিনিয়া লইতে বলেন। রাজপুরুষ এই অলৌকিক ব্যাপার দর্শন করিয়া হতবুদ্ধি হইয়া পড়েন এবং নিজ অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। রাজপুরুষ আপনার তরবারি চিনিয়া লইতে অপারগ হওয়ায় স্বামীজী তাঁহাকে তাঁহার তরবারিখানি দিয়া অপর দুইখানি নদীজলে ফেলিয়া দেন।

এক সময় পুথিবীগিরির শিষ্য রাজঘাটে আসিয়া অবস্থিত করেন। তিনি এক দিবস স্বামীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। ঐ সময়ে স্বামীজীর নিকট অনেক ব্যক্তি বসিয়াছিলেন। তিনি আসিয়া স্বামীজীকে কয়েকটি কথা বলেন। পরে উভয়েই সকলের সমক্ষে সেই স্থান হইতে অদৃশ্য হইয়া যান। প্রায় অর্ধদণ্ড কাল পরে সকলেই তাঁহাকে আবার সেই স্থানে দেখিতে পান, কেবল পুথিবীগিরির শিষ্যকে আর কেহই দেখিতে পাইলেন না।

সেই সময়ে দয়ানন্দ সরস্বতী নামক একজন প্রসিদ্ধ বাগ্মী ৺কাশীধামে আসিয়া-ছিলেন। তিনি হিন্দুদেবদেবীর উপাসনার অসারত্ব প্রমাণ ও অযথা নিন্দাবাদ করিয়া সাধারণ লোকদিগকে স্বীয় ধর্মে আনিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। স্বামীজীর কয়েকজন

শিষ্য দয়ানন্দের সকল কথা স্বীয় প্রভুকে নিবেদন করেন। স্বামীজী ইহা শ্রবণ করিয়া স্বীয় শিষ্য মঙ্গলপ্রসাদ ঠাকুরের হস্তে একটুমাত্র কাগজে কি লিখিয়া উক্ত বাগ্মিপ্রবরের নিকট পাঠাইয়া দেন। দয়ানন্দ উহা পাঠ করিয়া কাশী পরিত্যাগ করেন।

মুঙ্গের ডিস্‌পেন্সারিতে শ্রীউমাচরণ মুখোপাধ্যায় নামক এক ব্যক্তি কম্পাউণ্ডারি করিতেন। তিনি একবার ৺কাশীধামে আসিয়া স্বামীজীর সেবায় কিছুদিন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। ৺কাশীধামে প্রথম পদার্পণ করিয়া তাঁহার মনে 'পুনর্জন্ম আছে কি না', এই প্রশ্নের উদয় হয়। ইহার মীমাংসার জন্য তিনি স্বামীজীর নিকট গমন করেন। প্রথম দিন তিনি স্বামীজীকে দর্শন করিয়া তাঁহার প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করিবার জন্য সময় প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু স্বামী তাঁহার ঐ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার পূর্বে অঙ্গুলির সংকেতে তাঁহাকে সেই স্থান হইতে চলিয়া যাইতে বলেন। তিনি একটু থাকিতে ইচ্ছা করিলেও স্বামীজীর সেবকগণ তাঁহাকে শীঘ্র সেই স্থান পরিত্যাগ করিতে বলেন। স্বামীজীর ঈদৃশ ব্যবহারে ক্ষুব্ধচিত্তে তিনি বাসায় প্রত্যাগমন করেন। দ্বিতীয় দিবসেও ঐরূপ ঘটিল। তৃতীয় দিবসে মনে করিয়াছিলেন, তিনি প্রশ্নের উত্তর না লইয়া বাসায় ফিরিবেন না, কিন্তু প্রশ্ন করিবার অবসর পান নাই। এইরূপে ক্রমাগত এক সপ্তাহ কাল যাতায়াত করিয়া তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন যে, তাঁহাকে এই প্রশ্ন করিবই করিব। আমি মহাপাপী বলিয়াই তাঁহার নিকটে স্থান পাইতেছি না। পরদিন উমাচরণ বাবু স্বামীজীর নিকট আসিলে, তিনি পূর্বদিনের ন্যায় তাঁহাকে যাইতে বলেন; কিন্তু উমাচরণ বাবু 'আমি মহাপাপী, আমাকে উদ্ধার করিতেই হইবে', এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহার পাদদ্বয় ধারণ করিয়া ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিতে থাকেন। স্বামীজী তাঁহাকে নিতান্ত কাতর দেখিয়া নিজেই তাঁহাকে বসিতে বলেন। তাঁহার দুঃখাবেগ কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে স্বামীজী তাঁহাকে সন্ধ্যার সময়ে আসিতে আদেশ করেন। উমাচরণ বাবুর সংক্ষুব্ধচিত্ত আশ্বস্ত হইলে, তিনি বাসায় ফিরিয়া আসেন এবং সন্ধ্যার প্রতীক্ষা করিতে থাকেন। সন্ধ্যা সমাগত হইলে তিনি স্বামীজীসকাশে গমন করেন, স্বামীজীও তাঁহাকে উপবেশন করিতে বলেন। স্বামীজীর আশ্রমের মহাদেব এবং বাণীনির্বর্তন আরতি শেষ হইলে, তিনি তাঁহার মৌনব্রত ভঙ্গ করিয়া বলেন, 'দেখ, তুমি যে বিষয় মনে করিয়া আমার নিকট আসিয়াছ, তাহা সত্য। ত্রিকালদর্শী আত্ম-তত্ত্বজ্ঞ মহাত্মগণ তপোবলে, জ্ঞানবলে ও যোগবলে যে সকল চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ সত্য। জীবের সুকৃতি ও দুষ্কৃতি অনুসারে সুখদুঃখ ভোগ করিবার জন্য জন্মান্তর পরিগ্রহ করিতে হয়।'

স্বামীজী তাঁহার মনের ভাব কিরূপে জ্ঞাত হইলেন, ইহা ভাবিয়াই তিনি অবাক হইয়া গেলেন। সেই দিন হইতে স্বামীজীর উপর তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি জন্মে। উমাচরণ বাবু তাঁহাকে সৌৎসুক্যে জিজ্ঞাসা করেন, 'গুরুদেব! আমি এমন কি পাপ-কার্য করিয়াছি, যাহাতে আপনার অনুগ্রহলাভে বঞ্চিত হইয়াছিলাম?' ইহা শুনিয়া স্বামীজী বলেন, 'তুমি অমুক সময়ে এইরূপে অন্যায় কার্য করিয়াছ, এত বৎসর বয়সের সময় অমুক স্থানে এইরূপ কুকার্য করিয়াছ। আমি তোমার মুখদর্শনই করিতাম না, কেবল দেব-দ্বিজের প্রতি তোমার সামান্যমাত্র ভক্তি আছে বলিয়া তোমাকে এখানে বসিতে বলিয়াছি। পূর্বজন্মে তুমি চণ্ডালের ঘরে জন্মিয়াছিলে। সেই সময় ব্রাহ্মণ আর দেবতার প্রতি তোমার অসাধারণ ভক্তি ছিল; সেই ভক্তির জোরে তুমি এবার ব্রাহ্মণ-

কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ ; কিন্তু তুমি যে পাপকার্যসকল করিয়াছিলে, তাহাতে ইহ-জন্মে তোমার সেই ভক্তি ও বিশ্বাস লোপ পাইয়াছে। যাহা আছে, তাহা সামান্য মাত্র।' উমাচরণ বাবু তাঁহার গুপ্ত ও কুৎসিত কার্য সকল স্বামীজীর মুখে শুনিয়া অবাক হইয়া গেলেন।

উমাচরণ বাবুর সহিত স্বামীজীর যখন এইরূপ গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ হয়, তখন ম্যাডাম ব্ল্যাভাট্স্কি ও কর্ণেল আলকট্ বোম্বাই নগরীতে আসিয়া, থিওসফিক্যাল সোসাইটি নামে সভা স্থাপন করিয়া অদ্ভুত যোগশাস্ত্র বিদ্যার মহিমা প্রচার করিতে-ছিলেন এবং মধ্যে মধ্যে এক একটি অলৌকিক কার্যসাধন করিয়া তাঁহার যোগসিদ্ধশক্তির প্রভূত পরিচয় দিতেছিলেন। উমাচরণ বাবু স্বামীজীকে ঐ বিদ্যাবতী ম্লেচ্ছ-মহিলার যোগসিদ্ধি কিরূপে হইল, জিজ্ঞাসা করায়, স্বামীজী বলিয়াছিলেন, 'ও সব যোগসিদ্ধির ফল নহে, যাহা কিছু শুনিতেছ, সমস্তই ইন্দ্রজাল মাত্র, উহা শীঘ্রই ধরা পড়িবে!' বস্তুতঃই তাহার কিছু দিবস পরে ম্যাডাম কুলম্ব নাম্নী একজন খৃষ্টীয় মহিলা ব্ল্যাভাট্স্কির সহচরী হইয়া তাঁহার মান্দ্রাজ নগরীস্থ গুরুগৃহের গুপ্তঘটনাবলী প্রকাশ করিয়া দেয়। সংবাদ-পত্রে ইহা সমালোচিত হইলে চারিদিকে গণ্ডগোল পড়িয়া যায়। এই ঘটনার পর হইতেই ম্যাডাম ব্ল্যাভাট্স্কির আর কুহক-বিদ্যার পরিচয় পাওয়া যায় নাই।

কলিকাতার কোন উকীল বাবু একবার কাশী বেড়াইতে গিয়াছিলেন ; সাধু-সন্ন্যাসীদিগকে তিনি বড় বিশ্বাস করিতেন না। তিনি ত্রৈলিঙ্গ স্বামীকেও ভণ্ড বলিয়া জানিতেন। এক দিবস তিনি তাঁহার কোন বন্ধুর অনুরোধে তাঁহাকে দেখিবার জন্য গমন করেন। ঐ সময়ে স্বামীজী মণিকর্ণিকা ঘাটের চন্দ্বনলের উপর বসিয়া-ছিলেন। যে সময়ে তিনি স্বামীজীর নিকটে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে দর্শন করিতেছিলেন, সেই সময়ে স্বামীজীর দৃষ্টি তাঁহার উপর পতিত হয়। তিনি তখনই তাঁহাকে সেই স্থান হইতে কিছু দূরে যাইতে ইঙ্গিত করেন। বোধ হয়, উকীল বাবু তাঁহার ইসারা বুঝিতে পারেন নাই। সেই জন্য তিনি সেই স্থান পরিত্যাগ না করিয়া আপনার বন্ধুর সহিত স্বামীজীর সম্বন্ধে কথোপকথন করিতেছিলেন। স্বামীজী তাঁহার একজন শিষ্যকে কয়েকটি কি কথা বলায়, ঐ শিষ্য উকিল বাবুকে সেই স্থান হইতে কিছু অন্তরে সরিয়া যাইতে বলেন। উকিল বাবু ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করায়, তিনি তাঁহাকে এই কথাগুলি বলেন, 'গুরুজীর দ্বারা জানিলাম, আপনি ভয়ানক পাপী। আপনি যাহার গর্ভজাত কন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন, তাহারই সহিত কি না গুপ্তভাবে রতিক্রীড়া করিয়া থাকেন। আপনি অমুক স্থানে অমুকের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন। অমুকের কন্যা আপনার শাশুড়ী। আপনি তাহারই ধর্মনাশ করিয়াছেন। আপনার যদি স্বামীজীকে দেখিবার ইচ্ছা থাকে, আপনি উঁহার সীমানার বাহিরে দাঁড়াইয়া দেখুন।' উকিল বাবুর বন্ধু এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া কিছু বিস্মিত হন এবং অনুসন্ধান দ্বারা জানিতে পারেন, স্বামীজীর প্রত্যেক কথাই সত্য।

১৮০৫ শকাব্দে কাশীধামে পঞ্চগঙ্গার গর্ভে ত্রৈলিঙ্গ স্বামী 'লাট' নামক একটি প্রস্তর-নির্মিত শিবলিঙ্গ স্থাপিত করেন এবং ইহার কয়েক দিবস পরে পঞ্চগঙ্গার উপরে যে আশ্রমে তিনি বাস করিতেন, সেই আশ্রমে মহা সমারোহে 'ত্রৈলিঙ্গেশ্বর' নামে আর একটি শিবলিঙ্গ সংস্থাপিত করেন। মঙ্গলপ্রসাদ নামক একজন শিষ্য উঁহার সেবক

হন। উক্ত আশ্রমে স্বামীজীর একটি প্রতিমূর্তিও বিদ্যমান আছে।

১৮০৯ শকাব্দের পৌষমাসের শুক্লা একাদশীর সায়ংকালে ইনি দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুর একমাস পূর্বে জানিতে পারিয়াছিলেন যে, অমুক দিনে তাঁহার কালপূর্ণ হইবে। ঐ দিন সমাগত হইলে তিনি সন্ধ্যার প্রাক্কালে উপযুক্ত স্থানে আসিয়া যোগাসনে উপবিষ্ট হন ও স্থিরভাবে দেহত্যাগ করেন। ইনি ২৮০ (দুই শত আশী) বৎসর পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। ইনি হিন্দু ছিলেন। হিন্দুরীতিতে পবিত্র জীবন গঠন করিয়া হিন্দুধর্মেরই চরমোৎকর্ষ দেখাইয়া গিয়াছেন।

মহাত্মা ত্রৈলিঙ্গ স্বামী-প্রণীত উপদেশপূর্ণ 'মহাবাক্য-রত্নাবলী' নামক একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়।

—ঃ০ঃ—

নারায়ণ স্বামী

১৮৩৭ শকাব্দের চৈত্র মাসে শুক্লা নবমীতে (১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে) অযোধ্যানগরের চারিক্রোশ উত্তরে 'ছুপিয়া' নামক এক ক্ষুদ্র গ্রামে নারায়ণ স্বামী জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম হরিপ্রসাদ। হরিপ্রসাদ সামবেদীয় কৌথুমী শাখার সাবর্ণ-গোত্রীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। ইঁহার ঘনশ্যাম, রামপ্রতাপ ও ইচ্ছারাম নামে তিন পুত্র ছিল। ঘনশ্যামের বয়স যখন দশ বৎসর, তখন ইঁহার মাতা ও পিতার মৃত্যু হয়। মাতা-পিতা পরলোকগমন করিলে ইঁহার মনে এরূপ বৈরাগ্য জন্মে যে, ইনি সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া দ্বাদশ বৎসর বয়সে তীর্থ-পরিভ্রমণে বহির্গত হন। ইনি বদরিকাশ্রম, কেদারনাথ, কাশীধাম, শ্রীক্ষেত্র প্রভৃতি নানাস্থান পরিভ্রমণ করিয়া, পরিশেষে জটাকৌপীনধারী, মৃগচর্ম-ব্যবহারী হইয়া পড়েন। বিবিধ শাস্ত্রালোচনা করিয়া ইঁহার এরূপ জ্ঞান জন্মিয়াছিল যে, কূট তর্কসকল অতি সহজে মীমাংসা করিয়া দিতে পারিতেন। নানা তীর্থ ভ্রমণ করিয়া ও নানা সাধু-সন্ন্যাসীর সহিত আলাপ-পরিচয় করিয়া ১৯ বৎসর বয়সের পর তিনি কাঠিয়াগড় প্রদেশে উপস্থিত হন, পরে জুনাগড়ের নিকট শ্রীলোজ গ্রামে আসিয়া রামানন্দী সম্প্রদায়ে দীক্ষিত হন। রামানন্দ স্বামী ঐ সময়ে জীবিত ছিলেন। তিনি উপযুক্ত শিষ্য পাইয়া অতি যত্নের সহিত নানাবিধ বিষয়ের উপদেশ দেন। রামানন্দ স্বামী যখন দেখিলেন, ঘনশ্যাম সর্ববিষয়ে উপযুক্ত হইয়াছে, তখন তিনি ইঁহার ঘনশ্যাম নাম পরিবর্তন করিয়া নরোয়ণ স্বামী নাম প্রদান করেন।

রামানন্দ স্বামী দেহরক্ষা করিলে, নারায়ণ স্বামী তাঁহার পদপ্রাপ্ত হইয়া, তাঁহার অর্থাৎ 'রামানন্দী সম্প্রদায়ের' আচার্য হন। ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে ইনি আপন শিষ্যবৃন্দের সহিত মিলিত হইয়া আহমদাবাদে গিয়া আপনার মত প্রচার করিতে থাকেন। ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে ভাউনগর রাজ্যের গড়হড়া নামক স্থানে ধর্মপ্রচার করিয়া ৮০০ শত শিষ্য প্রাপ্ত হন। ইঁহার ধর্মোপদেশে বন্য পশুপক্ষীদিগের মনে ধর্মভাব জাগরূক হইত। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে নারায়ণ স্বামী গড়হজ গ্রামে 'দাদাকাছরের দরবার' নামক মন্দির নির্মাণ করাইতে করাইতে জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা দশমীতে দেহরক্ষা করেন। শিষ্যগণ তাঁহার দেহ দাহ করিয়া তদুপরি এক বৃহৎ মন্দির নির্মাণ করাইয়া তম্মধ্যে ইঁহার পদচিহ্ন স্থাপন করেন। মৃত্যুকালে ইঁহার সম্প্রদায়ে ৫ লক্ষ পরিবার ও ৫ শত সাধু বর্তমান ছিল।

—:০:—

রামদাস স্বামী

মহারাষ্ট্রদেশে গোদাবরী নদীর উত্তর তীরে 'বীড়' পরগণার সন্নিকটে জম্বু গ্রামে সূর্যজীপন্ত নামধারী জনৈক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। ইঁহার পত্নী রাণু বাঈ অতিশয় দেবভক্তিপরায়ণা ছিলেন। দেবতাদিগের অনুগ্রহে রাণু বাঈ ১৬০৯ খ্রীষ্টাব্দে সুলক্ষণ-সম্পন্ন এক পুত্র প্রসব করেন। সূর্যজীপন্ত ও রাণু বাঈ শ্রীরামচন্দ্রের ভক্ত ছিলেন, সেই জন্য ইঁহারা পুত্রের নাম রামদাস রাখেন। সপ্তম বৎসর বয়সের সময় রামদাসের উপনয়ন-সংস্কার সম্পন্ন হয়। ঈশ্বরানুগ্রহে ঐ সময় হইতে ইঁহার ধর্মে মতি জন্মে। রামদাস যৌবন-সীমায় উপস্থিত হইলে, ইঁহার আত্মীয়-স্বজনেরা ইঁহার বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করেন। বিবাহের দিবস পাত্র আত্মীয়-স্বজন দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া পাত্রী-গৃহে উপস্থিত হন। বিবাহের সময় উপস্থিত হইলে পাছে শুভলগ্ন ভ্রষ্ট হইয়া যায়, এই ভয়ে পুরোহিত মহাশয় কন্যাকর্তা ও অন্যান্য ব্যক্তিদিগের প্রতি 'সাবধান' এই বাক্য প্রয়োগ করেন। পুরোহিতের এই বাক্যে সকলেই বুঝিয়াছিলেন যে, বিবাহের সময় উপস্থিত হইতেছে, পাছে লগ্নভ্রষ্ট হইয়া যায়, এই জন্য উনি সকলকে সাবধান করিয়া দিতেছেন। কিন্তু রামদাসের মনে অন্য ভাবের উদয় হয়। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, ঐ 'সাবধান' কথাটি পুরোহিত মহাশয় আমাকেই লক্ষ্য করিয়া বলিলেন। সংসারবন্ধন অতি দুঃখজনক, ইহাতে সুখ ও শান্তির লেশমাত্র নাই। আমার সময় উপস্থিত দেখিয়াই পুরোহিত মহাশয় আমায় ইঙ্গিতে সাবধান হইতে বলিলেন। রামদাস মনে মনে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া তথা হইতে পলায়ন করিলেন।

রামদাসের পিতা সভাস্থলে অবমানিত হইয়া পুত্রের অনুসরণ করেন ও পুত্রকে নানামতে বুঝাইয়া বাটী প্রত্যাগমন করিতে বলেন। রামদাস পিতার যুক্তি ও উপদেশ-পূর্ণ বাক্যসকল শ্রবণ করিয়া বলেন, 'আমি ভোজনে প্রস্তুত হইয়াছিলাম, কিন্তু ভোজ্যদ্রব্য বিষমিশ্রিত জানিয়া উহা পরিত্যাগ করিয়াছি।' কামরিপু চরিতার্থ করিবার জন্যই লোকে বিবাহ করিয়া থাকে; বিশেষ সুন্দরী স্ত্রীর জন্য লোকে লালায়িত। মূঢ় ব্যক্তিরা সেই স্ত্রীকে পালন করিতে করিতেই তাহাদের সমস্ত জীবন অতিবাহিত করে। দুর্দান্ত কাল তাহাদের শিখাকর্ষণ করিতেছে জানিয়াও প্রবুদ্ধ হয় না। অতএব পরমার্থ-হানিজনক অকিঞ্চিৎকর বাক্যসকল আমাকে প্রয়োগ করা আপনার উচিত নয়। আপনি গৃহে প্রতিগমন করুন, আমিও শ্রীরামচন্দ্রের উদ্দেশে প্রস্থান করি।' সূর্যজীপন্ত পুত্রের মুখে ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং পুত্রের মনে বৈরাগ্যের উদয় হইয়াছে জানিতে পারিয়া, ভগ্নোৎসাহে গৃহে প্রত্যাগমন করেন। রামদাসও পিতার অনুমতি লইয়া তপস্যার্থ গমন করেন।

রামদাস স্বামী কয়েক বৎসর কাল কঠোর তপস্যা করিয়া সিদ্ধ হন। ইনি রামভক্ত ছিলেন বলিয়া, ভগবান ইঁহাকে শ্রীরামচন্দ্রের সেই নবদূর্বাদলশ্যামমূর্তিতে দর্শন দেন। এইরূপ কথিত আছে যে, রামদাস পাণ্ডারপুর নামক কোন তীর্থে গমন করিয়া দেখেন যে, তথাকার দেবমন্দিরে শ্রীকৃষ্ণমূর্তি প্রতিষ্ঠিত। ইনি সেই বিগ্রহ দর্শন করিয়া শ্রীরামচন্দ্রের মূর্তি ধ্যান করেন। ভক্তবৎসল হরি, ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য ইঁহাকে শ্রীরামচন্দ্র মূর্তিতে দর্শন দিয়াছিলেন।

১৬৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ফাল্গুন মাসে রামদাস তীর্থ-পর্যটনে বহির্গত হন। তিনি ভারতবর্ষের নানাস্থান ভ্রমণ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। ভারত-ভ্রমণ-সময়ে তিনি রামোপাসনার প্রচার করিয়াছিলেন। ১৬৪৪ খ্রীষ্টাব্দের বৈশাখ মাসে রামদাস মহাবালেশ্বরে আশ্রম স্থাপন করিয়া তাহাতে শ্রীরামচন্দ্রের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন।

রামদাস যে একজন প্রধান সাধুপুরুষ, তাহা সকলে অবগত হইলে, ঐ স্থানে জনসমাগম হইতে থাকে। লোকজনের যাতায়াতে ইঁহার কার্যে ব্যাঘাত জন্মাইতে থাকায়, ইনি লোকালয় পরিত্যাগ করিয়া পর্বত-গুহায় গমন করেন।

রামদাস স্বামীর যশঃসৌরভ দিগ্দিগন্ত পরিব্যাপ্ত হইলে মহারাষ্ট্রীয় নৃপতি শিবাজী ইঁহার সহিত উক্ত মন্দিরে সাক্ষাৎ করিতে আসেন; কিন্তু সাক্ষাৎ না পাওয়ায় ভগ্নমনোরথ হইয়া ফিরিয়া যান ও স্বামীজীর উদ্দেশে নানাস্থানে লোক প্রেরণ করেন। অনন্তর শিবাজী গোদাবরী নদীর তীরবর্তী 'নাসিক' নামক স্থানে ইঁহার সাক্ষাৎ লাভ করেন ও দীক্ষাপ্রার্থী হন; কিন্তু স্বামীজী ইঁহাকে দীক্ষিত না করিয়া এই মাত্র বলেন, 'বৎস! তোমাকে সর্বদা রাজকার্যে ব্যাপৃত থাকিতে হইবে, অতএব তোমায় কিরূপে দীক্ষিত করিব?' শিবাজী ছাড়িবার পাত্র নহেন। দীক্ষিত হইবার জন্য নিতান্ত পীড়াপীড়ি করায় স্বামীজী তাঁহাকে আপনার পাদোদক দিয়া সেই স্থান হইতে প্রস্থান করেন। শিবাজীর গুরুভক্তি অতি প্রবল ছিল। তিনি কোন বিপদের সূচনা দেখিলেই গুরু রামদাস স্বামীকে মনে করিতেন ও তাঁহার নিকট গিয়া যথাযথ সমস্ত ব্যক্ত করিতেন।

যে সময়ে মোগলেরা তাঁহার রাজধানী আক্রমণ করে, সেই সময়ে তিনি তাঁহার গুরু রামদাস স্বামীর নিকট গমন করেন। রামদাস স্বামী চিন্তাযুক্ত শিবাজীকে দেখিয়াই বলেন, 'শিবাজী! তুমি এখানে কি জন্য আসিলে? তুমি কোন চিন্তা করিও না, যুদ্ধে প্রস্তুত হও, এ যুদ্ধে তুমি জয়ী হইবে।' শিবাজী গুরুর মুখে হঠাৎ এরূপ বাণী শ্রবণ করিয়া ঈশ্বর-জ্ঞানে তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করেন। স্বামীজীর ঐ ভবিষ্যদ্‌বাণী ফলবতী হইয়াছিল;—শিবাজী ঐ যুদ্ধে জয়ী হইয়াছিলেন।

রামদাস স্বামী যোগবলে অনেক অমানুষিক কার্য করিয়া গিয়াছিলেন। এরূপ শুনিতে পাওয়া যায় যে, তিনি এক সময়ে জলশূন্য স্থানে অর্ধহস্ত পরিমিত মৃত্তিকা খনন করিয়া কতকগুলি পিপাসার্তকে অপরিমিত পরিষ্কার পানীয় জল পান করাইয়াছিলেন। ১৫৭৭ শকাব্দের জ্যৈষ্ঠমাসে ইঁহার জননীর মৃত্যু হয়। স্বামীজী ইতিপূর্বে এই ঘটনা জানিতে পারিয়া মাতার সদ্গতির জন্য মৃত্যুর একদিবস পূর্বে গৃহে আসিয়া উপস্থিত হন। সুস্থকায়া রামদাস-জননী জানিতেন না যে, কয়েক ঘণ্টাকাল পরে তাঁহার জীবনান্ত হইবে। বহুদিবস পরে মাতা-পুত্রের মুখাবলোকন করিয়া বলিয়াছিলেন, 'রামদাস! এতদিন পরে কি তোর দুঃখিনী জননীকে মনে পড়িল?' মাতার এই কথা শ্রবণ করিয়া রামদাস বলিয়াছিলেন, 'মা! কাল আর তোমায় দেখিতে পাইব না, সেই জন্য আমি একবার তোমার চরণ দর্শন করিতে আসিয়াছি।'

শিবাজী নিজ গুরুর সম্মানার্থ ১৫৭২ শকাব্দে সজ্জনগড় নামক স্থানে একটি মন্দির নির্মাণ করাইয়া দেন। উহা অদ্যাপি বর্তমান আছে। রামদাসের 'আঞ্জুরাই' নাম্নী দেবী, ঐ মন্দির-মধ্যে প্রতিষ্ঠিত আছেন।

মহাত্মা রামদাস স্বামী ১৬৮১ খ্রীষ্টাব্দে দেহরক্ষা করেন। ইনি অনেক গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, তন্মধ্যে 'দাস-বোধ' ও মনঃসম্বন্ধীয় শ্লোকই সুবিখ্যাত।

ভাস্করানন্দ সরস্বতী

১৮৯৭ সংবতের আশ্বিন মাসে শুক্লা সপ্তমী তিথিতে অর্ধরাত্রিসময়ে কানপুরের অন্তর্গত 'মৈথেলালপুর' গ্রামে মহাত্মা ভাস্করানন্দ সরস্বতী জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম মিশ্রলাল মিশ্র। ইঁহারা সামবেদীয় কনৌজ ব্রাহ্মণ। মিশ্রলাল সংস্কৃত অধ্যাপক ছিলেন। বেদ ও পুরাণে তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। মহাত্মা ভাস্করানন্দ স্বামী জন্মগ্রহণ করিলে, মিশ্রলাল পুত্রের নাম 'মতিরাম' রাখেন। অষ্টম বৎসর বয়সে মতিরামের উপনয়ন হয়। ঐ সময়ে প্রচলিত রীত্যনুসারে মিশ্রলাল মতিরামকে পাঠাভ্যাসের জন্য গুরুগৃহে পাঠাইয়া দেন। যত্ন ও অধ্যবসায়ের গুণে সপ্তদশ বৎসর বয়সে মতিরাম একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইয়া উঠেন। মতিরামের বয়স যখন দ্বাদশ বৎসর, সেই সময়ে তাঁহার বিবাহ হয়। বিবাহের পাঁচ বৎসর পরে একটি পুত্র-সন্তান জন্মে; কিন্তু পুত্রটি কালের কুটিল কটাক্ষে পতিত হওয়ায় শৈশবেই ইহলীলা সংবরণ করে। পুত্রের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে মতিরামের মনে বৈরাগ্যের উদয় হয়। তিনি ঐ সময়ে সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া বৈরাগ্যপথে ধাবিত হন। গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া প্রথমে ইনি উজ্জয়িনী নগরে আসেন। এই স্থানে উপযুক্ত গুরু প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার নিকট 'যোগমার্গ-নিদর্শক' গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করেন ও যোগাভ্যাসে রত হন। কয়েক বৎসরকাল উজ্জয়িনী নগরে বসবাস করিয়া মতিরাম গুজরাট ও মালব দেশে গমন করেন। তথায় সাত বৎসর কাল বাস করিয়া সমগ্র বেদান্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার পর, তিনি উজ্জয়িনীতে পুনরায় প্রত্যাবর্তন করেন। ঐ সময়ে প্রসিদ্ধ পরমহংস শ্রীপূর্ণানন্দ সরস্বতীর সহিত ইঁহার সাক্ষাৎ হয়। পূর্ণানন্দ সরস্বতী, মতিরামকে উপযুক্ত পাত্র দেখিয়া দীক্ষিত করেন ও মতিরাম নামের পরিবর্তে 'শ্রীস্বামী ভাস্করানন্দ সরস্বতী', এই নাম প্রদান করেন। ঐ সময়ে মতিরামের বয়স সপ্তবিংশতি বৎসর মাত্র হইয়াছিল। ভাস্করানন্দ স্বামী ঐ আশ্রমে কিছুদিবস বাস করিয়া কাশীধামে আগমন করেন। কাশীর দুর্গাবাড়ীর নিকটস্থ আনন্দবাগে ইঁহার আশ্রম নির্মিত হয়। কয়েক মাসকাল ইনি ঐ আশ্রমে থাকিয়া ফতেপুরের অন্তর্গত অশনিপুরে আসেন ও তথা হইতে কানপুর হইয়া জন্মভূমি দর্শনে গমন করেন। ইহার কিছু দিবস পরে, স্বামীজী কেবলমাত্র কৌপীন পরিধানপূর্বক ভারতের সকল তীর্থ পরিভ্রমণ করিয়া কাশীধামের সেই আনন্দবাগের আশ্রমে পুনরায় আগমন করেন। কথিত আছে, ভারতের প্রায় সকল তীর্থ তিনি দর্শন করিয়াছিলেন।

বদরিকাশ্রমে যাইবার সময়, পথিমধ্যে তুষারপতন হওয়ায়, স্বামীজী অত্যন্ত কষ্ট পাইয়াছিলেন। শীতে তাঁহার সমুদয় অঙ্গ অবশ হইয়া গিয়াছিল ও তিনি পথি-মধ্যে মৃতপ্রায় হইয়া পতিত ছিলেন। তৎকালে তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা করিবার জন্য সঙ্গে কেহই ছিল না। এই ঘটনার কিয়ৎক্ষণ পরে, এক মহাজন সেই স্থান দিয়া গমন করিতেছিলেন, তিনি উঁহার ঐরূপ বিপন্নাবস্থা দর্শন করিয়া সেবা-শুশ্রূষা দ্বারা তাঁহার প্রাণরক্ষা করেন। এই স্থানে সাধু অনন্তরামের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। বেদান্ত-

বিদ্যায় সাধু অনন্তরামের অসাধারণ পারদর্শিতা ছিল। তিনি সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং হরিদ্বারের কোন নির্জন স্থানে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। সাধু অনন্তরাম, ভাস্করানন্দের সমাগমে অতিশয় সুখী হইয়াছিলেন এবং দুই জনে ঈশ্বর-তত্ত্ব আলোচনা করিয়া পরস্পর আনন্দিত হইতেন। এইরূপে তাঁহার চল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রম অতীত হইয়াছিল। হরিদ্বার ত্যাগ করিয়া তিনি পুনরায় কাশীধামে আনন্দবাগে আগমন করেন।

স্বামীজী আনন্দবাগে আসিয়া ৯২৫ সংবতে কৌপিন পর্যন্ত পরিত্যাগ করেন। একদা শীতকালে কাশীবাসী বিদ্বন্মণ্ডলী ও রাজন্যবর্গ স্বামীজীর নিকট উপস্থিত হইয়া অতি বিনীতভাবে বলিয়াছিলেন, 'গুরুদেব! শীতকালে সকলেই বস্ত্রদ্বারা গাত্র আচ্ছাদন করিয়া থাকে, কিন্তু আপনি কঠোর শীত-ঋতুতে অনাবৃতগাত্রে দিবারাত্র যাপন করেন। আমরা আপনাকে অনুরোধ করি যে, আপনি গাত্রবস্ত্র গ্রহণ করিয়া শীত হইতে দেহরক্ষা করুন।' তাঁহাদের কথায় স্বামীজী উত্তর করেন, 'সমীচীন ব্যক্তি, যে বস্তু একবার ত্যাগ করেন, তাহা পুনরায় গ্রহণ করেন না।' স্বামীজী ধীর ও শান্ত প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি নির্জন স্থানে বাস করিতেই ভালবাসিতেন, কিন্তু ইনি নির্জন ভালবাসিলে কি হয়, ইঁহার যোগ ও তপস্যার খ্যাতি চতুর্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়ায়, তীর্থযাত্রীর ন্যায় অজস্র জনমণ্ডলী ইঁহাকে দর্শন করিবার জন্য তথায় আগমন করিত। ইঁহার ধর্মোপদেশ শ্রবণ করিয়া মহারাজ হইতে পর্ণকুটীরবাসী দরিদ্র পর্যন্ত অনেকেই ইঁহার নিকট দীক্ষিত হন ও শিষ্যত্ব স্বীকার করেন। জনশ্রুতি এইরূপ যে, ভাস্করানন্দ স্বামীর লক্ষাধিক শিষ্য হইয়াছিল। কেবল দেশস্থ ভক্তজনেরাই যে ভাস্করানন্দ স্বামীর মহিমা বুঝিয়াছিলেন, এমন নহে, নব্য সভ্যতম সুশিক্ষিত ইউরোপ ও আমেরিকার মহৎ মহৎ ব্যক্তিগণও ইঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন।

তপঃপ্রভাবে ভাস্করানন্দ স্বামীর অনেক অমানুষী ক্ষমতা জন্মিয়াছিল; কিন্তু তিনি ঐশিক ক্ষমতাসকল প্রকাশ করিতেন না। দুই একটা ঘটনায় যাহা প্রকাশ পাইত, তাহাতেই তাঁহার ক্ষমতার বিষয় বুঝিতে পারা যাইত। আমরা এই স্থানে তাঁহার কয়েকটা ঘটনার বিষয় উল্লেখ করিলাম।

বড়হর নগরের বেদশরণ কুমারীর কোন অভীষ্টসিদ্ধি সম্বন্ধে স্বামীজী ভবিষ্যৎ ফল বলিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার সেইমত কার্যসিদ্ধি হওয়ায় তিনি লক্ষাধিক টাকা লইয়া স্বামীজীকে উপহার দিবার জন্য গমন করিয়াছিলেন। স্বামীজী ঐ অর্থ গ্রহণ না করায়, তিনি তাহার দ্বারা আনন্দবাগ উদ্যানের সন্নিকটে এক সুবৃহৎ শিবমন্দির নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন, তাহার এক প্রকোষ্ঠে স্বামীজীর প্রস্তরময়ী মূর্তি স্থাপিত আছে।

শীতলপ্রসাদ নামক এক ব্যক্তি কাশীধামে বাস করিতেন, তিনি স্বামীজীর শিষ্য ছিলেন। এক দিবস তাঁহার এক পুত্র দ্বিতল বাটীর ছাদ হইতে পড়িয়া গিয়া মৃতপ্রায় হইয়া গিয়াছিল। শীতলপ্রসাদ স্বামীজীর ক্ষমতার বিষয় জানিতেন, সুতরাং তিনি ডাক্তারদিগের নিকট গমন না করিয়া গুরুজীর নিকট আগমন করেন। স্বামীজী শিষ্যকে অত্যন্ত কাতর দেখিয়া যাহা ঘটিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি শিষ্যকে সম্বোধন করিয়া বলেন, 'প্রসাদ! এই গঙ্গাজলটুকু তোমার ছেলেকে খাওয়াইয়া দিও, তোমার ছেলে আরোগ্য হইবে, তুমি কোন চিন্তা করিও না।' শীতলপ্রসাদ ঐ জল

তাঁহার পুত্রকে খাওয়াইবার পর হইতেই পুত্র ক্রমে সুস্থ হইতে থাকে, এবং অতি-অল্প দিবসের মধ্যেই আরোগ্য লাভ করে।

এই কলিকাতা শহর হইতে কোন এক ব্যক্তি স্বামীজীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ এবং যোগশিক্ষা করিবাব জন্য গমন করিয়াছিলেন। তিনি স্বামীজীর নিকট আপনার মনোভাব ব্যক্ত করিলে স্বামীজী তাঁহাকে বলেন, 'তোমার এখনও দীক্ষা লইবার সময় হয় নাই। তুমি না বলিয়া গুপ্তভাবে আমার কাছে আসিয়াছ। তোমার গর্ভধারিণী, তোমার সহধর্মিণী, তোমার পুত্র-সন্তানেরা তোমার জন্য অত্যন্ত কাতর হইয়াছে। তুমি এখন ফিরিয়া যাও, কয়েক বৎসর পরে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিও।' ঐ ব্যক্তি স্বামীজীর কথা শুনিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হন, পরে আপনার মনোভাব গোপন করিয়া বলেন, 'প্রভো ! আমার স্ত্রী, পুত্র প্রভৃতি সকলেই আছেন সত্য, কিন্তু আমি তাঁহাদের অনুমতি লইয়া আসিয়াছি।' স্বামীজী বলেন, 'তুমি অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছ সত্য, কিন্তু তাঁহাবা তোমায় এ কার্যে অনুমতি দেন নাই। তুমি তাঁহাদের উপর বিরক্ত হইয়া চলিয়া আসিয়াছ। তোমার সংসার ত্যাগ করিবার আরও একটি কারণ আছে, সেটি বলিয়া তোমায় লজ্জিত করিতে চাই না। তুমি ঘরে ফিরিয়া যাও, তোমাব, এখনও আকাঙ্ক্ষা মিটে নাই।' স্বামীজীর কথায় তিনি বলেন, 'প্রভু ! আমার মনে বৈরাগ্যের উদয় হওয়ায় আমি সংসার ত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি। ইহা ব্যতীত আমার আর কোন কারণ নাই।' স্বামীজী তাঁহাকে পুনরায় বলেন, 'আচ্ছা, তুমি তোমার পার্শ্বের বাটীর কোন রমণীর প্রতি আসক্ত হইয়াছিলে কি ? তুমি যাহার সর্বনাশ করিয়াছ, সেই তোমার জ্ঞানদাত্রী। তাহারই কথায় তোমার মনে বৈরাগ্যের উদয় হইয়াছে।' স্বামীজীব অত্যদ্ভুত ক্ষমতা দর্শন করিয়া সেই ব্যক্তি তাঁহার চরণ দুইখানি জড়াইয়া ধরেন এবং পাপ হইতে মুক্ত হইবার জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করেন। স্বামীজী তাঁহাকে অনেক বুঝাইয়া বলেন, 'আচ্ছা, তোমায় দীক্ষিত করিব, কিন্তু তোমাকে এখনও কয়েক বৎসর কাল সংসারাশ্রমে থাকিতে হইবে।' সেই ব্যক্তি তাহাতে সম্মত হন। এই ঘটনার কয়েক বৎসর পরে, একটি শুভদিন দেখিয়া তিনি তাঁহাকে দীক্ষা দেন এবং যোগ-সম্বন্ধীয কতকগুলি উপদেশ প্রদান করেন। তাঁহার সেই উপদেশের সারাংশ এই স্থানে প্রকাশ করিলাম।

সংসার ত্যাগ করিয়া উদাসীন হইয়া যোগসাধন করিলে যে ঈশ্বরকে লাভ করা যায়, এমত নহে, সংসারী এবং উদাসীন উভয় যোগী যদি চিত্ত ও মনকে স্থির রাখিতে পারেন, তবেই তাঁহার সাক্ষাৎ পান। মানবের সকল গুণই আছে। মনুষ্য অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন থাকায় সে সমস্ত গুণ কার্যে পরিণত করিতে পারে না। যোগ দ্বারা সেই অজ্ঞানরূপ অন্ধকারকে দূর করা যায়। যোগবলসম্পন্ন মনুষ্যের অসাধ্য কিছুই নাই।

প্রশ্ন—যোগ কাহাকে বলে ?

উত্তর—বেদশাস্ত্রে যাহা ধ্যান বলিয়া কথিত হয়, তাহাকে অন্যান্য শাস্ত্রকারগণ যোগ শব্দে উল্লেখ করিয়া থাকেন। কতকগুলি ক্রিয়ানুষ্ঠান দ্বারা সেই যোগ লাভ করিতে হয় ; উহাদিগের মধ্যে সমাধিই সর্বপ্রধান। সমাধি বলিলে—বহির্বিষয়ে প্রসক্ত অন্তঃকরণকে একস্থলে গুটাইয়া লওয়া বুঝায়। সেই গুটাইবার কেন্দ্রস্থলটি পরমার্থ পদার্থ। ভগবান্ পতঞ্জলি বলিয়াছেন, 'যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ', চিত্তের বৃত্তি-নিরোধের নাম যোগ। এইরূপে চিত্তের বৃত্তি নিরুদ্ধ হইয়া পরমাত্মাতে স্থিত হইলে

জীবাত্মা ও পরমাত্মার* ঐক্য হইল বলা যায়। এজন্য প্রচলিত কথায় পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার ঐক্য করাকে যোগ বলে।

প্রশ্ন—যোগশিক্ষা করিতে হইলে কি কি বিষয় জানা আবশ্যক ?

উত্তর—যোগাভ্যাসে প্রথমতঃ একজন গুরু আবশ্যক। পরে মন স্থির করিবার জন্য নিজের অবস্থাতে সন্তুষ্ট হওয়া চাই ; উচ্চাভিলাষ ত্যাগ করা চাই। মনস্থির না হইলে যোগে অধিকার হয় না। ইহার পর কামাদি রিপু-ত্যাগ, নিস্পৃহতা, পরমব্রহ্মে চিত্ত-সমর্পণ ইত্যাদি আবশ্যক। তাহার পর আসন, মুদ্রা, প্রাণায়াম, ধ্যান, প্রত্যাহার, ধারণা এবং সমাধি আবশ্যক। যোগে বসিবার পূর্বে নিয়মাদি অভ্যাস করিতে হয়।

প্রশ্ন—নিয়ম কাহাকে বলে ?

উত্তর—শান্তি, সন্তোষ, আহার ও নিদ্রার অল্পতা ; সর্ববিষয়ে সর্বদা উদাসীন ভাব, যথালাভেই তৃপ্তি, নিস্পৃহতা, চিত্তস্থিরতা এবং পরমব্রহ্মে চিত্তসমর্পণাদিকে নিয়ম বলে। নিয়মের পর দেহজ্ঞান হওয়া আবশ্যক।

প্রশ্ন—দেহজ্ঞান কাহাকে বলে ?

উত্তর—যাহা হইতে জীবাত্মা, পরমাত্মা ও প্রাণ অপানাদি একত্র মিলিত হয়, তাহাকে দেহ বলে। দেহমধ্যে সর্বশুদ্ধ দ্বিসপ্ততি সহস্র নাড়ী আছে। ঐ সকল নাড়ীর মধ্যে ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না এই তিনটি নাড়ী প্রধানা এবং ইহারা ঊর্ধ্বগামিনী। আর গান্ধারী, প্রসরা, হস্তিজিহ্বা, যশা, অলম্বুষা, কুহূ এবং শঙ্খিনী নাড়ীসমূহ সর্বশরীরে, দক্ষিণাঙ্গে ও বামাঙ্গে অবস্থিত করিতেছে। এই দশটি নাড়ী হইতে বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নাড়ী উৎপন্ন হইয়া সর্বশরীরে ব্যপ্ত রহিয়াছে।

শরীরে দশ প্রকার বায়ু আছে। উহার মধ্যে প্রাণ-বায়ু হৃদয়ে, অপান গুহ্য, সমান নাভিতে, উদান কণ্ঠে, ব্যান ও ধনঞ্জয় সর্বশরীরে, নাগ উদ্গারে, কূর্ম উন্মীলনে, কৃকর ক্ষুৎকুতে এবং দেবদত্ত জৃম্ভণে অবস্থিতি করিতেছে।

প্রশ্ন—ষট্‌চক্র কাহাকে বলে ?

উত্তর—মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ এবং আজ্ঞা এই ছয়টি চক্র দেহ মধ্যে আছে। উহাদিগকে ষট্‌চক্র বলে। যোগে বসিতে হইলে আসন ও মুদ্রাদি অভ্যাস করিতে হয়।

প্রশ্ন—আসন কাহাকে বলে ?

উত্তর—বসিবার রীতিকে আসন বলে। আসনাদি অভ্যাস করিতে করিতে মনের যে দুষ্প্রবৃত্তিগুলি পরিত্যাজ্য, তাহা আপনি মন হইতে পলায়ন করে এবং আসন অভ্যাস হইলে মেরুদণ্ড স্থির হয়। মেরুদণ্ড স্থির না হইলে সমাধি হয় না।

প্রশ্ন—আসন কত প্রকার ?

উত্তর—আসন চতুরশীতি প্রকার। তাহার মধ্যে সিদ্ধ, পদ্ম, ভদ্র ও স্বস্তিক এই চারিটি আসনই প্রসিদ্ধ এবং সর্বোৎকৃষ্ট। স্থিরমনে স্পৃহাশূন্য হইয়া ভক্তির সহিত অতি গোপনে আসনে উপবেশন করিয়া যোগাভ্যাস করিতে হইবে ; নচেৎ মনস্থির হয় না। কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে না যে, তুমি কোথায় কি করিতেছ। ইহা সাধারণের নিকট প্রকাশ্য নহে, কারণ, অজ্ঞ লোকে ইহার ফলের কথা শ্রবণ করিয়া

* জীবাত্মা—প্রাণ। পরমাত্মা—ঈশ্বর।

উপযুক্ত শিক্ষা ব্যতীত আসনাদি অভ্যাস করিতে বসিলে, তাহাতে কুফল ব্যতীত সুফল পায় না। সুতরাং যোগ অনিষ্টপ্রদ ও মিথ্যা বলিয়া অভিহিত হয়।

প্রশ্ন—সিদ্ধাসন কাহাকে বলে?

উত্তর—যত্নসহকারে মেরুদণ্ড সবল করিয়া একটি পাদমূল দ্বারা গুহ্যদেশ বিশেষরূপে আবদ্ধ করিবে এবং অপর পাদমূল লিঙ্গের উপরিভাগে স্থাপন করিবে, পরে স্থিরচিত্তে পরমব্রহ্মে মন সমর্পণ করিয়া ঊর্ধ্বনেত্রে ভ্রূযুগলের মধ্যভাগ নিরীক্ষণ করিতে করিতে, প্রাণায়ামানুষ্ঠান করিয়া পরমব্রহ্মকে ধ্যান করিতে হইবে। ইহাকে সিদ্ধাসন বলে।

সযত্নে দক্ষিণ পদ বাম ঊরুর উপরে এবং বাম পদ দক্ষিণ ঊরুর উপরে স্থাপন করিবে। পরে বাম হস্ত দ্বারা পৃষ্ঠদেশ হইতে বাম পদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ এবং দক্ষিণ হস্ত দ্বারা ঐরূপে দক্ষিণ পদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ধরিয়া মেরুদণ্ড সবল করিবে। পরে বক্ষঃস্থলে চিবুক স্থাপন করিয়া দুই চক্ষু দ্বারা এক সময়ে নাসিকার অগ্রভাগ দেখিতে দেখিতে প্রাণায়ামানুষ্ঠান করিয়া পরমব্রহ্ম ধ্যান করিতে হইবে; এইরূপ ক্রিয়াকে পদ্মাসন বলে।

দেহ ও মেরুদণ্ড সবল করিয়া দক্ষিণ পদ বাম ঊরু ও জানুর মধ্যে এবং বাম পদ দক্ষিণ ঊরু ও জানুর মধ্যস্থলে স্থাপন করিয়া প্রাণায়ামানুষ্ঠানপূর্বক পরমব্রহ্মে চিত্ত-স্থাপন করাকে স্বস্তিকাসন বলে।

দেহ ও মেরুদণ্ড সরল করিয়া গুল্‌ফদ্বয় বিপরীতভাবে কোষের নিম্নভাগে স্থাপন করিয়া, বাম হস্ত দ্বারা পৃষ্ঠদেশ হইতে বাম পদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ এবং দক্ষিণ হস্ত দ্বারা ঐরূপে দক্ষিণ পদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ধরিতে হইবে। পরে কণ্ঠ সঙ্কোচ করিয়া বক্ষোপরি চিবুক স্থাপন করতঃ চক্ষুর্দ্বয় দ্বারা এককালে নাসিকার অগ্রভাগ নিরীক্ষণ করিতে করিতে প্রাণায়ামানুষ্ঠানপূর্বক পরমব্রহ্ম চিন্তা করিতে হইবে; ইহাকে ভদ্রাসন বলে।

এই চারিটি আসনের যে কোন আসনে বসিয়া তিন ঘণ্টা ধ্যানে নিমগ্ন থাকিতে পারিলেই তাহার আসন সিদ্ধ হইল। এইরূপে যোগসাধন করিতে করিতে আপনিই সমাধি হইবে। ঊষাকাল এবং সন্ধ্যাকালই যোগের প্রশস্ত সময়।

প্রশ্ন—মুদ্রা কত প্রকার আছে, আর তাহাদের নামই বা কি?

উত্তর—মুদ্রা পঞ্চবিংশতি প্রকার। তাহার মধ্যে মহামুদ্রা, খেচরী, শক্তিচালনা, মহাবন্ধ, বিপরীতকরণী, জালন্ধরবন্ধ, মহাবেধ, উড্ডীয়ান, মূলবন্ধ এবং বজ্রোলী প্রধান।

বাম গুল্‌ফ দ্বারা গুহ্যদেশ বিশেষরূপে আবদ্ধ করিয়া, দক্ষিণ চরণ প্রসারণ করিয়া হস্তাঙ্গুলি দ্বারা চরণাঙ্গুলি ধরিতে হইবে। পরে বক্ষঃস্থলে চিবুক সংস্থাপন করিয়া দুই চক্ষু দ্বারাই একবারে ভ্রূযুগলের মধ্যভাগ দেখিতে হইবে। ইহাকেই মহামুদ্রা বলে।

জিহ্বাতে প্রথমতঃ নবনী দ্বারা দোহন করিয়া টানিয়া এরূপ দীর্ঘ করিতে হইবে যে, অনায়াসে তদ্দ্বারা ভ্রূমধ্যভাগ স্পর্শ করা যায়। জিহ্বা ভ্রূমধ্য-স্পর্শোপযোগী হইলে নিভৃত স্থলে গমন করিয়া বজ্রাসনে উপবেশন করিবে; পরে ভ্রূদ্বয়ের মধ্যভাগ দৃষ্টি করিতে হইবে। তৎপরে জিহ্বাকে বিপরীতভাবে ঊর্ধ্বদিকে উত্থাপিত করিয়া জিহ্বা-মূলের ঊর্ধ্বে তালুপ্রদেশস্থ অমৃতকূপে সংযুক্ত করিয়া সংযতচিত্তে পরমব্রহ্মকে চিন্তা করিতে হইবে। এইরূপ করাকে খেচরী-মুদ্রা বলে। যে এই মুদ্রা অভ্যাস করিবে তাহার দেহ সর্বদাই পবিত্র থাকিবে এবং মৃত্যু তাহার ইচ্ছাধীন হইবে।

আধারকমলে গাঢ় নিদ্রাভিভূতা কুণ্ডলিনীশক্তিকে জাগরিত করিয়া অপান বায়ুতে আরোহণ করাকে শক্তিচালনী মুদ্রা বলে। এই মুদ্রা সর্বসিদ্ধিপ্রদায়িনী। এই মুদ্রা অভ্যাস করিলে কুণ্ডলিনীশক্তিকে জাগরিত করিতে পারিলে ব্রহ্মদ্বার বিভিন্ন হইয়া ব্রহ্মরন্ধ্র-পথ উদ্ঘাটিত হয় ও জীবের প্রকৃত জ্ঞান জন্মে। একখানি শুভ্র বস্ত্রখণ্ড দ্বারা নাভি বেষ্টন করিবা অঙ্গে ভস্মাদি মাখিয়া সিদ্ধাসনে উপবেশন করিবে। পরে নাসিকা দ্বারা বায়ু আকর্ষণ করিয়া অপান বায়ুর সহিত একত্র করিতে হইবে এবং যতক্ষণ ঐ বায়ু সুষুম্না নাড়ীর অভ্যন্তরে গমন না করে, ততক্ষণ গুহ্যদেশ আকুঞ্চন করিতে হইবে। এইরূপে কুম্ভক দ্বারা বায়ু আবদ্ধ করিলে কুণ্ডলিনী জাগরিতা হইয়া ঊর্ধ্বগামিনী হন, এবং সহস্রারে পরমাত্মা সহ মিলিত হন। কুণ্ডলিনী জাগরিতা হইলে কোন বিশেষ গুপ্তগৃহে গমন করিয়া শক্তিচালনী মুদ্রা সাধন করিতে হয়।

দক্ষিণ চরণ বাম ঊরুর উপরে রাখিয়া গুহ্য আকুঞ্চন করিয়া অপান বায়ুকে ঊর্ধ্বগত করিবে ও নাভিস্থ সমান বায়ুর সহিত একত্র করিবে, পরে হৃদয়স্থ প্রাণ-বায়ুকে নিম্নগামী করিয়া প্রাণ ও অপান বায়ুর সহিত জঠরমধ্যে কুম্ভক দ্বারা আবদ্ধ করিবে। ইহাকে মহাবন্ধ বলে। ইহা অভ্যাস করিলে সুষুম্নার মধ্যভাগে বায়ু যাতায়াত করে এবং চিত্ত সদানন্দ থাকে।

তালুমূলে চন্দ্রনাড়ী এবং নাভিমূলে সূর্যনাড়ী অবস্থিত। সহস্রারনির্গত সুধা নাভিমূলস্থ সূর্যনাড়ী পান করে বলিয়া জীবের মৃত্যু হয়। চন্দ্রনাড়ী সেই সুধা পান করিলে জীব অমরত্ব প্রাপ্ত হয়। বিপরীতকরণী মুদ্রাদ্বারা চন্দ্রনাড়ীকে সেই সুধা পান করান যায়। মৃত্তিকায় মস্তক রাখিয়া, হস্তদ্বয় পাতিত করিয়া পাদযুগল শূন্যে তুলিয়া কুম্ভক করাকে বিপরীতকরণী-মুদ্রা বলে।

কণ্ঠ সংকোচ করিয়া এবং বক্ষঃস্থলে চিবুক স্থাপন করিয়া পরমব্রহ্ম ধ্যান করাকে জালন্ধরবন্ধ বলে। ইহার দ্বারা সহস্রার-নির্গত সুধা ঊর্ধ্বগামিনী হয়।

কুম্ভকযোগে নাভির নিম্নস্থ নাড়ীসমূহকে নাভির ঊর্ধ্বে উত্তোলন করাকে উড্ডয়নবন্ধ বলে। ইহার দ্বারা শরীর রোগহীন হয় এবং দেহস্থ বায়ু শুদ্ধ হয়।

মহাবন্ধ ও উড্ডয়নবন্ধ অনুষ্ঠান করিয়া কুম্ভকযোগে বায়ু রোধ করাকে মহাবেধ বলে। ইহা দ্বারা সুষুম্না-পথস্থ বায়ু ব্রহ্মগ্রন্থি ভেদ করে।

স্থিরভাবে হস্ততলদ্বয় মৃত্তিকার উপর রাখিয়া চরণদ্বয় এবং মস্তক শূন্যে উত্তোলন করিয়া পরমব্রহ্ম ধ্যান করাকে বজ্রোলীমুদ্রা বলে। এই মুদ্রা অভ্যাস করিলে সহজেই সিদ্ধ হওয়া যায়।

প্রশ্ন—প্রাণায়াম কিরূপে করিতে হইবে।

উত্তর—প্রথমে কোন একটি আসনে উপবেশন করিয়া পরমব্রহ্মরত হইয়া দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ নাসা টিপিয়া পূরক অর্থাৎ ধীরে ধীরে বাম নাসা-পথ দ্বারা ওঁ মন্ত্রে বায়ু পূরণ করিবে। পরে অনামিকা ও কনিষ্ঠা দ্বারা বাম নাসা টিপিয়া সেই বায়ু দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া শরীরস্থ পাপ-পুরুষের সহিত দেহ শোধন করিবে এবং দেহকে ব্রহ্মময় চিন্তা করিয়া পূরক-সংখ্যার চতুর্গুণ ওঁ মন্ত্র জপ করিয়া কুম্ভক অর্থাৎ শ্বাসরোধ করিবে। ইহার পর পূরক-সংখ্যার দ্বিগুণ ওঁ মন্ত্র জপ করিতে করিতে দক্ষিণ নাসাপুট ছাড়িয়া দিয়া, ধীরে ধীরে বায়ু রেচন করিবে অর্থাৎ ছাড়িয়া দিবে। পুনরায় ঐরূপ অবস্থাতেই বিপরীতক্রমে অর্থাৎ বাম নাসিকা টিপিয়া পূরক,

উভয় নাসিকা টিপিয়া কুম্ভক এবং বাম নাসিকা ছাড়িয়া দিয়া রেচক করিবে। এইরূপে প্রাণায়াম অভ্যাস করিলে দেহ পবিত্র, জ্যোতির্ময় এবং বায়ুপূর্ণ থাকে। অন্ততঃ দুইশত গণনাকাল পর্যন্ত কুম্ভক অভ্যাস করিবে।

ধ্যান দুই প্রকার;—স্থূল ও সূক্ষ্ম; মন্ত্র দ্বারা রূপাদি বর্ণন করিয়া, যে ধ্যান করা যায়, তাহাকে স্থূল-ধ্যান বলে। আর মন্ত্রশূন্য ধ্যানকে অর্থাৎ মানসপটে ব্রহ্মরূপ অঙ্কিত করিয়া তন্গত থাকাকে সূক্ষ্ম-ধ্যান বলে। সূক্ষ্মধ্যানে মগ্ন হইয়া যোগবলে শ্বাস-প্রশ্বাসাদি পরিত্যাগ করিয়া পরমব্রহ্মে চিত্ত স্থির করাকে সমাধি বলে। সমাধি-সময়ে চিত্ত পৃথিবীর সহিত সংসৃষ্ট থাকে না, সুতরাং তখন আর পার্থিব জ্ঞান কিছুমাত্র থাকে না।

স্বামীজী ১৯৫৬ সংবতের (ইং ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে) ২৭শে আষাঢ় রবিবার রাত্রি দুই প্রহরের সময় সমাধি অবস্থাতে দেহত্যাগ করেন। কেহ কেহ বলেন, বিসূচিকা রোগেই ইঁহার জীবনান্ত হয়। মৃত্যুর রাত্রে সমাধিতে বসিবার পূর্বে স্বামীজী তাঁহার আশ্রমস্থ শিষ্যদিগকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন, 'বৎসগণ! এই আমার শেষ সমাধি। আমার সময় নিকট হইয়া আসিয়াছে—অদ্য রাত্রেই এই নশ্বর দেহ হইতে প্রাণ বহির্গত হইবে!'

স্বামীজীর জীবনান্ত হইলে, শিষ্যগণ তাঁহার দেহ ভাগীরথীর জলে স্নান করাইয়া ভাগীরথীর তীরে দাহ করেন। দাহান্তে অবশিষ্টাংশ অস্থি ও কিছু ভস্ম একটি প্রস্তর-পাত্রে সংস্থাপন করিয়া আনন্দবাগে সমাধি দেন। অনেকে বলিয়া থাকেন, ইঁহার দেহ দাহ করা হয় নাই; কেবল স্নান করাইয়া প্রস্তর আধারে সংস্থাপন করিয়া আধারসহ সমাধি দেওয়া হইয়াছে। এরূপ শুনিতে পাওয়া যায় যে, কানপুরনিবাসী গয়াপ্রসাদ নামক একজন ভক্ত স্বামীজীর সমাধিমন্দির নির্মাণার্থ একলক্ষ টাকা দান করিয়াছেন।

স্বামীজীর স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ ইঁহার প্রধান শিষ্য 'ভাস্করানন্দ সংস্কৃত পাঠশালা' নামক একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। ঐ বিদ্যালয়ে বেদ, বেদান্ত, ন্যায়, মীমাংসা, জ্যোতিষ ও ব্যাকরণ শিক্ষা প্রদান করা হয়।

স্বামীজী জগতের কল্যাণহেতু অতি দুষ্প্রাপ্য 'স্বরাজ্যসিদ্ধি নায়ক' নামক একখানি প্রাচীন গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া তাহার টীকা ও বিশদ ব্যাখ্যা লিখিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। ঐ পুস্তক পাঠ করিলে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

—:o:—

দয়ানন্দ সরস্বতী

মহাত্মা দয়ানন্দ সরস্বতী ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে গুজরাটের অন্তর্গত কাটিবার প্রদেশের মর্ভিনগরে* এক উদীচ্য ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা** শৈবমতাবলম্বী ছিলেন। তিনি প্রতিদিন শিবোপাসনা না করিয়া জলগ্রহণ করিতেন না। ইঁহার আর্থিক অবস্থা সচ্ছল থাকায়, ইনি স্থানে স্থানে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। দয়ানন্দ জন্মগ্রহণ করিলে, নামকরণসময়ে ইঁহার পিতা ইঁহার নাম মূলশঙ্কর রাখেন।

মূলশঙ্কর অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। পঞ্চম বৎসর বয়ঃক্রমকালে ইনি বর্ণ-শিক্ষা করিয়া বেদের বহুসংখ্যক মন্ত্র ও বেদভাষ্যের বহুতর অংশ অভ্যস্ত করিয়াছিলেন। অষ্টম বৎসরে ইঁহার উপনয়ন-কার্য সম্পন্ন হয়। এই সময় হইতে ইনি বিশেষরূপে শাস্ত্রাদি পাঠ ও সন্ধ্যাবন্দনাদি করিতেন। চতুর্দশ বৎসর বয়সে ইনি বেদের বহুতর অংশ শিক্ষা করিয়া পাঠ সমাপ্ত করেন; কিন্তু একটি ঘটনায় ইঁহার জ্ঞান-পিপাসা আরও প্রবল হইয়া উঠে।

মূলশঙ্করের পিতা, পুত্রকে শিবমন্ত্রে দীক্ষিত করিবার জন্য সময় প্রতীক্ষা করিতে-ছিলেন। ঐ বৎসর শিবরাত্রি সমাগত হইলে, পিতা পুত্রের প্রতি এই আদেশ করেন যে, 'মূলশঙ্কর! আজ তোমায় শিবমন্ত্রে দীক্ষিত করিব। তুমি শিবমন্দিরে যাইয়া সমস্ত রজনী জাগ্রত থাকিবে।' পিতার আজ্ঞায় মূলশঙ্কর সমস্ত দিবস উপবাসী থাকিয়া রজনীতে পিতার সহিত শিবমন্দিরে গমন করেন। রজনী দ্বিতীয় প্রহরে পুরোহিত মহাশয় পূজা করিয়া বহির্দেশে গমন করিলে, মূলশঙ্কর দেখেন যে, কতকগুলি মূষিক আসিয়া কৈলাসপতি মহাদেবের নৈবেদ্য ভক্ষণ করিতেছে ও তাহার উপরে অবলীলাক্রমে বিচরণ করিতেছে। মূষিকদিগের এইরূপ আচরণ দেখিয়া মূলশঙ্কর পিতাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'পিতঃ! ইনিই কি সেই দেবাদিদেব মহাদেব?' পুত্রের এরূপ বিস্ময়সূচক প্রশ্ন শুনিয়া পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি এরূপ প্রশ্ন কেন করিতেছ?' মূলশঙ্কর বলিলেন, 'এই মূর্তি যদি সর্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর হন, তবে মূষিকসকল উঁহার গাত্রোপরি বিচরণ করিতেছে কিরূপে?' প্রশ্ন শুনিয়া পিতা পুত্রকে আপনার সাধ্যমত বুঝাইয়া দিলেন; কিন্তু মূলশঙ্কর তাহাতে তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলেন না। মনোমত

* মর্ভিনগর মাছু নাম্নী নদীর তীরে অবস্থিত। মাছু নদী মর্ভি হইতে উত্তর-বাহিনী হইয়া এগার ক্রোশ দূরে কচ্ছ উপসাগরের সহিত মিলিত হইয়াছে।

** দয়ানন্দ সরস্বতীর পিতার যে কি নাম, তাহা প্রকাশ নাই। ইনি ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্টে যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে বলিয়াছেন, 'কর্তব্যানুরোধে আমি আমার পিতার নাম প্রকাশ করিলাম না; পিতার নাম প্রকাশ করিলে আমার আত্মীয়গণ অনুসন্ধান করিয়া আমায় পুনরায় সংসারবন্ধনে আবদ্ধ করিবেন। তাহা হইলে আমি যে পবিত্র ব্রতে আমার জীবন সমর্পণ করিয়াছি, তাহা অসমাপ্তাবস্থায় থাকিয়া যাইবে।'

উত্তর প্রাপ্ত না হওয়ায় মূলশঙ্কর ব্রতভঙ্গ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে ইঁহার একটি ভগিনী পীড়িতা হইয়া কালের করালগ্রাসে পতিতা হন। মূলশঙ্কর ভগিনীবিয়োগজনিত শোকপ্রাপ্ত হইয়া যখন বুঝিলেন, ইহ-সংসারে সকল জীবকেই মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইবে, তখন, এখন হইতেই মৃত্যু-যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার উপায় অবলম্বন করা উচিত, এইরূপ চিন্তার দ্বারা মূলশঙ্করের হৃদয়ে বৈরাগ্য-বহ্নি ধিকি ধিকি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিতে লাগিল। পুত্রের হৃদয়ে বৈরাগ্যের উদয় হইতেছে জানিতে পারিয়া, পিতা ইঁহাকে বিবাহশৃঙ্খলে আবদ্ধ করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহার সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। মূলশঙ্কর ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের একদিন সন্ধ্যাকালে একুশ বৎসর বয়সে মাতা, পিতা, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনগণকে পরিত্যাগ করিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া যান।

মূলশঙ্কর বাটী পরিত্যাগ করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে সিদ্ধপুর নামক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হন। ঐ স্থানে লালা ভকৎ নামক একজন প্রসিদ্ধ যোগী অবস্থান করিতেন। মূলশঙ্কর উঁহার নাম শ্রবণ করিয়া তাঁহার নিকট গমন করেন এবং তিনি প্রকৃত সাধু কি না, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য কিছু দিবস তাঁহার নিকট অবস্থান করেন। মূলশঙ্কর নানা মতে তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়া যখন বুঝিলেন যে, লালা ভকৎ প্রকৃতই যোগী পুরুষ, তখন তিনি তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। দীক্ষিত হইলে তাঁহার নাম দয়ানন্দ শুদ্ধ-চৈতন্য* হয়। মূলশঙ্কর তাঁহার নাম-পরিবর্তনের সহিত তাঁহার বেশভূষাও পরিবর্তন করেন। তিনি গৃহ-পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়া গৈরিক-বসন গ্রহণ করেন।

সিদ্ধপুর গ্রামে প্রতি বৎসর পৌষ মাসে একটি কার্তিক মেলা হইয়া থাকে। অনেক সাধু-সন্ন্যাসী ঐ মেলা উপলক্ষে তথায় আগমন করেন। ধর্মপিপাসু দয়ানন্দ তাঁহার ধর্ম-তৃষ্ণা মিটাইবার জন্য ঐ স্থানে আসিয়া উপস্থিত হন এবং কোথায় কোন্ মহাপুরুষ অবস্থান করিতেছেন, তাহার অনুসন্ধান করিতে থাকেন। এক দিবস তিনি তথাকার নীলকণ্ঠদেবের মন্দিরে উপবিষ্ট আছেন, এরূপ সময়ে তাঁহার পিতা কয়েকজন দারবান্-সহ তথায় আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি নিরুদ্দিষ্ট সন্তানকে দেখিতে পাইয়া ধৃতসংযুক্ত অগ্নিশিখার ন্যায় জ্বলিয়া উঠেন এবং অজস্র তিরস্কার করিয়া গৃহে প্রত্যাগত হইতে বলেন। দয়ানন্দ আর কি করিবেন, পিতার কথায় সম্মতি জানাইয়া আপন অনিচ্ছাসত্ত্বেও গৃহে ফিরিতে লাগিলেন। পুত্র পাছে পুনরায় পলায়ন করে, সেই জন্য তিনি পুত্রকে প্রহরিবেষ্টিত করিয়া রাখিলেন। দয়ানন্দ সংসারসুখে জলাঞ্জলি দিয়া যে গগণবাঞ্ছিত শাশ্বত সুখের অন্বেষণে ফিরিতেছেন; সুতরাং ইনি পিতৃহস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য সর্বদাই সুযোগ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। দৈবাৎ এক দিবস প্রহরিগণ সকলেই নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়ে। দয়ানন্দ সুযোগ বুঝিয়া পুনরায় পলায়ন করেন। প্রহরিগণ জাগ্রত হইলে পাছে ধৃত হন, এই ভয়ে তিনি তত্রত্য একটি মন্দিরের-সমাচ্ছাদিত

---

* শঙ্করাচার্য-প্রতিষ্ঠিত চারি মঠে চারি প্রকার ব্রহ্মচারী আছেন। মঠানুসারে ব্রহ্মচারী-দিগের ভিন্ন ভিন্ন উপাধি হইয়া থাকে। উত্তর মঠের 'আনন্দ', দক্ষিণ মঠের 'চৈতন্য', পূর্ব মঠের 'প্রকাশ' এবং পশ্চিম মঠের উপাধি 'স্বরূপ'। ইহার দ্বারা বুঝা যায় যে, দয়ানন্দ দক্ষিণ মঠান্তর্গত ব্রহ্মচারী হইয়াছিলেন।

বৃক্ষোপরি আরোহণ করিয়া লুকাইয়া থাকেন। দুই দিবস অনাহারে দিনমানে বৃক্ষোপরি আরোহণ করিয়া লুকাইয়া ও রাত্রিকালে পথ হাঁটিয়া যখন আপনাকে নিরাপদ বুঝিলেন, তখন দিবারাত্রি চলিতে আরম্ভ করেন। ক্রমে ইনি আহমদাবাদ হইয়া বরদায় আসেন ও তথাকার চেতনমঠে কিছু দিন অবস্থান করিয়া চানদ-কল্যাণী নামক স্থানে গোপালানন্দ পুরী ও শিবানন্দ গিরির নিকট যোগশিক্ষা করেন। ঘটনাক্রমে পূর্ণানন্দ সরস্বতী নামক জনৈক সন্ন্যাসী সেই সময়ে শৃঙ্গগিরির মঠ হইতে আগমন করিয়া চানদের অদূরস্থিত একটি নির্জন স্থানে অবস্থিতি করিতেছিলেন। দয়ানন্দ সন্ন্যাস-ধর্মে দীক্ষিত হইবার অভিপ্রায়ে পূর্ণানন্দের নিকট গমন করেন ও দীক্ষিত হন। দীক্ষার পর ইঁহার নাম দয়ানন্দ সরস্বতী হয়। ঐ সময়ে ইঁহার বয়স পঁচিশ বৎসরের অধিক হয় নাই।

১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে হরিদ্বারে কুম্ভমেলা হয়। মেলা উপলক্ষে নানা দেশ-দেশান্তর হইতে সাধু-সন্ন্যাসীর সমাগম হইয়া থাকে। বহুদর্শী ও জ্ঞানী সাধুপুরুষদিগের সাক্ষাৎ পাইবার জন্য দয়ানন্দও তথায় আগমন করেন। ইহার পর ইনি ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে কানপুর, কাশী, এলাহাবাদ প্রভৃতি স্থান পরিদর্শন করিয়া ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে মথুরাধামে আসিয়া উপনীত হন।

দয়ানন্দ যে সময়ে মথুরায় আগমন করেন, সেই সময়ে ইঁহার বয়স ৩৪ বৎসর মাত্র। এই স্থানে ইনি একজন মহা যোগী পুরুষের সাক্ষাৎলাভ করেন। ঐ মহাপুরুষের নাম বিরজানন্দ স্বামী, বয়স ৮১ বৎসরের উপর হইবে। ইঁহার পঞ্চম বৎসর বয়সে সাংঘাতিক বসন্ত রোগে চক্ষুদ্বয় নষ্ট হইয়া গিয়াছিল; কিন্তু ইঁহার অসাধারণ স্মৃতি-শক্তি ছিল। মুখে শুনিয়া ইনি বেদাদি শাস্ত্র সকল কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিয়াছিলেন। এই মহাপণ্ডিত ও সাধুর নিকট দয়ানন্দ শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইনি বিরজানন্দের নিকট অধ্যয়ন ও যোগশিক্ষা করিয়া আগ্রায় আগমন করেন।

দয়ানন্দ মূর্তিপূজার বড়ই বিরোধী ছিলেন। জগতে মূর্তিপূজা খণ্ডনই ইঁহার প্রধান কার্য ছিল। ইনি এক বেদ ব্যতীত আর অন্য কিছুই বিশ্বাস করিতেন না। ইনি বিদ্যার্থী হইয়া বিরজানন্দের নিকটে আসিলে তিনি বলিয়াছিলেন, 'বৎস! তুমি এতকাল যাহা পড়িয়াছ, তাহার ভিতরে অধিকাংশই মনুষ্য-রচিত গ্রন্থ। মনুষ্য-রচিত গ্রন্থের প্রভাব বিদ্যমান থাকিতে তোমার হৃদয়ে আর্য গ্রন্থের মর্ম প্রবিষ্ট ও প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে না; অতএব তুমি মনুষ্য-রচিত গ্রন্থ ফেলিয়া দিয়া আমার নিকট পুনর্বার পাঠ আরম্ভ কর।'

দয়ানন্দ মূর্তিপূজার অসারত্ব প্রতিপন্ন করিবার জন্য কাশীর পণ্ডিতমণ্ডলীর সহিত বিচারপ্রার্থী হন। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই নভেম্বর মঙ্গলবার, অপরাহ্ণ তিন ঘটিকার সময় দুর্গামন্দিরের নিকটস্থ একটি উদ্যানে বিচারসভার অধিবেশন হয়। বিচারে কিন্তু দয়ানন্দই পরাজিত হন। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে ডিসেম্বর ইনি কলিকাতায় আগমন করেন। ইনি কলিকাতায় নানাস্থানে বক্তৃতা করিয়া ফরাক্কাবাদে গমন করেন। ইহার পর ইনি ভারতবর্ষের নানাস্থান ভ্রমণ করিয়া ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে অক্টোবর আজমীর নগরে দেহত্যাগ করেন।

বহু স্থান পর্যটন ও বহু সাধুসন্ন্যাসীর সংস্রব-নিবন্ধন ইনি যোগসমাধির অনেক নূতন নূতন বিষয় জানিতে পারিয়াছিলেন এবং ঐ সকল বিষয়, কার্যে পরিণত করিবার

জন্য অধিকাংশ সময়ই যাপন করিতেন। ইনি যোগসম্বন্ধীয় কোন গ্রন্থে নাড়ীচক্রের বিষয় পাঠ করিয়াছিলেন। এক দিবস ইনি মোরাদাবাদ অঞ্চলে গঙ্গার তীরে পরিভ্রমণ করিতেছিলেন। এমন সময় একটি মনুষ্যের শবদেহ গঙ্গাবক্ষে ভাসিয়া যাইতেছে, দেখিতে পান। শবদেহ দেখিয়া, মনুষ্যের দেহমধ্যে প্রকৃতপক্ষে নাড়ীচক্র আছে কি না, তাহা জানিবার জন্য ইঁহার মন সাতিশয় আগ্রহান্বিত হইয়া উঠে। আপনার সংশয় দূর করিবার জন্য ইনি নদী গর্ভে ঝম্পপ্রদান করিয়া ঐ শবদেহকে তীরে লইয়া আসেন এবং ছুরিকা দ্বারা ঐ দেহ খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া গ্রন্থের লিখিতানুরূপ মিলাইতে থাকেন; কিন্তু গ্রন্থোল্লিখিত নাড়ীচক্রের কিছুমাত্র নিদর্শন না পাইয়া, সেই পুস্তকখানিকে খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া নদী-গর্ভে নিক্ষেপ করেন।

ইঁহার 'আর্যোদ্দেশ্য রত্নমালা' নামক একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ আছে। পাঠক-পাঠিকার অবগতির জন্য তাহার কিয়দংশের বঙ্গানুবাদ এই স্থানে প্রকাশ করিলাম।

—:০:—

আর্য্যোদ্দেশ্য রত্নমালার বঙ্গানুবাদ

১। ঈশ্বর—যাঁহার গুণকর্মস্বভাব এবং স্বরূপ, সত্যরূপেই বিরাজ করিতেছে, যিনি কেবল চেতনামাত্র বস্তু এবং অদ্বিতীয় সর্বশক্তিমান, নিরাকার, সর্বব্যাপক, অনাদি ও অনন্তাদি সত্য গুণযুক্ত, যিনি অবিনাশী, জ্ঞানী, আনন্দময়, ন্যায়কারী, দয়ালু এবং অজন্মাদি স্বভাবযুক্ত, জগতের উৎপত্তি, পালন ও বিনাশ করা এবং জীবগণকে নিজ নিজ পুণ্যপাপানুযায়ী যথাযোগ্য ফলপ্রদান করা যাঁহার কর্মরূপে অভিহিত হইয়া থাকে, তাঁহাকে ঈশ্বর বলে।

২। ধর্ম—যাঁহার স্বরূপ ঈশ্বরাজ্ঞা যথাবৎ পালন এবং পক্ষপাতরহিত, ন্যায় ও সকলের হিতকরণ, যাহা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণদ্বারা সুপরীক্ষিত এবং বেদোক্তহেতু, সকল মনুষ্যের একমাত্র মানিবার যোগ্য, তাহাকে ধর্ম বলে।

৩। অধর্ম—ঈশ্বরাজ্ঞা পরিত্যাগ করতঃ পক্ষপাত সহিত অন্যায়যুক্ত হইয়া পরীক্ষাবিহীন নিজ হিতকার্যসাধন যাহার স্বরূপ, যাহা অবিদ্যা, হঠ, অভিমান ও ক্রূরতাদি দোষযুক্তহেতু বেদবিদ্যা হইতে বিরুদ্ধ এবং যাহা সকল মনুষ্যেরই পরিত্যাজ্য, তাহাকে অধর্ম বলে।

৪। পুণ্য—বিদ্যাদি শুভগুণের দান এবং সত্যভাষণাদি ও সত্যাচারের অনুষ্ঠান যাহার স্বরূপ, তাহাকে পুণ্য বলে।

৫। পাপ—পুণ্যের বিপরীত এবং মিথ্যা-ভাষণাদি কার্যকে পাপ বলে।

৬। সত্যভাষণ—যাহা কিছু নিজ আত্মায় উদয় হয়, সদা অসম্ভবাদি দোষরহিত, সেই প্রকার ভাষণকে সত্যভাষণ কহে।

৭। মিথ্যাভাষণ—যাহা সত্যভাষণের বিপরীত অর্থাৎ সত্যকথনের বিরুদ্ধ, তাহাকে মিথ্যাভাষণ বলে।

৮। বিশ্বাস—যাহার মূল অর্থ এবং ফল নিশ্চিতরূপে সত্যাশ্রয়যুক্ত, তাহাকে বিশ্বাস বলে।

৯। অবিশ্বাস—যাহা বিশ্বাসের বিপরীত এবং তত্ত্ব ও অর্থ-বিহীন, তাহাকে অবিশ্বাস বলে।

১০। পরলোক—যাহাতে সত্যবিদ্যা দ্বারা পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়া উক্ত প্রাপ্তিদ্বারা এই জন্মে অথবা পুনর্জন্মে মুক্ত অবস্থায় পরমসুখ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাকে পরলোক বলে।

১১। অপরলোক—যাহা পরলোকের বিপরীত, যাহাতে দুঃখবিশেষ ভোগ হয়, তাহাকে অপরলোক বলে।

১২। জন্ম—যদ্দ্বারা জীব কোন প্রকার শরীরের সহিত সংযুক্ত হইয়া কর্ম করিতে সমর্থ হয়, তাহাকে জন্ম বলে।

১৩। মরণ—যে শরীর আশ্রয় করিয়া, জীব কর্ম করে, কোন এক সময়ে উক্ত শরীরের সহিত জীবের বিয়োগ হওয়াকে মরণ বলে।

১৪। স্বর্গ—জীবের বিশেষ সুখ এবং সুখসামগ্রী প্রাপ্তির নাম স্বর্গ।

১৫। নরক—জীবের বিশেষ দুঃখ এবং দুঃখসামগ্রী প্রাপ্তির নাম নরক।

১৬। বিদ্যা—ঈশ্বর হইতে পৃথিবী পর্যন্ত যাবতীয় পদার্থের যাহা দ্বারা সত্যবিজ্ঞান লাভ হইয়া যথাযোগ্য উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাকে বিদ্যা বলে।

১৭। অবিদ্যা—যাহা বিদ্যার বিপরীত এবং ভ্রম, অন্ধকার ও অজ্ঞানস্বরূপ, তাহাকে অবিদ্যা বলে।

১৮। সৎপুরুষ—সত্যপ্রিয়, ধর্মাত্মা, বিদ্বান্, সর্বহিতকারী ও মহাশয় মনুষ্যকে সৎপুরুষ বলে।

১৯। সৎসঙ্গ, কুসঙ্গ—যাহা দ্বারা মিথ্যা পরিত্যাগপূর্বক সত্যের প্রাপ্তি হয়, তাহাকে সৎসঙ্গ, ও যাহা দ্বারা জীব পাপকর্মে রত হয়, তাহাকে কুসঙ্গ বলে।

২০। তীর্থ—বিদ্যাভ্যাস, সুবিচার, ঈশ্বরোপাসনা, ধর্মানুষ্ঠান, সত্যাশ্রয়, ব্রহ্মচর্য, জিতেন্দ্রিয়তাদি যাবতীয় উত্তমকর্ম, যদ্দ্বারা জীব দুঃখসাগর হইতে উত্তীর্ণ হন, সেই সমস্ত কর্মকে তীর্থ বলে।

২১। স্তুতি—ঈশ্বরের অথবা অন্য কোন পদার্থের গুণজ্ঞান, কথন, শ্রবণ এবং সত্য-ভাষণকে স্তুতি বলে।

২২। স্তুতির ফল—গুণজ্ঞানাদির অনুষ্ঠানে উক্ত গুণযুক্ত পদার্থে যে প্রীতি হয়, তাহাই স্তুতির ফল।

২৩। নিন্দা—মিথ্যাজ্ঞান, মিথ্যাভাষণ এবং মিথ্যাবিষয়ে আগ্রহাদি কারণে গুণ পরিত্যাগ করিয়া তৎপরিবর্তে অবগুণের আরোপকে নিন্দা বলে।

২৪। প্রার্থনা—নিজ পূর্ণ পুরুষার্থের উপরান্ত উত্তম কার্যসিদ্ধির জন্য পরমেশ্বরের অথবা কোন সামর্থযুক্ত মনুষ্যের সহায়-গ্রহণকে প্রার্থনা বলে।

২৫। প্রার্থনার ফল—অভিমানের নাশ, আত্মীয় আর্দ্রতা, গুণগ্রহণ দ্বারা পুরুষার্থ এবং অত্যন্ত প্রীতি উৎপন্ন হওয়া, প্রার্থনার ফল।

২৬। উপাসনা—যদ্দ্বারা আনন্দস্বরূপ ঈশ্বরে নিজ আত্মাকে মগ্ন করা যায়, তাহাকে উপাসনা বলে।

২৭। নির্গুণোপাসনা—পরমাত্মাকে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, সংযোগবিয়োগ, লঘু, গুরু, অবিদ্যা, জন্ম, মরণ এবং দুঃখাদি গুণরহিত জানিয়া তাঁহার উপাসনা করাকে নির্গুণোপাসনা বলে।

২৮। সগুণোপাসনা—ঈশ্বরকে, সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান্ শুদ্ধ নিত্য আনন্দময় সর্ব-ব্যাপক এক সনাতন সর্বকর্তা সর্বাধার সর্বস্বামী সর্বনিয়ন্তা সর্বান্তর্যামী মঙ্গলময় সর্বানন্দপ্রদ সর্বপিতা সর্বজগৎসৃষ্টিকর্তা ন্যায়কারী দয়ালুত্বাদি সত্যগুণযুক্ত জানিয়া তাঁহার উপাসনা করাকে সগুণোপাসনা বলে।

২৯। মুক্তি—সমস্ত কুৎসিত কর্ম এবং জন্মমরণাদি দুঃখসাগর হইতে বিমুক্ত হইয়া, সুখস্বরূপ পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়া, কেবলমাত্র সুখে অবস্থান করার নাম মুক্তি।

৩০। মুক্তির সাধন—সমস্ত কুৎসিৎ কর্ম পরিত্যাগ পূর্বক পূর্বোক্ত প্রকারে পরমেশ্বরের স্তুতি, প্রার্থনা ও উপাসনা, ধর্মাচরণ, পুণ্যকার্যানুষ্ঠান, সৎপুরুষসঙ্গ এবং পরোপকারাদি যাবতীয় উত্তম কর্ম মুক্তির সাধন।

৩১। কর্তা—যিনি স্বতন্ত্রভাবে কর্ম করেন অর্থাৎ যাবতীয় সাধন যাঁহার অধীন, তাঁহাকে কর্তা বলে।

৩২। কারণ—যাহাকে গ্রহণ করিয়া কর্তা কোন কার্য অথবা পদার্থ নির্মাণ করিতে সমর্থ হন, অর্থাৎ যাহা ব্যতিরেকে কোন পদার্থ নির্মাণ হওয়া সম্ভব নহে, তাহাকেই কারণ বলে। উহা তিন প্রকার—উপাদান, নিমিত্ত ও সাধারণ।

৩৩। উপাদান কারণ—যেরূপ মৃত্তিকা হইতে ঘট প্রস্তুত করা যায়, সেই প্রকার যাহাকে গ্রহণ করিয়া কোন পদার্থ উৎপাদন অথবা নির্মাণ করা যায়, তাহাকে উপাদান কারণ বলে।

৩৪। নিমিত্ত কারণ—যেরূপ কুম্ভকার ঘটের নির্মাতা, সেইরূপ পদার্থের যে নির্মাতা, তাহাকে নিমিত্ত কারণ বলে।

৩৫। সাধারণ কারণ—যেরূপ ঘট-নির্মাণ-বিষয়ে, দণ্ডাদি, দিক্, আকাশ এবং আলোক সাধারণ কারণ, সেই প্রকার সাধারণ কারণের লক্ষণ জানিবে।

৩৬। কার্য—যাহা কোন পদার্থের সংযোগ-বিশেষ দ্বারা স্থূলরূপে পরিণত হইয়া ব্যবহার যোগ্য হয়, তাহাকে সেই কারণের কার্য বলে।

৩৭। সৃষ্টি—কর্তার রচনায় কারণ-দ্রব্য কোন সংযোগবিশেষ দ্বারা অনেক প্রকার কার্যরূপে হইয়া বর্তমান সময়ে ব্যবহারযোগ্য হইলে উহাকে সৃষ্টি বলে।

৩৮। জাতি—জন্ম হইতে মরণ পর্যন্ত যাহা বর্তমান থাকে এবং অনেক ব্যক্তিতে একরূপে বর্তমান, যাহা ঈশ্বরকৃত অর্থাৎ মনুষ্য, গো, অশ্ব এবং বৃক্ষাদিসমূহ জাতি-শব্দার্থে গৃহীত হয়।

৩৯। মনুষ্য—বিচার ব্যতিরেকে যিনি কোন কার্য না করেন, তাঁহাকে মনুষ্য বলে।

৪০। আর্য—শ্রেষ্ঠস্বভাব, ধর্মাত্মা, পরোপকারী, সত্যবিদ্যাদি গুণযুক্ত এবং সর্বসময়ে যিনি আর্যাবর্তদেশে বাস করেন, তাঁহাকে আর্য বলে।

৪১। আর্যাবর্তদেশ—হিমাচল, বিন্ধ্যাচল, সিন্ধুনদ এবং ব্রহ্মপুত্রনদ এই চারিটির মধ্যস্থিত এবং যে পর্যন্ত উক্ত চারিটি বিস্তার করিয়াছে। উহাদের মধ্যস্থিত দেশসকলের নাম আর্যাবর্ত।

৪২। দস্যু—অনার্য অর্থাৎ নীচ, আর্যস্বভাব ও নিবাস হইতে পৃথক, ডাকাইত, চোর, হিংস্রক ও দুষ্ট মনুষ্যকে দস্যু বলে।

৪৩। বর্ণ—গুণ ও কর্মের যোগে যাহা গ্রহণ করা যায়, তাহাকে বর্ণ বলে।

৪৪। বর্ণভেদ—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রাদিকে বর্ণভেদ বলে।

৪৫। আশ্রম—যাহাতে অত্যন্ত পরিশ্রম করিয়া উত্তম গুণের গ্রহণ এবং শ্রেষ্ঠকর্ম করা যায়, তাহাকে আশ্রম বলে।

৪৬। আশ্রমভেদ—সদ্বিদ্যাদি শুভগুণ গ্রহণ এবং জিতেন্দ্রিয়তা দ্বারা আত্মা এবং শরীরের বলবৃদ্ধির জন্য ব্রহ্মচর্যাশ্রম, সন্তানোৎপত্তি এবং বিদ্যাদি সমস্ত ব্যবহারসিদ্ধির জন্য গৃহাশ্রম, ঈশ্বরবিষয় বিচার জন্য বানপ্রস্থ এবং সর্বোপকার সিদ্ধির জন্য সন্ন্যাসাশ্রম, এই চারিটিকে আশ্রমভেদ বলে।

৪৭। যজ্ঞ—অগ্নিহোত্র হইতে অশ্বমেধ পর্যন্ত অথবা শিল্প-ব্যবহার এবং পদার্থ-বিজ্ঞান যাহা জগতের উপকার জন্য অনুষ্ঠান করা যায়, তাহাকে যজ্ঞ বলে।

৪৮। কর্ম—মন, ইন্দ্রিয় এবং শরীরে জীব যে চেষ্টা-বিশেষ করেন, তাহাকে কর্ম

বলে। তাহা শুভ, অশুভ এবং মিশ্রভেদে তিন প্রকার।

৪৯। ক্রিয়মাণ—যাহা বর্তমান সময়ে করা যায়, তাহাকে ক্রিয়মান বলে।

৫০। সঞ্চিত—ক্রিয়মাণ কর্মের সংস্কার যাহা জ্ঞানমধ্যে বর্তমান থাকে, তাহাকে সঞ্চিত সংস্কার বলে।

৫১। প্রারব্ধ—পূর্বকৃত কর্মের সুখদুঃখরূপ যে কিছু ফলভোগ করা যায়, তাহাকে প্রারব্ধ বলে।

৫২। অনাদি পদার্থ—ঈশ্বর, জীব এবং সর্বজগতের কারণ,* এই তিনটি স্বরূপতঃ অনাদি।

৫৩। প্রবাহরূপে অনাদি—কার্যজগৎ, জীবের কর্ম এবং উহাদের সংযোগ ও বিয়োগ, এই তিনটি পরস্পররূপে অনাদি।

৫৪। অনাদির স্বরূপ—যাহা কস্মিনকালে উৎপন্ন হয় নাই, কোন পদার্থ যাহার নহে, অর্থাৎ যাহা সদা স্বয়ং সিদ্ধ, তাহাকে অনাদি বলে।

৫৫। পুরুষার্থ—সর্বদা আলস্য পরিত্যাগপূর্বক মন, শরীর, বাণী এবং ধন দ্বারা উত্তম ব্যবহার-সিদ্ধির জন্য অত্যন্ত উদ্যোগ করার নাম পুরুষার্থ।

৫৬। পুরুষার্থের ভেদ—অপ্রাপ্ত বস্তুর ইচ্ছা, প্রাপ্ত বস্তুর উত্তম প্রকার রক্ষণ, রক্ষিত পদার্থের বৃদ্ধি করা, সত্যবিদ্যার উন্নতি এবং সকলের হিতকার্যে বর্ধিত পদার্থের ব্যয় করা, এই চারি প্রকার কর্মকে পুরুষার্থ বলে।

৫৭। পরোপকার—নিজের সমস্ত সামর্থ দ্বারা অন্য প্রাণীর সুখপ্রাপ্তির জন্য কায়মনবাক্য এবং ধন দ্বারা প্রযত্ন করার নাম পরোপকার।

৫৮। শিষ্টাচার—যাহা দ্বারা শুভ গুণের গ্রহণ ও অশুভ গুণের ত্যাগ হয়, তাহাকে শিষ্টাচার বলে।

৫৯। সদাচার—সৃষ্টি হইতে আজ পর্যন্ত সৎপুরুষদিগের যে বেদোক্ত আচার চলিয়া আসিতেছে, অসত্য পরিত্যাগপূর্বক কেবলমাত্র সত্য আচরণকেই সদাচার বলে।

৬০। বিদ্যাপুস্তক—ঈশ্বরোক্ত সনাতন সত্যবিদ্যাময় চারি বেদকে বিদ্যাপুস্তক বলে।

৬১। আচার্য—যিনি শ্রেষ্ঠ আচার গ্রহণ করাইয়া সমস্ত বিদ্যা অধ্যয়ন করান, তাঁহাকে আচার্য বলে।

৬২। গুরু—বীর্যদান হইতে ভোজনাদি প্রদানপূর্বক পালন করেন বলিয়া পিতাকে গুরু বলে, আর যিনি নিজ সত্যোপদেশ দ্বারা হৃদয়ের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার নাশ করেন, তাঁহাকে গুরু অর্থাৎ আচার্য বলে।

৬৩। অতিথি—যাঁহার গমনাগমনের কোন নিশ্চিত তিথি নাই, যিনি বিদ্বান্, সর্বত্র ভ্রমণকারী, যিনি প্রশ্নোত্তররূপ উপদেশ দ্বারা সকল মনুষ্যের উপকার করেন, তাঁহাকে অতিথি বলে।

৬৪। পঞ্চায়তন পূজা—জীবিত মাতাপিতা, আচার্য, অতিথি ও ঈশ্বরের যথাযোগ্য সৎকারপূর্বক তাঁহাদের প্রসন্নতা সম্পাদন করাকে পঞ্চায়তন পূজা বলে।

* উপাদান কারণ—ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম।

৬৫। পূজা—যিনি জ্ঞানাদি গুণযুক্ত, তাঁহার যথাযোগ্য সৎকার করাকে পূজা বলে।

৬৬। অপূজা—সৎকারের অযোগ্য জ্ঞানাদিরহিত জড়পদার্থের সৎকার করাকে অপূজা বলে।

৬৭। জড়—জ্ঞানাদি গুণরহিত বস্তুকে জড় বলে।

৬৮। চেতন—জ্ঞানাদি গুণযুক্ত পদার্থকে চেতন বলে।

৬৯। ভাবনা—যে পদার্থ যে প্রকার, তাহা বিচারপূর্বক সেই প্রকার নিশ্চয় করা, যাহার বিষয় ভ্রমরহিত অর্থাৎ যে বস্তু যে প্রকার, সেই প্রকার নিশ্চয় করার নাম ভাবনা।

৭০। অভাবনা—যাহা ভাবনার বিপরীত অর্থাৎ জড়ে চেতন এবং চেতনে জড় নিশ্চয় করার ন্যায় মিথ্যা জ্ঞান দ্বারা কোনও এক বস্তুকে তাহার বিপরীত বস্তু নিশ্চিতরূপে স্বীকার করার নাম অভাবনা।

৭১। পণ্ডিত—বিবেক দ্বারা সদসৎজ্ঞাতা, ধর্মাত্মা, সত্যবাদী, সত্যপ্রিয়, বিদ্বান্ এবং সর্বহিতকারী ব্যক্তিকে পণ্ডিত বলে।

৭২। মূর্খ—অজ্ঞান, হঠ, দুরাগ্রহাদিদোষযুক্ত ব্যক্তিকে মূর্খ বলে।

৭৩। জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠ ব্যবহার—জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠের মধ্যে পরস্পর যথাযোগ্য মান্য করার নাম, জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠ ব্যবহার।

৭৪। সর্বহিত—শরীর, মন, বাক্য এবং ধন দ্বারা সকলের সুখবৃদ্ধির জন্য উদ্যোগ করাকে সর্বহিত কহে।

৭৫। চোরিত্যাগ—স্বামীর আজ্ঞা বিনা তদীয় পদার্থ গ্রহণের নাম চুরি এবং উহা ত্যাগ করাকে চোরিত্যাগ বলে।

৭৬। ব্যভিচার ত্যাগ—নিজ স্ত্রী ব্যতিরেকে অন্য স্ত্রীর সহিত সহবাস করা, ঋতু-কাল ব্যতিরেকে নিজ পত্নীকে বীর্যদান করা এবং স্বীয় স্ত্রীর সহিত বীর্যের অত্যন্ত নাশ করা, যুবাবস্থা ব্যতিরেককে বিবাহ করা, এই সমস্ত কর্মকে ব্যভিচার বলে। উহাদিগকে পরিত্যাগ করার নাম ব্যভিচার-ত্যাগ।

৭৭। জীবের স্বরূপ—যাহা চেতন, অল্পজ্ঞ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, সুখ, দুঃখ এবং জ্ঞান-গুণযুক্ত ও নিত্য, তাহাকে জীব বলে।

৭৮। স্বভাব—যে বস্তুর স্বাভাবিক গুণ যে প্রকার, যেরূপ অগ্নিতে রূপ এবং দাহ-গুণ, অর্থাৎ যাবৎ যে বস্তু থাকে, তাবৎ উহার ঐ গুণ অপগত হয় না, এই কারণে ইহাকে স্বভাব বলে।

৭৯। প্রলয়—কার্যজগৎ কারণ-রূপে পরিণত হওয়া অর্থাৎ জগতের সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর যে যে কারণ হইতে সৃষ্টি করিয়া অনেক কার্য রচনাপূর্বক যথাবৎ পালন করতঃ পুনরায় সেই সেই কারণে পরিণত করেন, উক্ত কারণরূপ পরিণামকে প্রলয় বলে।

৮০। মায়াবী—ছল, কপট ও স্বার্থ দ্বারা প্রসন্নতা এবং দম্ভ, অহঙ্কার, শঠতাদি দোষ সকলকে মায়া বলে, উক্ত দোষযুক্ত মনুষ্যকে মায়াবী বলে।

৮১। আপ্ত—যিনি ছলাদি দোষরহিত, ধর্মাত্মা, বিদ্বান্, সত্যোপদেষ্টা এবং সর্বোপরি কৃপাদৃষ্টিযুক্ত হইয়া অবিদ্যান্ধকার নাশ করতঃ অজ্ঞানী লোকের আত্মায় সদা বিদ্যারূপ সূর্য প্রকাশ করেন, তাঁহাকে আপ্ত বলে।

৮২। পরীক্ষা—প্রত্যক্ষাদি আটটি প্রমাণ, যদ্দারা বেদবিদ্যা, আত্মশুদ্ধি এবং সৃষ্টি-

ক্রমের অনুকূল বিচারে সত্যাসত্য যথার্থরূপে নির্ণয় করা যায়, তাহাকে পরীক্ষা বলে।

৮৩। অষ্টপ্রমাণ—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ, ঐতিহ্য, অর্থাপত্তি, সম্ভব এবং অভাব, এই আটটিকে প্রমাণ বলে। মনুষ্য উক্ত আট প্রকার প্রমাণ দ্বারাই সত্যাসত্য যথাবৎ নিশ্চয়করণে সমর্থ হন।

৮৪। লক্ষণ—যেরূপ রূপ দ্বারা অগ্নির জ্ঞান হয়, সেইরূপ রূপ, যদ্দ্বারা জানা যায় অর্থাৎ যাহা বস্তুর স্বাভাবিক গুণ, তাহাকে লক্ষণ বলে।

৮৫। প্রমেয়—যেরূপ চক্ষুরিন্দ্রিয় দ্বারা যাহা প্রতীত হয়, তাহাকে চক্ষুর প্রমেয় রূপ অর্থ বলে, সেইরূপ প্রমাণ দ্বারা যাহা জানা যায়, তাহাকে প্রমেয় বলে।

৮৬। প্রত্যক্ষ—প্রসিদ্ধ শব্দাদি পদার্থের সহিত শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় এবং মনের সন্নিকর্ষ দ্বারা যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাকে প্রত্যক্ষ বলে।

৮৭। অনুমান—কোন পূর্বদৃষ্ট পদার্থের একটি অঙ্গ প্রত্যক্ষ করিয়া পশ্চাৎ উহার অদৃষ্টাঙ্গের যাহা দ্বারা যথাবৎ জ্ঞান হয়, তাহাকে অনুমান বলে।

৮৮। উপমান—যেরূপ কোন ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে বলিল, গাভী সদৃশ নীলগাভী, অর্থাৎ সাদৃশ্য উপমা দ্বারা যে জ্ঞান হয়, তাহার নাম উপমান।

৮৯। শব্দ—পূর্ণ আপ্ত পরমেশ্বরের এবং পূর্বোক্ত আপ্ত মনুষ্যের যে উপদেশ, তাহার নাম শব্দ-প্রমাণ।

৯০। ঐতিহ্য—যাহা শব্দ-প্রমাণের অনুকূল, অসম্ভব এবং মিথ্যা লেখকবিহীন, তাহাকে ঐতিহাস বা ঐতিহ্য প্রমাণ বলে।

৯১। অর্থাপত্তি—দ্বিতীয় বাক্যের কথন ব্যতিরেকেও একটি বাক্যের কথনেই যাহা জানা যায়, তাহাকে অর্থাপত্তি বলে।

৯২। সম্ভব—যে বাক্য প্রমাণ, যুক্তি এবং সৃষ্টিক্রমযুক্ত, তাহাকে সম্ভব বলে।

৯৩। অভাব—যেরূপ কোন ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে বলিল, যে তুমি জল আনয়ন কর ; সেই ব্যক্তি দেখিল, সেখানে জল নাই, পরন্তু যেখানে জল আছে, সেই স্থান হইতে জল আনয়ন করা উচিত, উক্ত অভাব নিমিত্ত যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাকে অভাব প্রমাণ বলে।

৯৪। শাস্ত্র—যাহা সত্যবিদ্যা প্রতিপাদনযুক্ত এবং যাহা দ্বারা মনুষ্যের সত্যাসত্য শিক্ষালাভ হয়, তাহাকে শাস্ত্র বলে।

৯৫। বেদ—ঈশ্বরোক্ত সত্যবিদ্যাযুক্ত ঋক্-সংহিতাদি* চারিপুস্তক, যদ্দ্বারা মনুষ্যের সত্য জ্ঞানলাভ হয়, তাহাকে বেদ বলে।

৯৬। পুরাণ—যে সমস্ত প্রাচীন এবং ঋষিমুনিকৃত সত্যার্থযুক্ত ঐতরেয় শতপথ ব্রাহ্মণাদি পুস্তক, তাহাদিগকে পুরাণ, ইতিহাস, কল্প-গাথা এবং নরাশংসী বলে।

৯৭। উপবেদ—আয়ুর্বেদ অর্থাৎ গীতশাস্ত্র, ধনুর্বেদ অর্থাৎ শস্ত্রাস্ত্রবিদ্যা, যাহা রাজধর্ম, গান্ধর্ববেদ অর্থাৎ গীতশাস্ত্র এবং অর্থবেদ অর্থাৎ শিল্পশাস্ত্র, এই চারিটিকে উপবেদ বলে।

৯৮। বেদাঙ্গ—শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ প্রভৃতি আর্য-সনাতন শাস্ত্রকে বেদাঙ্গ বলে।

৯৯। উপাঙ্গ—ঋষিমুনিকৃত মীমাংসা, বৈশেষিক, ন্যায়, যোগ, সাংখ্য এবং বেদান্ত, এই ছয়টি শাস্ত্রকে উপাঙ্গ বলে।

১০০। নমস্তে—আমি আপনার মান্য করিতেছি।

---

* ঋগ্বেদসংহিতা, যজুর্বেদসংহিতা, সামবেদসংহিতা এবং অথর্ববেদসংহিতা।

সাধু তুকারাম

বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্গত পুনা নগরীর ৯ ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে দেহু নামক গ্রামে ১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দে সাধু তুকারাম জন্মগ্রহণ করেন। তুকারামের পিতার নাম বহ্লোজী। ইনি 'মোরে' উপাধিধারী শূদ্র ছিলেন; ব্যবসায়-বাণিজ্যের দ্বারা জীবিকানির্বাহ করিতেন। তুকারামের জননীর নাম কনকবাঈ। কনকবাঈ অতিশয় পতিপরায়ণা ছিলেন। অধিক বয়স পর্যন্ত পুত্রলাভে বঞ্চিত থাকায় স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই সর্বদা মনঃকষ্টে থাকিতেন। তাঁহারা কুলদেবতা বিঠোবার নিকট পুত্রলাভের জন্য সর্বদা প্রার্থনা করিতেন। ঈশ্বরানুগ্রহে কনকবাঈ গর্ভবতী হইয়া ক্রমে ক্রমে তিন পুত্র ও এক কন্যা প্রসব করেন। জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম শান্তজী, মধ্যম পুত্রের নাম তুকারাম এবং কনিষ্ঠ পুত্রের নাম কানাইয়া। বহ্লোজী ব্যবসায়-বাণিজ্যের দ্বারা যথেষ্ট পরিমাণে অর্থ উপার্জন করিতেন। স্বচ্ছলরূপে সাংসারিক ব্যয় নির্বাহ করিয়া যাহা কিছু অর্থ উদ্বৃত্ত থাকিত, তাহা হইতে তিনি কিছু সঞ্চয় করিতেন এবং অবশিষ্টাংশ ধর্মকর্মে ব্যয় করিতেন।

বহ্লোজী বার্ধক্যে উপনীত হইলে, তাঁহার বিষয়লালসা হ্রাস হইয়া আসে। এই কারণ বশতঃ তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শান্তজীকে সংসারের সকলভার গ্রহণ করিতে বলেন; কিন্তু শান্তজী পূর্ব হইতেই নির্লিপ্তভাবে সংসার-ধর্ম করিতেন; সুতরাং তিনি পিতার প্রস্তাবিত বিষয়ের ভার গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন। ঐ সময়ে তুকারামের বয়স ত্রয়োদশ বৎসর মাত্র হইয়াছিল। জ্যেষ্ঠ বিষয়ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট থাকিতে অসম্মতি প্রকাশ করিলে, তুকারাম পিতার মনস্তুষ্টির জন্য সংসারের সকল ভার গ্রহণ করেন। এত অল্প বয়সে সংসারের ভার গ্রহণ করিয়াও, তিনি তাহা বহন করিতে অকৃতকার্য হন নাই। ব্যবসায়ে তাঁহার বিশেষ প্রতিষ্ঠা জন্মিয়াছিল, এবং অল্প দিবসের মধ্যেই তিনি ধনাঢ্য ব্যবসায়ীদিগের বিশ্বাসভাজন হইয়াছিলেন। অর্থোপার্জনও যথেষ্ট করিতেন।

তুকারামের দুই বিবাহ; প্রথমা স্ত্রীর নাম রুক্মী বাঈ ও দ্বিতীয়া স্ত্রীর নাম জীজা বাঈ। সংসার-মধ্যে মাতা, পিতা, পত্নী, সুহৃদ, আত্মীয়, ধন, সম্ভ্রম, স্বাস্থ্য কোন বিষয়েই তুকারামের কোন অভাব ছিল না; কিন্তু তাঁহার ঐরূপ সাংসারিক সুখের অবস্থা অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই। তাঁহার সংসার-সমুদ্রে এতদিন সৌভাগ্যের যে জোয়ার চলিতেছিল, ক্রমে তাহাতে ভাঁটা পড়িতে আরম্ভ হইয়াছিল। তাঁহার সপ্তদশ বর্ষ বয়সের সময় প্রথমে তাঁহার পিতা, তাহার পর তাঁহার জননী পরলোক গমন করেন। মাতাপিতার মৃত্যুজনিত শোকের ক্ষত পূর্ণ হইতে না হইতেই তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃজায়া কালের করালগ্রাসে পতিতা হন। এই সময়ে তুকারামের বয়স আঠার বৎসর মাত্র হইয়াছিল। শৈশবকাল হইতেই তুকারাম ঈশ্বরপরায়ণ ও সাধুভক্ত ছিলেন। মাতাপিতার স্নেহে ও বিষয়ানুরক্তিতে তাঁহার সেই ভক্তি আধ্যাত্মিক উন্নতিপথে অগ্রসর হইতে পারে নাই; কিন্তু মাতা, পিতা ও ভ্রাতৃজায়ার মৃত্যু

দেখিয়া তাঁহার সেই বিষয়াসক্ত চিত্ত ভক্তিমার্গে আকৃষ্ট হইয়াছিল। যখনই তিনি সংসার-সাগরের ঘূর্ণিপাকে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেন, তখনই তিনি তাহা হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য বিঠোবাদেবের* মন্দিরে গমন করিয়া আপন মনের জ্বালা নিবারণ করিতেন ও তাঁহার সেবা করিয়া দিনযাপন করিতেন।

এইরূপে কিছুদিন অতীত হইলে, তাঁহার মনে ধর্ম-সংক্রান্ত ও ভক্তিরসাত্মক পুস্তকসকল পাঠ করিবার ইচ্ছা জন্মে। তিনি যেরূপ লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন, তাহাতে ধর্মপুস্তক ও বিবিধ শাস্ত্র পাঠ করিয়া তাহার মর্ম অবগত হওয়া অতি দুরূহ; সুতরাং বিদ্যাশিক্ষার জন্য পুনরায় প্রবৃত্ত হন। ভক্তিরসাত্মক পুস্তকসকল পাঠ করিয়া তাঁহার ভক্তি দিন দিন যেরূপ বর্ধিত হইতে লাগিল, ব্যাবসায়-বাণিজ্যের প্রতি তাঁহার অনুরাগও সেই পরিমাণে হ্রাস পাইতে লাগিল। কর্মক্ষেত্রে প্রভুকে অমনোযোগী করিয়া কর্মচারিগণ নির্বিঘ্নে ব্যবসায়ের লভ্যাংশ, অবশেষে মূলধন পর্যন্ত আত্মসাৎ করিতে আরম্ভ করিল। অন্যান্য ব্যবসায়িগণ তুকারামের ব্যবসায় নষ্ট হইতেছে বুঝিতে পারিয়া, তাঁহাব সহিত আদানপ্রদান বন্ধ করিয়া দিল। এই ঘটনায় তুকারাম ক্রমে ঋণজালে জড়িত হইতে লাগিলেন। তাঁহার সংসারে অত্যন্ত অন্নকষ্ট উপস্থিত হইল। এই দুঃসময়ে রুক্মীবাঈও মানবলীলা সংবরণ করিলেন। রুক্মীবাঈ-এর দেহান্ত হইলে, তুকারাম তাঁহার গাত্রালঙ্কারগুলি বিক্রয় করিয়া কিছু অর্থ সংগ্রহ করিলেন। তিনি ঐ অর্থে কিছু চাউল, ডাইল ও বেণেতি মসলা ক্রয় করিয়া, নিজ গ্রাম হইতে কিছু দূরে, বাজারের সন্নিকটে অল্পপরিসর স্থান লইয়া একখানি দোকান খুলিলেন। ক্রেতারা অল্প মূল্যে আপন আপন ইচ্ছামত দ্রব্য গ্রহণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু এ বিষয়ে তিনি কোন কথাই বলিতেন না। এইরূপ করায় অল্প দিবসের মধ্যেই তাঁহার সমস্ত মূলধন নষ্ট হইয়া গেল। তুকারামের অন্তঃকরণ দয়া ও ধর্মে পরিপূর্ণ ছিল, সুতরাং তাঁহার পক্ষে ব্যবসায় করা কঠিন হইয়া উঠিল। দীনদরিদ্র ও অসাধু ক্রেতাগণ তাঁহার নিকটে আসিয়া দুঃখ জানাইলে, তিনি লাভালাভ ও আদায় অনাদায়ের বিচার না করিয়া, তখনই তাহাদের প্রার্থিত দ্রব্যসামগ্রী তাহাদিগকে লইয়া যাইতে বলিতেন। মহীপতী** বলেন, 'তুকারাম দোকানে বসিয়া অবিরত হরিনাম কীর্তন করিতেন। কোন ক্রেতা আসিলে, তুকারাম ভাবিতেন, যদি ইহার মূল্যের

* দাক্ষিণাত্যে শ্রীকৃষ্ণ বিঠোবা বা বিঠ্ঠল নামে অভিহিত। কথিত আছে, তুকারামের পূর্বপুরুষ বিশ্বম্ভর, প্রতি একাদশী তিথিতে পণ্ডরপুর গমন করিয়া বিঠোবাদেবকে দর্শন করিয়া আসিতেন; পণ্ডরপুর দেহুগ্রাম হইতে প্রায় পঞ্চাশ ক্রোশ দূরে ভীমানদীর তীরে অবস্থিত। তিনি একজন পরম ভক্ত ছিলেন। এক দিবস তিনি স্বপ্ন দেখেন যে, বিঠোবা ও রুক্মিণীর মূর্তি তাঁহার বাসস্থানের অনতিদূরে প্রোথিত আছে। তিনি স্বপ্ন-দৃষ্ট ঐ মূর্তিদ্বয়কে উঠাইয়া, ইন্দ্রায়ণী নদীর তীরে একটি মন্দির নির্মাণ করাইয়া তাহাতে স্থাপিত করেন।

** মহীপতি খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। 'ভক্তলীলামৃত' 'ভক্তবিজয়' ও 'সন্তবিজয়' নামক তিনখানি কবিতা-গ্রন্থ তাঁহার রচিত। উহাতে তুকারামের জীবনচরিত লিখিত আছে।

উপযুক্ত দ্রব্য দিতে কিছু কম হয়, তবে আমার অধর্ম হইবে ; অতএব গ্রাহক যেরূপ চায়, সেইরূপ দেওয়া উচিত।'

জীজা বাঈ স্বামীর এইরূপ ব্যবহারে বিশেষ চিন্তিত হইলেন এবং সংসারধর্ম প্রতিপালন করিয়া ধর্মকর্মে মন দিবার উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। এক দিবস জীজা বাঈ স্বামীকে কাছে বসাইয়া বলিতে লাগিলেন, 'স্বামীন্! তুমি বিঠোবার চরণে মনঃপ্রাণ সমর্পণ করিয়াছ, ইহাতে বিশেষ ক্ষতি হয় নাই, কিন্তু তুমি যে ঠক ও জুয়াচোরদিগের প্রতি দয়া করিয়া গৃহে অলক্ষ্মী প্রবেশ করাইতেছ, ইহাতেই আমাদের সর্বনাশ হইতেছে। যাহাদিগের উপার্জনের ক্ষমতা আছে, তাহাদিগকে দয়া করিয়া কি লাভ ? তোমার নিজের এক কপর্দকও সংস্থান নাই অথচ তুমি পরের দ্রব্য লইয়া অপরকে দয়া করিতেছ। আমি কাচ্চা-বাচ্চা লইয়া অনাহারে দিনযাপন করিতেছি, ঋণের জ্বালায় লোকের নিকট মুখ দেখাইতে পারিতেছি না ; কই, তুমি সে দিকে ত লক্ষ্য করিতেছ না, আমাদিগের প্রতি ত দয়া করিতেছ না ? যাহা হউক, আমি সর্বস্বান্ত হইয়া এবং ঋণ করিয়া তোমায় অর্থের যোগাড় করিয়া দিতেছি, তুমি তাহা লইয়া পুনরায় ব্যবসা কর, দেখিও, যেন যাহার তাহার প্রতি দয়া করিয়া অর্থ নষ্ট করিও না। আমাদের মঙ্গলের জন্যই এই সকল কথা বলিতেছি।

স্ত্রীর উপদেশবাক্য শুনিয়া এবং তাঁহার প্রদত্ত অর্থ লইয়া তুকারাম গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। ঐ সময়ে তুকারামের গ্রামস্থ বণিকগণ ব্যবসায়ার্থ বালেঘাট নামক স্থানে গমন করিতেছিল। তুকারাম তাহাদিগের অনুযাত্রী হইলেন এবং ক্রয়-বিক্রয় শেষ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতে লাগিলেন। এইবার তুকারাম কিছু লাভ করিয়াছিলেন ; কিন্তু তাহা গৃহে আনিতে পারেন নাই। তিনি গৃহে প্রত্যাগমন সময়ে দেখিতে পাইলেন যে, একজন ব্রাহ্মণ ঋণজালে জড়িত হইয়া উত্তমর্ণদিগের হস্তে লাঞ্ছিত ও প্রহৃত হইতেছে। তাহার কাতর ক্রন্দনে তুকারামের হৃদয় বিগলিত হইয়া গেল। তিনি সেই স্থানে উপস্থিত হইলে, ব্রাহ্মণ তাঁহার নিকট আপনার দুরবস্থার বিষয় জ্ঞাপন করিলেন। তুকারাম আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, তিনি আপনার অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া ব্যবসায়লব্ধ সমস্ত অর্থ ব্রাহ্মণকে দান করিলেন। ব্রাহ্মণ ঋণ হইতে মুক্ত হইয়া গৃহে গমন করিলেন এবং তুকারাম রিক্ত হস্তে বাটীতে আসিলেন। তুকারাম বাটীতে প্রবেশ করিবার পূর্বেই এই সংবাদ জীজা বাঈ-এর কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়াছিল। তিনি স্বামীকে নিঃসম্বল অবস্থায় ফিরিতে দেখিয়া অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইলেন। একে দারিদ্র্যের নিপীড়নে তিনি রুক্ষস্বভাবা হইয়াছিলেন, তাহাতে আবার স্বামীর এরূপ ব্যবহার, সুতরাং তিনি অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়া তাঁহাকে অজস্র গালি দিতে লাগিলেন। জীজা বাঈ-এর চীৎকারে প্রতিবেশিনীগণ আসিয়া উপস্থিত হইলে, তিনি তুকারামকে দেখাইয়া বলিতে লাগিলেন, 'আমার বোধ হয়, এই মূর্খ পূর্বজন্মে আমার শত্রু ছিল। এই জন্মে আমাকে যন্ত্রণা দিবার জন্য আমার স্বামী হইয়া আসিয়াছে। সংসার-নির্বাহ জন্য আমি এখন কি উপায় অবলম্বন করি ? সন্তানগণ ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হইয়া কাতরক্রন্দনে যখন আমার নিকট খাবার চাহিবে, তখন আমি উহাদিগকে কি দিয়া সান্ত্বনা করিব ? আমার এখন মৃত্যুই শ্রেয়ঃ, আমি আর কত জ্বালা সহ্য করিব ? বিঠল্! তোমাকেও ধিক।' প্রতিবেশিনীদিগের মধ্যে একজন জীজা বাঈকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'ভাই! তোমার স্বামী মূর্খ

বলিয়া কি তুমিও জ্ঞানহীনা হইবে? পতিভক্তি না করিয়া পতির প্রতি কটূক্তি প্রয়োগ করিবে?' জীজা বাঈ প্রতিবেশিনীর কথার প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, 'দিদি! যে যাহাকে লইয়া ঘর করে, সেই তাহার মর্ম অবগত থাকে।'

তুকারামের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া তাঁহার ভ্রাতা কানাইয়া বিষয়াদি ভাগ করিয়া লন। ঐ সময়ে ইঁনি কিছু টাকার খৎ পাইয়াছিলেন। তুকারাম জোরজবরদস্তি করিয়া অধমর্ণদিগের নিকট হইতে অনেক টাকা আদায় করিতে পারিতেন, কিন্তু লোকের সহিত বিবাদ করা ভাল নয়, এই ভাবিয়া, তিনি ঐ সকল খৎ জলে ফেলিয়া দেন। জীজা বাঈ যখন জানিতে পারিলেন যে, তাঁহার স্বামী বিবাদের ভয়ে খৎসকল জলে ফেলিয়া দিয়াছেন, তখন তিনি অতিশয় ক্রোধান্বিতা হইয়া স্বামীকে যথোচিত তিরস্কার করিলেন। তুকারাম স্ত্রীর তীব্র ভৎর্সনা খাইয়া, কোমলমতি বালকের ন্যায় একটু হাসিয়া তাহা উড়াইয়া দেন। পরে স্ত্রীকে কোন কথা না বলিয়া বাটী হইতে আলন্দি নামক স্থানে গমন করেন। আলন্দি দেহু হইতে প্রায় এক ক্রোশ দূরে, ইন্দ্রায়ণী নদীর তীরে অবস্থিত। জ্ঞানদেব নামক একজন সাধু ৬০০ শত বৎসর পূর্বে এই স্থানে থাকিতেন। তাঁহার সমাধিও ঐ স্থানে হইয়াছিল। জ্ঞানদেবের সাধনাস্থান তুকারামের পক্ষে অতি মনোহর বোধ হইয়াছিল। যে সময়ে তিনি তথায় বিচরণ করিতেছিলেন, সেই সময়ে কোন কৃষক, একজন ক্ষেত্র-রক্ষকের অনুসন্ধান করিতেছিল। চাষা তুকারামকে দেখিয়া তাঁহার কাছে ঐ কথা উত্থাপন করে। তুকারাম বুঝিয়াছিলেন যে, বিনা মূলধনে যাহা পাইবে, তাহাই লাভ; এই ভাবিয়া তিনি চাষার কথায় সম্মত হইলেন। চাষা তুকারামের পারিশ্রমিকস্বরূপ অর্দ্ধমণ শস্য দিতে প্রতিশ্রুত হইল। তুকারাম ক্ষেত্র-রক্ষকের কার্যে নিযুক্ত হইয়া মাঠের মধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তিনি নির্জন স্থান পাইয়া সর্বদাই মনের আনন্দে বিঠোবার নামগানে সময় অতিবাহিত করিতেন। এদিকে ক্ষেত্রমধ্যে নানাবিধ পাখীর ঝাঁক এবং গরু-বাছুরের দল আসিয়া নির্বিঘ্নে শস্যসকল আহার করিয়া যাইত। এক দিবস ক্ষেত্রস্বামী এই ব্যাপার দর্শন করিয়া তুকারামকে যথোচিত তিরস্কার করে। ক্ষেত্র-স্বামীর তিরস্কার শুনিয়া তুকারাম বলিয়াছিলেন, 'ঐ সকল ক্ষুধাতুর জীবদিগকে নিষ্ঠুরের মত কেমন করিয়া তাড়াইয়া দিব।?' ক্ষেত্রস্বামী তুকারামের প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া ক্ষতিপূরণ করিবার জন্য স্থানীয় পঞ্চায়েতের নিকট সমস্ত বিষয় জ্ঞাপন করে। পঞ্চায়েত এইরূপে বিচার নিষ্পত্তি করেন যে, ক্ষেত্রে এ যাবৎকাল যে পরিমাণে শস্য উৎপন্ন হইয়াছে, সেই পরিমাণ শস্য হইতে যাহা কম হইবে, তুকারামকে সেই পরিমাণ শস্যের মূল্য দিতে হইবে। পঞ্চায়েতের বিচারের পর ক্ষেত্র হইতে সমস্ত শস্য সংগৃহীত হইলে, ক্ষেত্রস্বামী দেখিল যে, পূর্ববৎসরাপেক্ষা এ বৎসর অধিক শস্য জন্মিয়াছে, কিন্তু চাষা এ বিষয় আর কাহারও কাছে প্রকাশ করিল না। তুকারামের কোন প্রতিবেশী ইহা জানিতে পারিয়া পঞ্চায়েতের গোচর করে। পঞ্চায়েৎ পুনরায় বিচার করিয়া ক্ষেত্রস্বামীকে নির্দিষ্ট পরিমাণ শস্য দিয়া অবশিষ্ট তুকারামকে প্রদান করেন। তুকারাম প্রচুর পরিমাণে শস্য পাইয়া মনের আনন্দে গৃহে আসেন এবং সেই শস্যের বিক্রয়লব্ধ আয় হইতে তাঁহার কয়েকটি কন্যার বিবাহ দেন।

তুকারামের তিনটি কন্যা এবং দুইটি পুত্র ছিল। কন্যা তিনটির নাম—গঙ্গা, ভাগীরথী ও কাশী এবং পুত্র দুইটির নাম—শম্ভুজী ও বিঠোবা। প্রথমা কন্যাটি

বিবাহযোগ্যা দেখিয়া জীজা বাঈ তাহার বিবাহের জন্য তুকারামকে অত্যন্ত ব্যস্ত করিতেন। তুকারাম জবালাতন হইয়া একদিন শুভক্ষণে পাত্র-অনুসন্ধানে বহির্গত হন। তিনি নিকটস্থ একটি গ্রামে গিয়া দেখিলেন যে, কতকগুলি বালক খেলা করিতেছে। তিনি উহাদিগের মধ্যে স্বজাতীয় তিনটি বালককে বাছিয়া আপনার বাটীতে লইয়া আসেন এবং বিবাহের লগ্নানুসারে ঐ তিনটি বালকের সহিত আপনার তিন কন্যার বিবাহ দেন। গ্রামের ব্যক্তিগণ তুকারামের স্বভাব জানিতেন, সুতরাং তাঁহারা এই বিষয়ের জন্য কোনো-রূপ গোলমাল করেন নাই।

একদিন তুকারাম ক্ষেত্র হইতে একটি আখের বোঝা আনিতেছিলেন, পথিমধ্যে কতকগগুলি বালক তুকারামকে আখের বোঝা আনিতে দেখিয়া, কাতরভাবে একগাছি আখ প্রার্থনা করে। তুকারাম কোমলমতি বালকদিগের ঈদৃশ প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিতে পারেন নাই। পথিমধ্যে যে কয়েকজন বালক ছিল, তিনি আখের বোঝাটি তাহাদের সকলকেই বিতরণ করিয়া, কেবল একগাছি মাত্র আখ বাটীতে লইয়া আসেন। জীজা বাঈ ইহা জানিতে পারিয়া, ক্রোধে অধীরা হইয়া সেই ইক্ষুদণ্ড তুকারামের পৃষ্ঠে দুই খণ্ড করেন। স্ত্রীর প্রহার সহ্য করিয়া তুকারাম হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিলেন, 'সহধর্মিণি! ইহাই ত প্রকৃত ধর্ম। আমি তোমাকে একগাছি আখ খাইতে দিলাম, তুমি তাহা দ্বিখণ্ড করিয়া একখণ্ড আমায় প্রদান করিলে।' তুকারাম স্ত্রীর এইরূপ কত দুর্বাক্য—কত প্রহার অম্লানবদনে সহ্য করিয়াছিলেন।

রুক্মী বাঈ-এর মৃত্যুর কিছুকাল পরে তুকারামের জ্যেষ্ঠ পুত্র শম্ভুজীর জীবনান্ত হয়। তুকারাম শম্ভুজীকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। তাহার অকাল-মৃত্যুতে তুকারাম হৃদয়ে নিদারুণ বেদনা প্রাপ্ত হন। এই সময়ে তুকারামের জ্ঞানের সঞ্চার হয়। তিনি এই বলিয়া ভাবিতে লাগিলেন যে, 'সংসারে সুখ নাই। সংসারে থাকিয়া সুখভোগ করিব, এই আশায় আমি কত চেষ্টা করিলাম, কিন্তু সকলই ব্যর্থ হইল। অঙ্গার ঘর্ষণ করিলে যেমন তাহার অভ্যন্তরে কেবল গাঢ়তর কালিমাই লক্ষিত হয়, সংসারমধ্যেও সেইরূপ যত প্রবেশ করা যায়, ততই দুঃখের মাত্রা বর্ধিত হয়। ধন, রত্ন প্রভৃতি সংসারের সকল বস্তুই অসার, তবে আমি কেন এই সংসারের মধ্যে পড়িয়া থাকি?' এইরূপ চিন্তা করিয়া তুকারাম সংসার পরিত্যাগ করেন।

তুকারাম বাটী পরিত্যাগ করিয়া, ভাম্বনাথ নামক পর্বতে গমন করেন। সেই স্থানে তিনি স্বীয় আরাধ্য-দেবতা বিঠোবার চরণে প্রাণ-মন সমর্পণ করিয়া ধ্যান করিতে থাকেন। তুকারাম ঈশ্বর-সেবায় দিনযাপন করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু তখনও তিনি ধর্মমত স্থির করিতে পারেন নাই। এক দিবস তুকারাম স্বপ্ন দেখেন যে, তিনি ভীমা নদীতে স্নান করিতে যাইতেছেন, এরূপ সময়ে একজন ব্রাহ্মণ তাঁহার মস্তকে হস্ত প্রদান করিয়া আশীর্বাদ করিলেন। পরে তিনি তাঁহার নিকট হইতে এক পোয়া ঘৃত যাচঞা করেন। ঐ বৃদ্ধ বলিয়াছিলেন, তাঁহার নিজ নাম বাবাজী এবং তাঁহার দীক্ষাগুরুদিগের নাম রাঘবচৈতন্য ও কেশবচৈতন্য। ঐ ব্রাহ্মণ তাঁহাকে 'রামকৃষ্ণহরি' এই মূলমন্ত্র প্রদান করিয়া কোথায় গমন করিলেন, তাহা তিনি স্থির করিতে পারিলেন না। তুকারাম স্বপ্নে দীক্ষা প্রাপ্ত হইয়া পাণ্ডুরঙ্গদেবের* আশ্রয়গ্রহণ করেন।

* দাক্ষিণাত্যে শ্রীকৃষ্ণের একটি প্রসিদ্ধ নাম পাণ্ডুরঙ্গ। পাণ্ডারপুরের পাণ্ডুরঙ্গ-বিগ্রহ বিশেষ প্রসিদ্ধ।

তুকারাম তাঁহার অবিচলিত অধ্যবসায়ের গুণে শীঘ্রই একজন সুপণ্ডিত হইয়া উঠেন এবং শাস্ত্রীয় গ্রন্থসকল পাঠ করিয়া মনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করেন। নামদেব নামে একজন মহারাষ্ট্রীয় সাধু কতকগুলি অভঙ্গ রচনা করিয়া যান। তুকারাম ঐ অভঙ্গসকল অভ্যাস করিয়া ভজন করিতেন। ভজন গান করিতে করিতে তুকারামের এরূপ অভ্যাস জন্মিয়াছিল যে, তিনি নিজে অভঙ্গ রচনা করিয়া গাইতে পারিতেন। রচনা করিতে করিতে তাঁহার এরূপ ক্ষমতা জন্মিয়াছিল যে, মুখ হইতে অনর্গল পদাবলী বাহির হইত। তিনি যে সময়ে কীর্তন করিতেন, সেই সময়ে শ্রোতাসকল স্পন্দহীন জড়পদার্থের ন্যায় বসিয়া থাকিত। তাঁহার কীর্তন ও উপদেশ শুনিবার জন্য দলে দলে লোক সমাগত হইত। তিনি জাতিতে শূদ্র ছিলেন বটে, কিন্তু কার্যগুণে লোকে তাঁহাকে ব্রাহ্মণের ন্যায় সম্মান করিত।

তুকারামের যশঃসৌরভ চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত হইতেছে দেখিয়া মম্বাজী* রামেশ্বর ভট্ট প্রভৃতি হিংস্রক লোকে তাঁহাকে বিবিধ উপায়ে যন্ত্রণা দেন ; কিন্তু পরিশেষে তুকারামের দয়া, দাক্ষিণ্য, বিনীতভাব, সুমিষ্ট কথা প্রভৃতি গুণসকল দর্শন করিয়া আশ্চর্যান্বিত হন ও অন্যান্য ব্যক্তিদিগের ন্যায় ভক্তি করিতে থাকেন।

পুনা নগর হইতে কিছুদূরে উত্তর-পূর্বে ভাগোলি নামক এক গ্রামে রামেশ্বর ভট্ট বাস করিতেন। তিনি তুকারামকে ডাকাইয়া বলেন যে, 'তুমি শূদ্র হইয়া বেদ ব্যাখ্যা করিতেছ কেন ? শূদ্রের পক্ষে ইহা মহাপাপ। আমি তোমায় নিষেধ করিতেছি, তুমি বেদ-ব্যাখ্যা এবং অভঙ্গ রচনা করিও না। তুমি পূর্বে যে অভঙ্গ রচনা করিয়াছিলে, তাহা জলে নিক্ষেপ কর।' ভট্টের কথা শুনিয়া তুকারাম বলিয়াছিলেন যে 'পাণ্ডুরঙ্গের আদেশে তিনি এইরূপ করিয়াছেন।' ভট্ট তাহা বিশ্বাস না করিয়া পুনরায় উহা জলে নিক্ষেপ করিতে বলেন। ব্রাহ্মণের আজ্ঞা অবশ্য-পালনীয় বলিয়া তুকারাম তাঁহার আদেশমত অভঙ্গের পুঁথিগুলি ইন্দ্রায়ণী নদীতে নিক্ষেপ করেন। পুঁথিগুলি জলে দিবার পূর্বে তিনি উহাদের দুইদিক পাতলা পাথরের দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া তাহার উপর বস্ত্র বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। লিখিত অভঙ্গগুলি জলে নিক্ষিপ্ত হইলে গ্রামস্থ ব্যক্তিগণ বিশেষ দুঃখিত হইয়া তাঁহাকে বাক্যযন্ত্রণায় অস্থির করিয়া তুলেন। 'আমি যে পাণ্ডুরঙ্গের আদেশ লঙ্ঘন করিয়াছি', ইহা ভাবিয়া তিনি অন্ন-জল ত্যাগ করিয়া বিঠোবার মন্দিরের সমক্ষে হত্যা দেন। ১৩ দিন এইভাবে পড়িয়া থাকিবার পর তাঁহার পুঁথিগুলি জলে ভাসিয়া উঠে। কোন এক ব্যক্তি ইহা দেখিতে পাইয়া ঐ সকল পুঁথি জল হইতে উত্তোলন করে এবং তুকারামকে আনিয়া দেয়। এই অলৌকিক ঘটনা দেখিয়া সকলেই তুকারামকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিতে আরম্ভ করে। রামেশ্বর ভট্ট তাঁহার প্রতি যে নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহার জন্য তিনি দুঃখ প্রকাশ করিয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

ইতিহাসপাঠকমাত্রেই শিবাজীর নাম শ্রবণ করিয়াছেন। শিবাজী কেবল যে যুদ্ধবিদ্যাতেই পারদর্শী ছিলেন তাহা নহে ; তিনি ধর্মসাধনেও বিশেষত্ব লাভ করিয়া-

'মম্বাজী বাবা গোসাই' নামক একজন সাধু সর্বপ্রথমে তুকারামের প্রতি অত্যাচার করিতে আরম্ভ করেন। তিনি দেহু গ্রামে এক মঠ স্থাপন করিয়া সেই গ্রামের মোহান্ত হইয়াছিলেন।

ছিলেন। তুকারামের গুণগরিমা ক্রমে শিবাজীর কর্ণে উঠে। তিনি তুকারামকে আপনার রাজধানীতে আনাইবার জন্য অশ্ব, ভৃত্য ও রাজচ্ছত্র পাঠাইয়া দেন; কিন্তু তুকারাম নিমন্ত্রণ গ্রহণ না করিয়া এই মর্মে একখানি পত্র লিখিয়া পাঠান ;—

'মহারাজ ! কেন তুমি আমাকে দারুণ পরীক্ষার মধ্যে নিক্ষেপ করিতেছ ? আমার বাসনা এই যে, নিঃসঙ্গ হইয়া সংসার হইতে দূরে থাকি, নির্জনতায় সুখ-সম্ভোগ করি, মৌনী হইয়া থাকি এবং ঐশ্বর্য, মান, সম্ভ্রম ইত্যাদিকে বমনোদ্গীর্ণ খাদ্যের ন্যায় জ্ঞান করি ; কিন্তু হে পাণ্ডারিনাথ ! আমার ইচ্ছায় কি হইতে পারে ? সকলই তোমার অধীন। হে রাজন্ ! তোমার নিকটে গিয়া আমার কি লাভ হইবে ? যদ্যপি আমার খাদ্যের প্রয়োজন হয়, ভিক্ষা-বৃত্তি আমার সমক্ষে প্রশস্ত পথ রহিয়াছে। যদি আমার বস্ত্রের প্রয়োজন হয়, পথে পতিত ছিন্ন বস্ত্র আমার অভাব পূর্ণ করিবে। রাজন্ ! বাসনা জীবনকে নষ্ট করে মাত্র। যাহারা সম্ভ্রম লাভ করিতে ইচ্ছা করে, তাহারাই রাজপ্রাসাদে যাইতে যত্নবান্ হয়। মহারাজ ! আমি নতশির হইয়া তোমাকে এই পত্রখানি লিখিলাম।'

মহাত্মা শিবাজী তুকারামের পত্র পাঠ করিয়া বলিয়াছিলেন, 'ঈশ্বর-প্রসাদ ভোগ করিয়া যিনি পরিতৃপ্ত হইয়াছেন, তাঁহার নিকট রাজপ্রাসাদ কণ্টকাকীর্ণ বনস্বরূপ।'

তুকারাম সাধনায় এরূপ সিদ্ধ হইয়াছিলেন যে, লোহা-গাভা গ্রামে যে সময়ে তিনি কীর্তন করিতেছিলেন, সেই সময়ে কোন স্ত্রীলোক নিজ সন্তানের মৃতদেহ লইয়া তুকারামের সমক্ষে লইয়া আসে ও বলে, 'মহাশয় ! আপনি যদি যথার্থ বিষ্ণুভক্ত হন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমার পুত্রের জীবনদান করিতে সমর্থ হইবেন ; নচেৎ সকলই আপনার ভণ্ডামী বুঝিব !' রমণী শোকে মুহ্যমানা হইয়া এই কয়েকটি কথা বলিলে পর, তুকারাম অন্তরে বুঝিয়াছিলেন যে, 'এই রমণীর বিশ্বাস, ঈশ্বরভক্তমাত্রেই মৃতব্যক্তির জীবনদান করিতে পারে, কিন্তু সে ক্ষমতা ত আমার জন্মায় নাই', এইরূপ মনে করিয়া তিনি নারায়ণের স্তব করেন। প্রবাদ এই যে, নারায়ণের স্তব করিবামাত্র মৃত বালকটি সজীব হইয়াছিল।

তুকারামের জীবন কোথায় এবং কি প্রকারে শেষ হয়, তাহার কোন যথার্থ বৃত্তান্ত পাওয়া যায় না। ১৫৭১ শকে ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণপক্ষের দ্বিতীয়ার প্রাতঃকালে তিনি অন্তর্ধান হন ; ইহার পর হইতে কেহ তাঁহাকে আর দেখিতে পায় নাই।

তুকারামের অন্তর্ধানের পর, তাঁহার পুত্র বিঠোবা, শিবাজীর সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং দেহু গ্রামে বিঠোবাদেবের একটি মন্দির নির্মাণ করিবার অভিপ্রায় তাঁহার নিকট প্রকাশ করেন। শিবাজী তুকারামের পুত্রকে সমাদর করিয়া বিঠোবাদেবের মন্দির নির্মাণ করাইয়া দেন ও দেবসেবার জন্য তিনখানি গ্রাম প্রদান করেন।

—:০:—

সাধু তুলসীদাস

প্রয়াগের পশ্চিমাংশে ও চিত্রকূটের পূর্বাংশে রাজাপুর নামে একখানি গ্রাম আছে। পূর্বকালে ভানুদত্ত দুবে নামক একজন কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণ তথায় বাস করিতেন। হুলসী নাম্নী পরম রূপলাবণ্যবতী তাঁহার এক স্ত্রী ছিলেন। হুলসীর গর্ভে ও ভানুদত্তের ঔরসে দুই পুত্র জন্মে। শ্যাম-সবল নামক গ্রন্থ-প্রণেতা নন্দদাস তাঁহার জ্যেষ্ঠ এবং তুলসীদাস কনিষ্ঠ পুত্র। আন্দাজ ১৫৩৫ খ্রীষ্টাব্দে তুলসীদাস ইহজগতে পদার্পণ করিয়াছিলেন। তুলসীদাস যখন অষ্টমবর্ষীয় বালক, তখন তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়; ইহার কিছুদিন পরে তিনি শ্রীশ্রী৺কাশীধামে আসিয়া বিদ্যাধ্যয়নে নিযুক্ত হন। ন্যূনাধিক বার বৎসর একাদিক্রমে পাঠাভ্যাসে রত থাকিয়া তুলসীদাস স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন ও দারপরিগ্রহ করিয়া কিছুকাল সংসারধর্মে মনোনিবেশ করেন। তুলসীদাস সংসারের মোহিনী মায়ায় বদ্ধ হইয়া অত্যন্ত স্ত্রৈণ হইয়াছিলেন। তিনি সর্বদাই স্ত্রীর কাছে কাছে থাকিতেন। একদণ্ড সময়ও স্ত্রীর অদর্শন-ক্লেশ সহ্য করিতে পারিতেন না। একসময়ে তাঁহার স্ত্রীকে পিত্রালয়ে লইয়া যাইবার জন্য তাঁহার কোন আত্মীয় আসিয়াছিলেন, কিন্তু তুলসীদাস কিছুতেই স্ত্রীকে পিত্রালয়ে পাঠাইতে সম্মত হন নাই। কন্যার পিতা পুনঃ পুনঃ লোক পাঠাইতেন, তুলসীদাস পুনঃ পুনঃ ফিরাইয়া দিতেন। এক সময়ে তুলসীদাস কোন কার্যোপলক্ষে স্থানান্তরে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার অনুপস্থিতিকালে সহসা তাঁহার স্ত্রীকে লইয়া যাইবার জন্য শ্বশুরবাটী হইতে লোক আসে। হুলসী দেবী তুলসীদাসের অসম্মতিসত্ত্বেও নিজ বধূমাতাকে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দেন। তুলসীদাস বাটীতে প্রত্যাগমন করিয়া স্বীয় প্রিয়তমা ভার্যার মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করিতে না পাইয়া, জননীকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। হুলসী দেবী তুলসীদাসকে এই কথা বলিয়াছিলেন যে, 'বৎস! আমি পুনঃ পুনঃ লোক ফিরাইয়া দেওয়া অতি গর্হিত কার্য বিবেচনা করি, সেই জন্য তোমার অসম্মতিসত্ত্বেও বধূমাতাকে তাহার পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিয়াছি।' তুলসীদাস মাতার এবংবিধ বাক্য শ্রবণে কাল-বিলম্ব না করিয়া একেবারে শ্বশুরালয়ে উপস্থিত হন। তাঁহার পত্নী স্বামীকে সমাগত দেখিয়া কিঞ্চিৎ ক্ষুব্ধচিত্তে বলিয়াছিলেন—

'লাজ না লাগত আপুকো, ধোরে আয়েহু সাথ।
ধিক্ ধিক্ আয়সে প্রেমকো, কহা কহো মৈ নাথ॥
অস্থিচর্মময় দেহ মম, তামো জৈসী প্রীতি।
তৈসী জো শ্রীরাম মহ, হোত ন তত্ত্ব ভবভীতি।'

'স্বামিন্! এই অস্থিচর্মমাংস-শোণিত-নির্মিত আমার অনিত্য শরীরে যে পরিমাণে তোমার স্নেহ ও প্রেম বিরাজিত আছে, যদি সেই পরিমাণে ঐ স্নেহ ও প্রেম ভূতভাবন ত্রিলোক-প্রকাশক শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি বিরাজিত থাকিত, তাহা হইলে তুমি ইহলোকে ও পরলোকে বিমল আনন্দানুভব করিতে সমর্থ হইতে।'

প্রিয়তমার এবংবিধ জ্ঞানোদ্দীপক বাক্য শ্রবণ করিয়া, তুলসীদাসের জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হওয়ায়, তিনি আপন শ্বশুরালয় পরিত্যাগ করিয়া কাশীধামে আগমন করেন। তথায় তিনি সন্ধ্যাবন্দনাদি নৈত্যিক ক্রিয়া সমাপনে ও শ্রীরামচন্দ্রের চরণকমল-ধ্যানে কালাতিপাত করিতে থাকেন। তিনি কাশীধামের অনতিদূরে প্রত্যহ প্রাতঃকালে মলত্যাগ করিয়া শৌচের অবশিষ্ট জল একটি ঝোপে ফেলিয়া দিতেন। ঐ ঝোপে এক পিশাচ বাস করিত ; সে প্রত্যহ ঐ জল পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইত। একদা ঐ পিশাচ জলপানে বঞ্চিত হওয়ায় তুলসীদাসের নিকটে আসে এবং ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করে। পিশাচের কথা শুনিয়া তুলসীদাস বলেন যে, ঐ দিবস জলের পরিমাণ অল্প থাকায়, তাঁহার শৌচকার্যে সমস্ত জল ব্যয়িত হইয়াছিল, সুতরাং তিনি জল দিতে পারেন নাই। পিশাচ তুলসীদাসের কথা শুনিয়া তাঁহাকে অভিলষিত বর-প্রার্থনা করিতে বলে। ইহাতে তুলসীদাস প্রীত হইয়া প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের দর্শন পাইবার বর-প্রার্থনা করেন। পিশাচ তাঁহাকে অভিলষিত বর-প্রদানে অসমর্থ হইয়া কর্ণঘণ্টা নামক স্থানে এক ব্রাহ্মণের নিকট যাইতে বলে। তুলসীদাস তথায় উপস্থিত হইলে ঐ ব্রাহ্মণ তাঁহাকে রাম-মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া চিত্রকূট পর্বতে যাইতে আদেশ প্রদান করেন। তুলসীদাস গুরুকর্তৃক আদিষ্ট হইয়া ক্রমান্বয়ে ছয়মাসব্যাপী সাধনার পর, সেই মহামন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করেন।

এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে, ভগবান্ ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য নরাকারে তুলসীদাসকে দর্শন দিয়াছিলেন। এক দিবস তিনি পর্বতোপরি বনফুলের শোভা সন্দর্শন করিতেছিলেন, হঠাৎ দেখিতে পাইলেন যে, অলৌকিক রূপলাবণ্য সম্পন্ন দুইজন যুবক, হস্তে ধনুর্বাণ ধারণ করিয়া অশ্বারোহণে গমন করিতেছেন। তিনি প্রকৃত মনুষ্যজ্ঞানে তখন তাঁহাদিগকে উপেক্ষা করেন ; পরে দৈব সাহায্যে জানিতে পারেন যে, তাঁহার ইষ্টদেবতা তাঁহাকে দর্শন দিবার জন্য আসিয়াছিলেন।

তুলসীদাস মহামন্ত্রে সিদ্ধ হইয়া শ্রীবৃন্দাবনে গমন করেন। তথায় সীতারাম নামের পরিবর্তে রাধাকৃষ্ণ নাম শুনিয়া তিনি আর আপন বাসাবাটী হইতে বাহির হইতেন না। একদা একজন বঞ্চক প্রতারণা করিয়া তাঁহাকে মদনগোপালের মন্দিরে লইয়া যায়, এবং কহে যে, শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন করুন। সাধু তুলসীদাস তাঁহার হস্তে বংশী দেখিয়া কহিয়াছিলেন,—

> 'কহা কহো ছবি আজকী ভালেব নেহো নাথ।
> তুলসী মস্তক তব নোয়ে ধনুষবাণ লেও হাত ॥
> ভক্তবছল ভগবানকী বেদ বিদিত ইহ গাথ।
> মুরলী মুকুট দুরাউকে নাথ ভয়ে রঘুনাথ ॥'

হে নাথ ! আজি যে অপূর্ব শোভায় শোভিত হইয়াছেন, তার আর কি কহিব ; কিন্তু ধনুর্বাণ হস্তে গ্রহণ না করিলে তুলসী মস্তক প্রণত করিবে না। এই কথা শুনিয়া বেদগাথাপ্রসিদ্ধ ভক্তবৎসল হরি, চূড়া ও বাঁশী লুকাইয়া ধনুর্বাণ হস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

তুলসীদাস শ্রীবৃন্দাবনে কিছুদিন অবস্থান করিয়া অযোধ্যায় গমন করেন। অযোধ্যায় অবস্থানকালে তিনি রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন ; রামায়ণ রচনার সময়-নির্দেশ এইরূপে করিয়াছেন,—

'সম্বৎ সোলহলো ইকতৈসা, করৌ কথা হরিপদ ধরি সীমা।
নৌমী ভৌমবার মধুমাসা, অবধ পুরয়াহ চরিত প্রকাশা॥'

অর্থাৎ ১৬৩১ সংবতে চৈত্রমাস মঙ্গলবার নবমী তিথিতে হরিপদ ধ্যান করিয়া অযোধ্যাপুরীতে এই রামচরিত প্রকাশ করিলাম। তুলসীদাস অযোধ্যা হইতে কাশীতে আগমন করেন। যে সময় তিনি কাশীতে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময়ে এক ব্যক্তি একজন ব্রাহ্মণকে হত্যা করে। ঐ ব্রহ্মহত্যাকারী সর্বদাই পাপের বিভীষিকা মূর্তি দর্শন করিত, ক্ষণেকের জন্যও তাহার মনে শান্তি ছিল না। কি উপায়ে সে ঐ পাপের যন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ করিবে, তাহার বিধান লইবার জন্য কাশীতে গমন করে। সে কাশীতে গিয়া তথাকার ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদিগের নিকট আপনার অভিলাষ ব্যক্ত করে। 'এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই' এই কথা বলিয়া পণ্ডিতগণ তাহাকে তাড়াইয়া দেন। হত্যাকারী মনের ঘৃণায় ও দুঃখে ভাগীরথী-সলিলে জীবন বিসর্জন করিতে সঙ্কল্প করে। ইতিমধ্যে তুলসীদাসের সহিত হত্যাকারীর সাক্ষাৎ হয়। তুলসীদাস তাহাকে 'রাম-নাম' জপ করিতে উপদেশ দেন। কয়েক মাস কাল একাগ্রচিত্ত হইয়া রাম নাম জপ করিবার পর, তুলসীদাস তাহাকে বলেন, 'তোমার পাপক্ষয় হইয়াছে; এস, আমরা দুইজনে একত্রে আহার করি।' প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণ তুলসীদাসকে হত্যাকারীর সহিত আহার করিতে দেখিয়া, তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হন এবং ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। পণ্ডিতদিগের কথায় তুলসীদাস বলিয়াছিলেন যে, 'রাম নাম' জপ করিয়া হত্যাকারী পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে; আপনারা ইচ্ছা করিলে, পরীক্ষা করিতে পারেন। তুলসীদাসের কথায় পণ্ডিতগণ একত্রে মিলিত হইয়া এই উপায় স্থির করেন যে, 'যদি বিশ্বেশ্বরের প্রস্তর-নির্মিত বৃষ ঐ হত্যাকারীর হস্ত হইতে খাদ্যদ্রব্য ভক্ষণ করে, তাহা হইলে জানিব যে, ঐ ব্যক্তি পাপ হইতে মুক্ত হইয়াছে।' তুলসীদাস পণ্ডিতদিগের কথায় সম্মত হইয়া, হত্যাকারীর সহিত পণ্ডিতদিগকে লইয়া বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হন। তথায় তিনি পরীক্ষার্থীর হস্তে খাদ্য প্রদান করিয়া সর্বসমক্ষে প্রস্তর-নির্মিত বৃষের সম্মুখে তাহা ধরিতে বলেন। তুলসীদাসের কথায় হত্যাকারী, বৃষের মুখে খাদ্য ধরিবামাত্র ঐ বৃষ জীবিত বৃষের ন্যায় সমস্ত খাদ্য ভক্ষণ করিয়া ফেলে। এই বিস্ময়কর ঘটনা দর্শন করিয়া সকলেই তুলসীদাসকে ঈশ্বরের অংশ মনে করেন এবং সেই অবধি তাঁহার উপর সকলের প্রগাঢ় ভক্তির সঞ্চার হয়।

তুলসীদাসের ভক্তগণ তুলসীদাসের ব্যবহারের জন্য স্বর্ণ-রৌপ্যাদিনির্মিত কয়েকটি পাত্র এবং তাঁহার ইষ্টদেব রামচন্দ্রকে কিছু অলঙ্কার প্রদান করিয়াছিলেন। একজন তস্কর ঐ সকল দ্রব্য অপহরণ করিবার মানসে তাঁহার আশ্রম-মধ্যে প্রবেশ করে। তস্কর তুলসীদাসকে ধ্যান-মগ্ন দেখিয়া স্বকার্যসিদ্ধির জন্য যেমন হস্ত প্রসারণ করিতে যাইবে, অমনি দেখে যে, অনুপম রূপলাবণ্যসম্পন্ন একজন দিব্য পুরুষ ধনুর্বাণ হস্তে লইয়া তাহাকে লক্ষ্য করিতেছে। তস্কর উহা দেখিয়া ভয়বিহ্বলচিত্তে তৎক্ষণাৎ তথা হইতে পলায়ন করে। লোভের বশীভূত হইয়া ঐ তস্কর পুনরায় আগমন করে, কিন্তু পূর্বের ন্যায় ধনুর্বাণধারী ব্যক্তিকে দর্শন করিয়া পলাইয়া যায়। এইরূপে ঐ তস্কর পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়াও যখন কৃতকার্য হইতে পারিল না, তখন ঐ দস্যু তুলসীদাসের নিকট উপস্থিত হইয়া বলে 'সাধু বাবা! যে ব্যক্তি রাত্রিকালে আপনার প্রহরীর কার্য

করে, সে ব্যক্তি কোথায়? তাহার সহিত আমার বিশেষ আবশ্যক আছে।' দস্যুর কথায় তুলসীদাস বলেন, 'বাপু হে! কে প্রহরীর কার্য করে, তাহা ত আমি জানি না। তাহার আকৃতি কি রকম, বলিতে পার?' তস্কর, নবদূর্বাদলশ্যাম-কান্তি ধনুর্বাণধারী পুরুষের আকৃতি বর্ণনা করিলে, তুলসীদাস বুঝিতে পারেন যে, শ্যামবর্ণ পুরুষ আর কেহই নহেন, তাঁহারই প্রভু রামচন্দ্র। সামান্য তৈজস-পত্রাদি রক্ষার জন্য তাঁহার ইষ্টদেবকে রাত্রিজাগরণ করিতে হয়, ইহা ভাবিয়া বিশেষ লজ্জিত হইয়া তিনি সেই মুহূর্তেই তাঁহার সমস্ত তেজস-পত্র ঐ তস্করকে এবং দীনদুঃখীদিগকে প্রদান করেন। তুলসীদাস তস্করকে সম্বোধন করিয়া বলেন, 'হে তস্কর, তুমি অতি ভাগ্যবান্ ব্যক্তি, তুমি বিনা সাধনায় যখন ভগবানের সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছ, তখন তোমার তুল্য পুণ্যাত্মা আর কে আছে? তুমি তোমার অভিলাষমত দ্রব্যাদি গ্রহণ কর।' তস্কর তুলসীদাসের এবংবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া ঐ সকল দ্রব্য লইতে অস্বীকার করে এবং আপনার যাহা কিছু সম্বল ছিল, তাহা সমস্ত বিতরণ করিয়া দিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে।

এক দিবস একজন ব্রাহ্মণ-কন্যা মৃত পতির সহিত সহমৃতা হইবার জন্য যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে তুলসীদাসকে দেখিয়া ভূমিষ্ট হইয়া প্রণাম করেন। তুলসীদাস জানিতেন না যে, তিনি বিধবা হইয়াছেন, সুতরাং তিনি তাঁহাকে 'সৌভাগ্য-শালিনী হইয়া পতিসহ সুখে কালযাপন কর' এই আশীর্বাদ করেন। সহমৃতগমনোদ্যতা রমণীর সঙ্গীগণ, তুলসীদাসের এবংবিধ আশীর্বাদ শুনিয়া তাঁহাকে বলেন, 'ঠাকুরজি! এইমাত্র ইঁহার স্বামীকে দাহ করিবার জন্য গঙ্গাতীরে আনা হইয়াছে, সুতরাং ইনি কিরূপে পতিসহ সুখে কালযাপন করিবেন?' এই কথা শুনিয়া তুলসীদাস কিছু বিস্মিত হন এবং তাঁহাদিগের সহিত শ্মশানভূমিতে গমন করেন। তিনি ঐ স্থানে যাইয়া দেখেন যে, ঐ রমণীর পতি একখণ্ড বস্ত্রাচ্ছাদিত হইয়া মৃত্তিকা-শয্যায় শায়িত রহিয়াছে। তুলসীদাস আর কালবিলম্ব না করিয়া ঐ আচ্ছাদনবস্ত্রখানি খুলিয়া ফেলিলেন এবং ঐ শবের গাত্রে হস্ত বুলাইয়া দিয়া তাহাকে পুনর্জীবিত করেন। মৃতব্যক্তি সুপ্তোত্থিতের ন্যায় উঠিয়া বসিল, তত্রত্য সকলেই বিস্ময়-সাগরে মগ্ন হইয়া যায় ও তাঁহার পদে লুটাইয়া পড়ে।

তুলসীদাসের অলৌকিক ঘটনাসকল শ্রবণ করিয়া দিল্লীর বাদশাহ তাঁহাকে দিল্লীতে লইয়া যান, এবং তাঁহাকে কিছু অদ্ভুত কৌশল দেখাইতে বলেন। বাদশাহের কথায় তুলসীদাস বলিয়াছিলেন, 'জাঁহাপনা! আমি অতি সামান্য মানুষ, আমি আপনাকে কি অলৌকিক ঘটনা দেখাইব? আমি কেবল ইষ্টদেবের নামগান করিয়া থাকি; অলৌকিক কিছু দেখাইবার ক্ষমতা আমার নাই।' তুলসী তাঁহাকে অপমান করিল ভাবিয়া, বাদশাহ ইঁহাকে কারারুদ্ধ করেন। কয়েক দিবস অবরুদ্ধ থাকিবার পর, প্রধানা বেগমের অনুরোধে তুলসীদাস কারাগার হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন।

এরূপ জনশ্রুতি আছে যে, ঐ সময়ে অসংখ্য হনুমান্ এবং বানর দিল্লী নগরে আগমন করিয়া বিষম উৎপাত আরম্ভ করিয়াছিল। বানরগণ বাদশাহের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া যখন অত্যন্ত ক্ষতি করিতে আরম্ভ করে, সেই সময় বাদশাহের সভাসদ্‌গণ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, জাঁহাপনা! ইহা তুলসীদাসের কৌশল; তাঁহাকে কারামুক্ত না করিলে, এই উৎপাতের নিবৃত্তি হইবে না।' বাদশাহ তুলসীদাসকে কারাগার হইতে

মুক্তিপ্রদান করিবামাত্রই সমস্ত হনুমান্‌ এবং বানর দিল্লীনগর পরিত্যাগ করে।

তুলসীদাস কেবল সাধক ছিলেন না ; তাঁহার রচনাশক্তিও অত্যদ্ভুত ছিল। তাঁহার রচিত হিন্দী রামায়ণ ব্যতীত আরও অনেক গ্রন্থ আছে। ঐ সকল গ্রন্থের মধ্যে জানকীমঙ্গল, সঙ্কটমোচন, রামলতা, বৈরাগ্যসন্দীপনী, পার্বতীমঙ্গল, বিনয়-পত্রিকা, দোঁহাবলী প্রভৃতি পুস্তকগুলি অতি আদরের সামগ্রী।

১৬৮০ সংবতের শ্রাবণ মাসে শুক্ল পক্ষে ৺কাশীধামে তুলসীদাসের দেহান্ত হয়। কাশীর প্রান্তসীমায় অসিঘাটের উপর বালার্ককুণ্ড নামে একটি কুণ্ড আছে। ঐ কুণ্ডের নিকট তুলসীদাসের আশ্রম অদ্যাবধি বর্তমান আছে।

পূর্বে জীবন-চরিত লেখার পদ্ধতি প্রচলন ছিল না। কালক্রমে ঐ অভাব পূরণ করিবার জন্য কেহ কেহ চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং এখনও পর্যন্ত করিতেছেন। ঘন-তমসাচ্ছন্ন জীবনীগুলির উদ্ধারকর্তাদিগের মধ্যে স্থানে স্থানে মতদ্বৈধ দৃষ্ট হয়। আমি এই স্থলে তাহার দুই একটা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

কিছু দিবস পূর্বে 'সাহিত্য-সংহিতা' নামক একখানি পত্রিকায় তুলসীদাসের জীবনী প্রকাশিত হইয়াছিল। লেখক জীবনী লিখিবার পূর্বেই বলিয়াছেন যে, তিনি হিন্দী ভাষাভিজ্ঞ পণ্ডিতগণের সংগৃহীত জীবনী অবলম্বন করিয়া লিখিয়াছেন ; কিন্তু শ্রীযুক্ত কেদারনাথ ঘোষ মহাশয় যে সময় তুলসীদাস-রামায়ণ, কাশী-নিবাসী পণ্ডিতদিগের দ্বারা তর্জমা করাইয়া বঙ্গভাষায় প্রকাশিত করিয়াছিলেন, সেই সময় তিনিও তুলসীদাসের জীবনী প্রকাশিত করেন। আমি তাঁহারই প্রকাশিত জীবনীর আভাষ লইয়া লিখিয়াছি। পাঠক-পাঠিকার অবগতির জন্য আমি 'সাহিত্য-সংহিতা' এবং 'ভারতবর্ষীয় ভক্তকবি' নামক গ্রন্থ-দ্বয় হইতে তুলসীদাসের জীবনীর কিয়দংশমাত্র এই স্থানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। সাহিত্য-সংহিতায় লিখিত আছে,—

গোস্বামী তুলসীদাস, বান্দা জেলার অন্তর্গত রাজাপুর গ্রাম-নিবাসী পরাশর গোত্রোদ্ভব আত্মারাম দ্বিবেদীর পুত্র। ১৫৮৯ সংবতে অর্থাৎ ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয়। গণ্ডযোগে জন্ম হওয়ায়, মাতাপিতা, জন্মকালেই তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন। এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া তুলসীদাস, স্বরচিত বিনয়-পত্রিকায় লিখিয়াছেন,—

'জননী জনক ত্যাজ্যো জর্নামি পরম পরম বিন বিধিহুঃ সিরাজো অবড়েরে' অর্থাৎ ঈশ্বর আমাকে এমনই ভাগ্যহীন সৃষ্টি করিয়াছেন যে, জন্মমাত্রেই মাতাপিতা আমাকে ত্যাগ করেন।'

মাতাপিতা কর্তৃক পরিত্যক্ত হইলে, নৃসিংহদাস নামক এক সাধু, শিশু তুলসীদাসকে লক্ষণাক্রান্ত দেখিয়া ও শিশুর ক্রন্দনে স্নেহপরবশ হইয়া তাঁহাকে আপনার শূকরক্ষেত্রস্থিত কুটীরে লইয়া গেলেন ও যত্নপূর্বক লালনপালন করিতে লাগিলেন। দয়াময় সাধু, বাল্যকাল হইতেই তুলসীদাসকে রামভক্তি পরায়ণ করিয়াছিলেন। বালক তুলসীদাস, রামচরিতামৃতপানে সর্বদাই পিপাসু থাকিতেন। ক্রমে উপযুক্ত বয়সে তুলসীদাস, উক্ত মহাত্মার নিকট দীক্ষিত হইলেন এবং প্রগাঢ় যত্ন সহকারে অধ্যয়ন করিয়া নানাশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইলেন।

তুলসীদাস দেখিতে অতি সুন্দর ছিলেন। দীনবন্ধু পাঠক নামে এক ব্রাহ্মণ, তুলসীদাসের রূপে, গুণে ও রামভক্তিতে মুগ্ধ হইয়া আপনার সর্ব-সদ্‌গুণালঙ্কৃতা কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ দিলেন। বিবাহের পর গুরুগৃহ ত্যাগ করিয়া, তুলসীদাস

স্বতন্ত্র হইয়া পত্নীসহ বাস করিতে লাগিলেন। তুলসীদাসের পত্নীর নাম 'রত্নাবলী' ছিল।

তুলসীদাস প্রতিদিন প্রাতে বহির্দেশে গমন করিয়া প্রত্যাগমনকালে শৌচাবশিষ্ট জল, একটি বিল্ববৃক্ষের মূলে ঢালিয়া দিতেন। একদা তিনি বৃক্ষমূলে আসিয়া পাত্রে জল নাই দেখিলেন ও দুঃখিত-চিত্তে কিয়ৎকাল তথায় দণ্ডায়মান রহিলেন। সেই বৃক্ষে একটি ভূত বাস করিত। সে তুলসীদাসকে সম্বোধন করিয়া বলিল—'অদ্য জল নাই, তাহার জন্য দুঃখিত হইও না। তুমি নিত্য এই বৃক্ষমূলে যে জল সেচন কর, তাহা পান করিয়া আমি তৃপ্তিলাভ করি। আমি তোমার উপর বড় প্রসন্ন হইয়াছি। তুমি অভীপ্সিত বর-প্রার্থনা কর।' তুলসীদাস বলিলেন, 'যদি আমার উপর প্রসন্ন হইয়া থাক, তাহা হইলে ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের সহিত আমার সাক্ষাৎ করাইয়া দাও।' ভূত বলিল, 'আমার সে ক্ষমতা থাকিলে আমি ঘৃণিত ভূতযোনিতে কেন থাকিব ? তবে আমি তোমায় এক উপায় বলিয়া দিতেছি, তদনুসারে কার্য করিলে, তোমার ইষ্টসিদ্ধি হইবে।'

'ভারতবর্ষীয় ভক্তকবি' নামক গ্রন্থে লিখিত আছে ;—

'অন্তর্বেদীয় অন্তঃপাতী তরী নামক গ্রামে শুক্ল উপাধিক এক কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণের গৃহে তুলসীদাস জন্মগ্রহণ করেন। অল্প বয়সে তাঁহার পিতার মৃত্যু হয় ; কিন্তু কথঞ্চিত সঙ্গতি থাকাতে প্রথমতঃ তাঁহাকে সাংসারিক কষ্টাদি ভোগ করিতে হয় নাই। কিঞ্চিৎ বয়োধিক হইলে তিনি কাশীর রাজার মন্ত্রী হইয়া বারাণসীতে বাস করেন। অগ্রদাসের শিষ্য জগন্নাথ দাস তাঁহার দীক্ষাগুরু ছিলেন। যৌবনাবস্থায় এক সুন্দরী রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়া তিনি কিছুদিনের জন্য সাংসারিক সুখভোগে কালাতিপাত করেন। এই সময়ে তুলসীদাস একটি পুত্রসন্তান লাভ করেন। তুলসীদাস স্বীয় সহধর্মিণীকে প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন। এমন কি, তাঁহাকে ছাড়িয়া তিনি কোথাও এক মুহূর্তও থাকিতে পারিতেন না।

গোঁসাইজীর এই কয়টি নিয়ম ছিল যে, তিনি কদাপি কাশীক্ষেত্রের সীমানার মধ্যে মলমূত্র পরিত্যাগ করিতেন না। তাঁহার শৌচাদি ক্রিয়ার নিমিত্ত তাঁহাকে প্রতিদিন অসি পার হইয়া দক্ষিণাভিমুখে অনেকদূর যাইতে হইত এবং প্রত্যাবর্তন কালে ভৃঙ্গারমধ্যে যে অবশিষ্ট জলটুকু থাকিত, অপবিত্রজ্ঞানে উহা কাশীতে আনয়ন না করিয়া নদী-পারেই এক আম্রবৃক্ষের মূলে নিক্ষেপ করিতেন। কথিত আছে, স্বকীয় কর্ম-ফলানুবর্তী এক পিশাচ ঐ বৃক্ষোপরি বাস করিত। সে একদিন গোঁসাইকে একাকী পাইয়া অতীব বিনীতভাবে তাঁহাকে কহিল, 'হে ব্রাহ্মণ ! আপনি আমাকে অনেক জলপান করাইয়াছেন, ইহাতে আমি আপনার উপর সাতিশয় প্রসন্ন হইয়াছি। আপনি আমার নিকট অভীপ্সিত বর প্রার্থনা করুন।' ভয়হীন তুলসী জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনি কে এবং কিসের জন্যই বা এখানে অবস্থান করিতেছেন ?' প্রেত উত্তর করিলেন, 'আমি পূর্বজন্মে বিন্ধ্যপর্বতের নিকটস্থ কোন এক গ্রামবাসী ব্রাহ্মণ ছিলাম। তথাকার রাজা আমার যজমান ছিলেন। এইজন্য তদ্দেশে আমার অতিশয় প্রতিপত্তি ছিল। রাজা পুণ্য-সঞ্চয়ের জন্য যাহা কিছু দান করিতেন, সাতিশয় লোভবশতঃ আমি তাহার সমস্তই স্বীয় গৃহে লইয়া যাইতাম, অন্যান্য ব্রাহ্মণ বা দীনদুঃখীকে তাহার কিছুই দিতাম না। ইহাতে সাধু সজ্জন প্রভৃতির সহিত আমার সর্বদাই বিরোধ হইত

এবং আমি মিথ্যা করিয়া রাজসমীপে সেই সকল মহাপুরুষের নিন্দা করিতাম। আমার আত্মীয়-স্বজন, পাত্রই হউক আর অপাত্রই হউক, আমার চক্রান্তের প্রভাবে রাজদ্বারে বিপুল দানাদি প্রাপ্ত হইত। আমার জীবন কপটতাপূর্ণ ছিল। আমি কায়মনোবাক্যে কখনও কাহারও উপকার করিতাম না। দৈবাধীন পিপাসার্ত এক দুঃখী ব্রাহ্মণ একদিন আমার নিকট কিঞ্চিৎ পানীয় জল প্রার্থনা করিয়াছিলেন। আমি উহাকে তাহা দিয়াছিলাম। মনুষ্য-জন্ম গ্রহণ করিয়া অবধি, বোধহয় এই একটিমাত্র সৎকার্য আমাকর্তৃক সম্পাদিত হইয়াছিল। সেই পুণ্যবলে আপনার নিকট আমি প্রত্যহ পানীয় জল প্রাপ্ত হইতেছি।'

গোস্বামী জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনি বিন্ধ্যাচলবাসী ছিলেন, এ স্থানে কেমন করিয়া আসিলেন?' পিশাচ কহিল, 'এক সময়ে আমাদের রাজা কাশীযাত্রা করেন, তাঁহার সঙ্গে আমিও আসিয়াছিলাম। এই বৃক্ষতলে পেঁছিবামাত্র হঠাৎ এক কালসর্প আমাকে দংশন করিল এবং তাহাতেই আমার প্রাণবিয়োগ হইল। মৃত্যুর পর একদিন যমদূত ও অন্যদিকে শিবদূতগণ আমাকে লইতে আসিলেন। যমদূতগণ বলিতে লাগিলেন, এ ব্যক্তি অতিশয় পাপী, আমরা ইহাকে নরকে লইয়া যাইব। মহাদেবের দূতগণ ইহাতে সম্মত না হইয়া কহিতে লাগিলেন—না, এই মনুষ্য কাশী আসিবার মানসে গৃহ হইতে যাত্রা করিয়া পথিমধ্যে পঞ্চত্ব পাইয়াছে। যদিও মহাপাপী বলিয়া কাশী পর্যন্ত পেঁছিতে পারে নাই, তথাপি কাশীর মার্গে উহার দেহ নাশ হইয়াছে, অতএব মহাতীর্থের মহিমা-বলে তোমরা উহার অঙ্গ স্পর্শ করিতে পারিবে না। এ ব্যক্তি ভূতযোনি প্রাপ্ত হইয়া এই স্থানেই থাকিবে এবং ক্ষুধা, পিপাসা ও স্বকীয় কর্মানুযায়ী ফল ভোগকরণানন্তর গভীর যাতনা সহ্য করিয়া, তাহার পর কোন হরিভক্ত ব্রাহ্মণের জলপান দ্বারা মুক্তিলাভ করিবে। এই নিমিত্ত, হে বিপ্রবর! কাশীর মহিমা-বলে আমাকে এই স্থানেই এতদিন বাস করিতে হইয়াছে। এক্ষণে আপনার দত্ত জল পান করিয়া ভূতযোনি হইতে মুক্তিলাভ করিব।'

তুলসীদাসের জীবনীর আর কিছু না থাকিলেও, তাঁহার রচিত দোঁহা হইতেই তাঁহার অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। সন্ন্যাস অবস্থায় তাঁহার মুখ দিয়া যে সকল উপদেশবাক্য বাহির হইয়াছিল, তাহাই তাঁহার দোঁহা—তাহাই তাঁহার পরিচায়ক। তাঁহার কয়েকটি দোঁহা এই স্থানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

দোঁহা

(১)

দয়া ধরমকি মূল হৈঁয়, নরক মূল অভিমান।
তুলসী মৎ ছোড়িয়ে দয়া, যও কণ্ঠাগত জান॥

ধর্মের মূল দয়া এবং নরকের মূল অভিমান; অতএব, হে তুলসীদাস! তুমি কণ্ঠাগত-প্রাণ হইলেও দয়াপ্রবৃত্তিকে পরিত্যাগ করিও না।

(২)

এক রাহমে হোতে হৈঁয়, তুলসী মূত আউর পূত।
রাম ভজে তো পূতাহি, নহি মূতকা মূত॥

হে তুলসীদাস! মূত্র ও পুত্র একপথেই বহির্গত হয়, তবে যে পুত্র ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের ভজনা করে, সেই পুত্র ; নতুবা অধার্মিক মূর্খ পুত্র মূতেরও মূত্ অর্থাৎ মূত্ হইতেও অপকৃষ্ট।

(৩)

রাম্ রাম্ সব কোই কহে, ঠক্‌ঠাকুরক্যা চোর।
বিনা প্রেম্‌সে রীঝাৎ নহি, তুলসী নন্দকিশোর॥

হে তুলসীদাস! কি দুষ্ট, কি শিষ্ট, কি চোর, সকলেই রাম রাম বলিয়া থাকে সত্য ; কিন্তু তাহাতে তাহাদের তাদৃশ ফললাভ হয় না ; যেহেতু প্রেম ও ভক্তি বিনা নন্দকিশোর শ্রীকৃষ্ণ কখনও প্রসন্ন হন না॥

(৪)

তুলসী ইযে সংসার মে, কাঁহা সো ভক্তি ভেট।
তিন বাতসে নট্‌পটি হে'য়, দাম্‌ড়ি চাম্‌ড়ি পেট॥

হে তুলসীদাস! যখন অর্থ, শিশু ও উদর লইয়াই সকলে ব্যতিব্যস্ত, তখন এই সংসারে কিরূপে ভক্তিদেবীর সহিত সাক্ষাৎ হইবে ?

(৫)

সব হি ঘট্‌মে হরি বসে যে'ও গিরিস্থতমে জ্যোতি।
জ্ঞানগুরু চক্‌মক্ বিনা কৈসে প্রকট হোতি॥

সকল জীবের দেহতেই হরি আত্মরূপে বাস করিতেছেন। যেমন প্রস্তরখণ্ডমাত্রেই অগ্নি বাস করে, কিন্তু লোহের আঘাত ব্যতীত সেই অগ্নি প্রকাশ পায় না, সেইরূপ জ্ঞান ও গুরূপদেশরূপ চক্‌মকি ভিন্ন কি প্রকারে সেই আত্মা প্রকাশ পাইতে পারেন ?

(৬)

এক্‌ঘড়ি আধিঘড়ি আধিহুমে আধ।
তুলসী সঙ্গৎ সন্তাক হরে কোটি অপরাধ॥

হে তুলসীদাস! এক মুহূর্ত, আধমুহূর্ত অথবা অর্ধার্ধ মুহূর্তের জন্য যিনি সাধুসঙ্গ করেন, তিনি কোটী কোটী অপরাধ হরণ করেন।

(৭)

শোতে শোতে ক্যা করো ভাই ওঠ ভজো মুরার।
অ্যাসে দিন আতে হে'য় লম্বা পা সার॥

হে ভাই! শয়ন করিয়া কি কর, উঠ, কৃষ্ণ-ভজন কর ; অগ্রে তোমার এমন দিন আসিতেছে, পদদ্বয় প্রসারণ করিয়া শয়ন করিতে হইবে।

(৮)

তুলসী ইয়ে সংসারমে পাঁচো রতম হেয় সার।
সাধুসঙ্গ হরিকথা দয়া দীন উপকার॥

হে তুলসীদাস! এই জগৎ-সংসারে সাধুসঙ্গ, হরিগুণগান, সর্বজীবে দয়া, দীন-ভাবাবলম্বন ও পরোপকার, এই পাঁচটি রত্নই সার।

(৯)

সব বন্ তুলসী ভেয়ো, সব পাহাড় শালগেরাম।
সব পানি গঙ্গা ভেয়ো, যেস্ ঘট্‌মে বিবাজে রাম ॥

যাহার হৃদয়ে রাম বিরাজিত রহিয়াছেন, তাহার পক্ষে সকল বনই তুলসী-বন, সকল প্রস্তরই শালগ্রাম ও সকল জলই গঙ্গাজল।

(১০)

তুলসী মিঠে বচন সোঁ সুখ উপজত চঁহুওর।
বশীকরণ মন্ত্র হেঁ্য পরিহব বচন কঠোর ॥

হে তুলসীদাস! সুমিষ্ট বচন হইতে সুখ উৎপন্ন হয় এবং ঐরূপ বচনই বশীকরণ মন্ত্র; অতএব কঠোর বচন পরিহার করা সর্বতোভাবে বিধেয়।

(১১)

তোম্ জ্যায়সা রাম পর, তোম্‌সে ত্যায়সা রাম।
ডাহিনে যাওতো ডাহিনে যায়, বামে যাওতো বাম ॥

অর্থাৎ যদি অনুকূল ভাবে ভজনা কর, তিনি তোমার প্রতি অনুকূল, প্রতিকূলভাবে ভজনা কর, তিনি তোমার প্রতি প্রতিকূল হইবেন।

(১২)

যো যাকো শরণ লিয়ে, সো রখে তাকো লাজ।
উলট্ জলে মছলি চলে, বহি যায় গজরাজ ॥

যে ব্যক্তি যাঁহার শরণাপন্ন হয়, তিনি অবশ্যই তাহার মানরক্ষা করেন। দেখ, জল-শরণাগত মীনসকল অনায়াসে উজান-প্রবাহকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়, কিন্তু বৃহৎকায় গজরাজ কখনই সমর্থ হইতে পারে না।

(১৩)

তুলসী জগৎমে আইয়ে, সবসে মিলিয়া ধায়।
না জানে কোন্ ভেক্‌সে নারায়ণ মিল যায় ॥

তুলসী জগতে আসিয়া সকলের সহিত মিলিয়া চলিতেছেন। কারণ, ইহা জানেন না যে, নারায়ণ কোন্ ভেকে অর্থাৎ কিরূপে আমায় দর্শন দিবেন।

(১৪)

নির্গুণ হেয় সো পিতা হামারা, সগুণ হেয় মাহতারি।
কাকে নিন্দো কাকে বন্দো দুয়ো পাল্লা ভারি ॥

যিনি নির্গুণ, তিনি আমার পিতা; যিনি সগুণ, তিনি আমার মাতা; অতএব কাহাকেই বা নিন্দা করি, আর কাহাকেই বা বন্দনা করি। আমার পক্ষে দুই-ই বলবৎ বলিয়া প্রতিপাদিত হইতেছে।

(১৫)

দিন্‌কা মোহিনী, রাতকা বাঘিনী, পলক্ পলক্ লহু চোষে।
দুনিয়া সব বাউরা হোকে, ঘর ঘর বাঘিনী পোষে ॥

দিবসে মোহিনী ও রাত্রে বাঘিনীস্বরূপ হইয়া যাহারা প্রতিপলে রক্ত চোষণ করে, জগতের লোকসকল পাগল হইয়া ঘরে ঘরে সেই বাঘিনীসকলকে পোষণ করিতেছে।

(১৬)

শ্রীমন্তকো কণ্টক ফুঁকে দরদ্ পুছে সব কোই।
দুখিয়া পাহারসে গীরে, বাৎ না পুছে কোই॥

ধনবান্ ব্যক্তির যদি এক সামান্য কণ্টক বিদ্ধ হয়, আদরপূর্বক সকলে বেদনার কথা জিজ্ঞাসা করে, কিন্তু নিঃসহায় গরীব ব্যক্তি যদি পাহাড় হইতে পতিত হয়, তাহা হইলে কোন ব্যক্তি কোন কথাই জিজ্ঞাসা করে না।

(১৭)

তুলসী জগমে আকর করলে দোনো কাম।
দেনেকো টুক্‌রা ভালা, লেনেকো হরিনাম॥

হে তুলসীদাস! জগতে আগমন করিয়া দুইটি কার্য করিয়া লও—দান বিষয়ে ক্ষুধিতকে এক টুক্‌রা রুটী দেওয়া ভাল, আর গ্রহণ বিষয়ে হরিনাম লওয়া পরম লাভ।

(১৮)

তুলসী ইয়ে জগমে আয়কে কোন্ ভজো সোম্‌রৎ।
এক কাঞ্চন্ ও কুচন্‌কো কিনন্ পসারা হৎ॥

হে তুলসীদাস! এই জগতে আসিয়া প্রায় এবংবিধ কোন ব্যক্তিকে দেখা যায় না যে, স্ত্রীলোকের কুচের প্রতি ও কাঞ্চনের প্রতি হস্ত প্রসারণ না করিয়াছে।

(১৯)

কৈ কহেঁ হরি দূর হেঁয়, হরি হেঁয় হৃদয়ে মা।
অন্তরটাটী কপটকে, তাসো সুঝে না॥

কোন কোন ব্যক্তি বলেন, হরি দূরে আছেন, কিন্তু হরি আমার হৃদয়ে অবস্থিতি করিতেছেন। অন্তর কপটতারূপ আবরণে আবৃত রহিয়াছে বলিয়া তাঁহাকে জানিতে পারা যাইতেছে না।

(২০)

যে তুলসীদাস রমণীহৃদয়কে বড় ভালবাসিতেন, এবং ক্ষণেকের জন্য আপনার প্রিয়তমার বিচ্ছেদ-যাতনা সহ্য করিতে পারিতেন না, সেই তুলসীদাস স্ত্রীর প্রতি বিরাগ জন্মাইবার নিমিত্ত বলিয়াছেন,—

জয়সে পুতলী কাঠকো, পুতলী মাসময় নারী।
অস্থি-নাড়ী-মল-মূত্রময়, যন্ত্রিত নিন্দিত ভাবি॥

যেমন কাষ্ঠ-নির্মিত পুত্তলি, সেইরূপ মাংসময় অস্থি-নাড়ী-মল-মূত্র-কৃমিপ্রচুর অতিনিন্দিত যন্ত্রের ন্যায় স্ত্রীগণের শোভা কিছুমাত্র নাই, যাহা অবিবেকীদিগকে মোহিত করিয়া থাকে।

—:o:—

মহাত্মা কবীর দাস

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে বারাণসীর নিকটস্থ কোন ক্ষুদ্র গ্রামে মহাত্মা কবীর* জন্মগ্রহণ করেন। ই'হার জন্মসম্বন্ধে এইরূপ প্রবাদ আছে যে, কোন ধার্মিকা বিধবা ব্রাহ্মণ-কন্যা একজন সাধুর পরিচর্যা করিতেন। ঐ সাধু, কন্যার সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে এই বলিয়া আশীর্বাদ করেন যে, 'তুমি পুত্রবতী হও।' ব্রাহ্মণ-কন্যা আশীর্বাদ শুনিয়া ভীতা ও চিন্তাযুক্তা হইয়া সাধুকে বলেন, 'মহাশয়! আমার সন্তান জন্মিলে সমাজে আমাকে নিন্দা করিবে, অতএব আপনি আমায় অন্যরূপ আশীর্বাদ করুন।' ব্রাহ্মণ-কন্যার কথা শুনিয়া মহাপুরুষ বলিলেন, 'আমি যাহা বলিয়া আশীর্বাদ করিয়াছি, তাহা মিথ্যা হইবে না; তবে তুমি নিষ্কলঙ্কভাবে সমাজে থাকিতে পারিবে, সকলেই তোমায় শ্রদ্ধা করিবে।' কালক্রমে উক্ত ব্রাহ্মণীর সুলক্ষণযুক্ত সর্বাঙ্গসুন্দর একটি সন্তান জন্মে। ব্রাহ্মণের ঘরে বিধবার সন্তান হইয়াছে শুনিলে লোকে কত লাঞ্ছনা করিবে, এইরূপ চিন্তা করিয়া ঐ বিধবা, শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার পরেই তাহাকে এক লতাগুল্মপরিবেষ্টিত পুষ্করিণীর তীরে নিক্ষেপ করেন। ইলু নামক একজন জোলা জাতীয় মুসলমান, দৈবাৎ ঐ পুষ্করিণীর তট দিয়া যাইতেছিল; সে তথায় সদ্যোজাত শিশুর ক্রন্দন-রব শুনিতে পাইয়া অনুসন্ধান দ্বারা উহাকে বাহির করে ও দয়ার্দ্র-হৃদয়ে শিশুকে উত্তোলন করিয়া গৃহে লইয়া আসে। উক্ত জোলার সন্তানাদি না থাকায় সে উহাকে পুত্রবৎ পালন করে ও নামকরণসময়ে উহার নাম কবীর রাখে।

কবীর ক্রমশঃ বয়োবৃদ্ধিসহকারে স্বজাতীয় ব্যবসায়ে বিশেষ উন্নতি লাভ করেন। ঐ সময়ে জোলাদিগের রীতি অনুসারে ই'হার বিবাহ হইয়াছিল; কবীরের এক পুত্র ছিল, তাহার নাম কমাল। কমাল কবীরের ঔরসজাত পুত্র নহে। ইহার সম্বন্ধে এরূপ জনশ্রুতি আছে যে, এক দিবসকালে কবীর বারাণসীর নিকট গঙ্গাতীর দিয়া যাইতেছিলেন, এরূপ সময়ে কতকগুলি শৃগালের রব শুনিতে পান। কবীর দৈবশক্তিবলে পশুপক্ষীদিগের রবের মর্মার্থ বুঝিতে পারিতেন। তিনি শৃগালদিগের

---

* হিন্দি ভক্তমাল গ্রন্থকার বলেন, ১২০৫ শতাব্দীতে কবীর জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৫০৫ সংবতে একাদশী তিথিতে লাগক নামক গ্রামে কবীরের মৃত্যু হয়। ভক্তমাল-লেখকের মতে কবীরের জীবনকাল তিনশত বৎসর। কিন্তু তিনশত বৎসর জীবিত ছিলেন কি না, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। তবে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, ১৫০৫ সংবতে কবীরের বর্তমানতা অসম্ভবপর নহে। কারণ ভক্তমাল-লেখক বলেন, কবীর স্বধর্ম (অর্থাৎ মুসলমানধর্ম) পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করায়, কবীরের মাতা সেকেন্দার শাহের নিকট অভিযোগ করেন। সেকেন্দার শাহ ১৫০০ সংবতে রাজ্য প্রাপ্ত হন, সুতরাং এই সময়ে যে কবীর জীবিত ছিলেন, তাহা অনুমিত হইতে পারে।

চীৎকারে বুঝিলেন, উহারা বলিতেছে, 'গঙ্গার জলে যে শবটি ভাসিয়া যাইতেছে, উহা তটে আসিয়া লাগিলে, আমরা ভক্ষণ করিয়া পরিতৃপ্ত হই।' কবীর শৃগালদিগের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া দৈবশক্তি সাহায্যে উহাকে নদীতটে আনিয়া দেন। শব নদীতটে নীত হইলে মৎস্যগণ বলিতে লাগিল, 'আমাদের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়া কে এরূপ অন্যায় কাজ করিল ?' মৎস্যদিগের এইরূপ উক্তি শুনিয়া তিনি ইহা স্থির করিলেন যে, শবটি উহাদের মধ্যে কাহাকেও না দেওয়াই কর্তব্য ; আমি ইহাকে জীবিত করি। এইরূপে স্থির করিয়া, তিনি ঐ শবকে জীবিত করেন এবং 'কমাল' নাম প্রদান করিয়া পুত্ররূপে গ্রহণ করেন।

অতি অল্প বয়স হইতেই কবীরের মনে ধর্ম ও ভক্তিভাবের উদ্রেক হয়। ব্যবসায়ের লাভ হইতে সংসার যাত্রা নির্বাহ করিয়া যাহা উদ্বৃত্ত থাকিত, তাহা তিনি ভিক্ষার্থীদিগকে দান করিতেন। ঐ সময়ে রামানন্দ স্বামী* একজন উপযুক্ত ব্যক্তি ছিলেন। কবীর দীক্ষা গ্রহণ করিবার জন্য তাঁহার নিকটে গমন করেন ; কিন্তু রামানন্দ, 'ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কোন জাতিকে আমি শিষ্যত্বে গ্রহণ করি না', এই কথা বলায় কবীর ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়েন। কবীর যখন বুঝিলেন যে, স্বেচ্ছায় ইনি কখনও আমাকে দীক্ষা দিবেন না, তখন তিনি কৌশলের দ্বারা কার্যোদ্ধার করিতে মনস্থ করেন। এরূপ কথিত আছে যে, আন্দাজ এক প্রহর রাত্রি থাকিতে রামানন্দ স্বামী প্রত্যহ গঙ্গাস্নানে যাইতেন। এক দিবস কবীর স্বামীজীর স্নানের ঘাটে যাইয়া মৃতবৎ পড়িয়া রহিলেন। দৈববশতঃ ঐ সময়ে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকায়, নিকটস্থ বস্তু

---

* বৈষ্ণবদিগের মধ্যে রামানুজ, বিষ্ণুস্বামী, মাধবাচার্য ও নিম্বাদিত্য এই চারিটি সম্প্রদায় আছে, তম্মধ্যে রামানুজ সম্প্রদায়ই সর্বশ্রেষ্ঠ। রামানন্দ, রামানুজ স্বামীর প্রধান শিষ্য ছিলেন।

যে সময়ে ভারতবিখ্যাত পরিব্রাজক শঙ্করাচার্য আপনার পাণ্ডিত্য ও বাক্‌পটুতাপ্রভাবে বৌদ্ধদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করেন, তাহার পর ৭/৮ শতাব্দী অতীত হইলে, মান্দ্রাজ নগরের উত্তর-পশ্চিম পেরুম্বুর গ্রামে কেশবাচার্য নামক একজন ব্রাহ্মণের ঔরসে রামানুজাচার্যের জন্ম হয়। যেমন বঙ্গদেশে চৈতন্যদেব ঈশ্বর-অবতার বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হন, ইনিও দাক্ষিণাত্যে সেইরূপ বিষ্ণুর অবতার বলিয়া খ্যাত আছেন।

রামানুজ কাঞ্চীপুরে বিদ্যাধ্যয়ন করেন, এবং তথায় প্রথমতঃ আপনার মত-প্রচারে প্রবৃত্ত হন। ইহার পর তিনি কাবেরী নদীর তীরে শ্রীরঙ্গে অবস্থিতি করিয়া রঙ্গনাথের সেবা করেন ও আপনার মতপ্রতিপাদক বিবিধ গ্রন্থ রচনা করেন। ইহার কিয়দ্দিবস পরে রামানুজ দিগ্বিজয় করিতে বহির্গত হইয়া অনেক স্থানে আপনার মত প্রচার করিয়া আসেন।

রামানুজ আপনার প্রচার-কার্য সমাধা করিয়া যখন শ্রীরঙ্গে প্রত্যাগত হন, সেই সময়ে শৈব ও বৈষ্ণবদের মধ্যে ঘোর বিবাদ উপস্থিত হয়। শ্রীরঙ্গের রাজা কৃমিকোণ্ড শিবভক্ত ছিলেন। তিনি আপন অধিকারস্থ যাবতীয় লোককে স্বীয় উপাস্য-দেবের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া অঙ্গীকারপত্র প্রদান করিতে আদেশ প্রচার করিলেন, কিন্তু রামানুজাচার্য ব্যতীত অন্যান্য সকলেই রাজ-আজ্ঞা প্রতিপালন

ভালরূপ দেখিতে পাইবার সুবিধা ছিল না ; যথাসময়ে রামানন্দ স্নান করিতে আসিয়া কবীরকে স্পর্শ করিয়া ফেলেন। তাঁহার চরণে কবীর স্পর্শিত হইলে, তিনি কবীরকে শব মনে করিয়া 'রাম কহ, রাম কহ' এই বলিয়া উঠেন। কবীর রামানন্দ-মুখ-বিনিঃসৃত মূলমন্ত্র 'রামনাম' গ্রহণ করিয়া, 'গুরুদেব ! এই আমার দীক্ষা হইল', এই কথা বলিয়া গুরুকে প্রণাম করিয়া সেই স্থান হইতে গৃহে প্রত্যাগমন করেন।

কবীর বাটী আসিয়া মস্তকমুণ্ডন এবং মালা ও তিলক ধারণ করেন। কবীরের মাতা পুত্রের এইরূপ হিন্দুবেশ দেখিয়া তাঁহাকে বলেন, 'তোমায় এরূপ কে পাগল সাজাইল ?' মাতার কথা শুনিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, 'আমি পাগল হই নাই, রামানন্দ স্বামীর শিষ্য হইয়াছি।' কবীরের মাতা মনে করিয়াছিলেন যে, রামানন্দ স্বামী তাঁহার ছেলেকে ফুসলাইয়া হিন্দু করিয়াছে। সেই জন্য তিনি তৎকালীন দিল্লীর বাদশাহ সেকেন্দার শাহ লোদীর নিকট পুত্রের নামে অভিযোগ করেন। বাদশাহ কবীরকে আহ্বান করিলে, তিনি তিলক, তুলসীর মালা ধারণ করিয়া তাঁহার সমীপে উপস্থিত হন। রাজসরকারের লোকেরা কবীরকে ভূমিষ্ঠ হইয়া অভিবাদন করিতে আদেশ করিলে, তিনি তাহা অস্বীকার করেন এবং বলেন যে, 'রাম ভিন্ন আমি কাহাকেও জানি না।' বাদশাহ কবীরের এরূপ ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে কারাগারে নিক্ষেপ করেন। পরে তিনি কবীরের ধর্মভাব দর্শন করিয়া ও তাঁহার যুক্তিযুক্ত তর্কে পরাজিত হইয়া ধর্মমত প্রচারের জন্য স্বাধীনতা দেন।

সকলেই জানিত, রামানন্দ যবন স্পর্শ করিতেন না ; কিন্তু যখন পল্লীবাসীরা এই কথা শ্রবণ করিলেন যে, রামানন্দ কবীরকে শিষ্য করিয়াছেন, তখন সকলেই আশ্চর্যান্বিত হইয়া, রামানন্দের নিকট কবীরের কথা বলিতে গমন করেন। রামানন্দ

করিল। রাজ-আজ্ঞা লঙ্ঘন করায় রামানুজকে ধৃত করিবার জন্য কৃমিকোণ্ড লোক প্রেরণ করেন। কৃমিকোণ্ডের এই অন্যায় আচরণে রামানুজ শ্রীরঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া কর্ণাট-রাজার শরণাপন্ন হন। কর্ণাটপতি বেতালদেব বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন ; তিনি রামানুজের উপদেশাবলী শ্রবণ করিয়া তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন, এবং তাঁহার রাজবাটীতে একটি বিষ্ণুমন্দির স্থাপন করেন। সেই অবধি দাক্ষিণাত্যে এই সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। রামানুজের সংস্থাপিত মঠাদির মধ্যে এখনও দুই একটি বর্তমান আছে। উহাদের মধ্যে বদরিকাশ্রমমঠই সর্বপ্রধান।

রামানুজ-সম্প্রদায় শ্রীবৈষ্ণব-সম্প্রদায় নামে অভিহিত। ইঁহারা লক্ষ্মীনারায়ণের যুগলমূর্তির পূজা করিয়া থাকেন। এতদ্দেশীয় বৈষ্ণবদিগের সহিত শ্রীবৈষ্ণবদিগের একটু প্রভেদ আছে। ইঁহারা বিশেষরূপ জ্ঞাত না হইয়া দীক্ষা-গুরু মনোনীত করেন না এবং ব্রাহ্মণ-জাতীয় বৈষ্ণব ব্যতীত কেহই কাহাকে দীক্ষিত করিতে পারে না। 'ওঁ রামায় নমঃ' এই মন্ত্রে শ্রীবৈষ্ণবেরা দীক্ষিত হন—ইঁহাদের মতে আহারকালে পট্টবস্ত্র ব্যতীত কার্পাস-বস্ত্র পরিধান করিয়া আহার করা সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। 'দাসোহহং' বা 'দাসোঽস্মি', ইঁহাদিগের অভিবাদনের মন্ত্র। ইঁহারা ললাটাদি দ্বাদশ অঙ্গে দ্বারাবতীর গোপীচন্দনের তিলক লেপন করেন। রামানুজ আচার্য-কৃত শ্রীভাষ্য, বেদার্থ-সংগ্রহ, বেদান্ত-প্রদীপ এবং বেঙ্কটাচার্য-কৃত স্তোত্র-ভাষ্য প্রভৃতি গ্রন্থ ইঁহাদিগের সমধিক আদরণীয়।

এই ঘটনা শ্রবণ করিয়া কবীরকে আহ্বান করেন। কবীর তথায় উপস্থিত হইলে, রামানন্দ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলেন, 'কবীর! কবে আমি তোমাকে শিষ্য করিলাম?' তিনি গুরুদেবের প্রশ্ন শুনিয়া বলেন, 'প্রভু! সে দিবস স্নানের ঘাটে আমাকে স্পর্শ করিয়া 'রাম কহ' 'রাম কহ' বলিয়াছিলেন, তাহাতেই আমার দীক্ষা লওয়া হইয়াছে।' কবীরের এই প্রকার প্রগাঢ় ভক্তি দেখিয়া রামানন্দ স্বামী তাঁহাকে শিষ্যভাবে গ্রহণ করেন।

রামানন্দের বার জন শিষ্য ছিল, তম্মধ্যে কবীরই সর্বপ্রধান। কবীর অতিশয় বুদ্ধিমান্ ছিলেন। ইনি রামানন্দের শিষ্যত্বে দীক্ষিত হইবার পর হইতেই হিন্দুধর্ম-শাস্ত্র আলোচনা করিতেন। এইরূপ আলোচনার ফলে ইনি একজন মহা জ্ঞানী পুরুষ হইয়া উঠেন। ধর্মসম্বন্ধীয় কোন প্রশ্ন কবীরের মনে উদয় হইলেই তাহার মীমাংসার জন্য তিনি গুরু রামানন্দের নিকট গমন করিতেন; কিন্তু বিচারে রামানন্দই পরাস্ত হইয়া যাইতেন। কবীর ভক্তদিগের ন্যায় ধর্মের বাহ্য চাক্‌চিক্য ব্যবহার করিতেন না। তিনি ঐ ধরনের সাধুসন্ন্যাসী দেখিলেই বলিতেন, 'জটা-বিভূতি ধারণ করলেই যে যোগসাধন হয়, তাহা নহে; প্রকৃত ভক্তি ব্যতীত ঈশ্বর আরাধনা হয় না।' কবীরের মুখে ঈদৃশ বাক্য শুনিয়া অনেকেই তাঁহার শত্রু হয় ও তাঁহাকে বিবিধ প্রকারে শাস্তি প্রদান করে; কিন্তু ভক্তবৎসল দয়াময়ের দয়ায় তিনি সকল প্রকার শাস্তির হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করেন। প্রতি তর্কে রামানন্দ পরাস্ত হইতে থাকায় গুরু-শিষ্যের মধ্যে মনোমালিন্য ঘটে। এরূপ অবস্থায় কবীর রামানন্দের সম্প্রদায় পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় মত প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। রামানন্দ জাতিবিচার করিতেন, কবীর জাতিবিচার ভঙ্গ করিয়া সকলকেই ধর্মোপদেশ দিতেন। কবীরের মুখে গভীর ধর্মতত্ত্বসকল শুনিয়া অনেকেই তাঁহার শিষ্য হয়। ঐ শিষ্যেরা 'কবীরপন্থী' নামে অভিহিত। এরূপ কথিত আছে যে, কটক, বোম্বাই, শ্রীক্ষেত্র এবং বিহার অঞ্চলে তিনি বহুসংখ্যক মঠ স্থাপন করিয়াছিলেন। অদ্যাবধি কবীরপন্থীদিগের দ্বাদশটি মঠ বর্তমান রহিয়াছে। তম্মধ্যে বারাণসীতে 'কবীর চৌরা' সর্বাপেক্ষা প্রধান।

কোন সময়ে কবীর প্রকাশ্য রাজপথে ভ্রমণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে দেখিতে পাইলেন, এক ব্যক্তি জাঁতা ঘুরাইয়া কলাই ভাঙ্গিতেছে। কলাইসকল চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া জাঁতার চারিদিকে পড়িয়া যাইতেছে। ইহা দেখিয়া কবীর তাঁহার মনকে গভীর বিষাদে নিমগ্ন করেন। তিনি বলিয়া উঠেন, 'হায়, সংসাররূপ চক্রাবর্তে যাতায়াত মনুষ্য কি এই সকল কলাই-এর ন্যায় চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া নরক পথের পথিক হয়? আর তাহাই বা বলি কেমন করিয়া? আমি ত দেখিলাম, এই জাঁতার মধ্যবর্তী কীলকাশ্রিত কলাইসকল অক্ষতশরীরে অবস্থান করিতেছে এবং চতুষ্পার্শ্বস্থ কলাইসকল চূর্ণীকৃত হইয়া চতুষ্পার্শ্বে নিপতিত হইতেছে। ইহাই প্রকৃত কথা যে, সংসার-চক্রের মধ্যবিন্দু কীলকরূপ ঈশ্বরকে যে ব্যক্তি আশ্রয় করিয়া থাকে, সেই ব্যক্তি সংসার-চক্রে পেষিত হয় না এবং সেই ব্যক্তিই অক্ষুণ্ণভাবে সাধু-জীবন যাপন করিয়া এই পৃথিবী হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে পারে।'

এক সময়ে কবীর কৌতূহলপরবশ হইয়া জনপদ ভ্রমণ করিতে গমন করেন। তিনি জনপদ হইতে স্বীয় আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করিলে, তাঁহার সহযাত্রিগণ জিজ্ঞাসা করেন, 'মহাশয়! আপনি জনপদে কি দেখিলেন?' কবীর ক্ষুব্ধমনে বলেন, 'জনপদের

দুর্দশার কথা তোমাদিগকে আর কি বলিব! বেদবিদ্ ব্রাহ্মণ-বংশীয়েরা বেদহীন ও জ্ঞানহীন হইয়া যাইতেছে; আর শূদ্র-জাতীয়েরা ব্রাহ্মণদিগের অধিকৃত গীতাদি পুস্তকের জ্ঞানচর্চা করিতেছে। প্রবঞ্চকগণ স্বচ্ছন্দে জীবিকা নির্বাহ করিতেছে, কিন্তু সাধু ব্যক্তিদিগের অন্ন জুটিতেছে না। সাধ্বী ও পতিব্রতার অদৃষ্টে একখানি সামান্য বস্ত্রও মিলে না, কিন্তু ব্যভিচারীণীগণ বহুমূল্য বস্ত্র পরিধান করিয়া সুখী হইতেছে। পণ্ডিতদিগের উপদেশানুসারে কেহই চলে না, কেহই তাঁহাদের সমাদর করে না, কিন্তু কপটগণ সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। দুগ্ধ-বিক্রেতারা গলিতে গলিতে ভ্রমণ করিয়া, তাহাদের আনীত দুগ্ধ বিক্রয় করিতে পারে না, আর মদের দোকানে এত ভিড় যে, মদ-বিক্রেতারা অক্লেশে তাহা বিক্রয় করিতে সমর্থ হইতেছে।'

কবীর কয়েকখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে 'বীজক' সর্বপ্রধান। এই গ্রন্থে তিনি তাঁহার ধর্মবিষয়ক মতামত লিখিয়া গিয়াছেন। ইঁহার গুরু রামানন্দ ও শৈব সম্প্রদায়ের বিখ্যাত প্রতিষ্ঠাতা গোরক্ষনাথ কবীরের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। এতদুভয়ের সহিত ইঁহার যে ধর্মসম্বন্ধীয় তর্কবিতর্ক হইয়াছিল, সেই সকল তর্ক-বিতর্কের বিষয় যে পুঁথিতে লেখা ছিল, তাহার একখানির নাম 'রামানন্দকী গোষ্ঠী' ও অপরখানির নাম 'গোরক্ষনাথকী গোষ্ঠী।'

ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে গোরক্ষপুরের মগর গ্রামে কবীর দেহত্যাগ করেন। ইঁহার মৃত্যু হইলে শবদেহ বস্ত্রাচ্ছাদিত করা হয়। ইহার পর শিষ্যদিগের মধ্যে একটা ভয়ানক গোলযোগ উপস্থিত হয়। হিন্দু-শিষ্যেরা বলেন, 'দেহ দাহ করা যাউক,' এবং মুসলমান শিষ্যেরা বলেন, 'গুরুর দেহ কবরস্থ করা হউক।' ক্রমে দাঙ্গা হইবার উপক্রম হইলে, হঠাৎ এক ব্যক্তি বলিয়া উঠিলেন, 'বোধ হয় বস্ত্রাবৃত শবদেহ নাই, কারণ, কেবল বস্ত্রখানিই পড়িয়া রহিয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে।' তাঁহার কথায় শবদেহের বস্ত্রাবরণ খুলিয়া সকলেই দেখিলেন, শবের পরিবর্তে একটি পুষ্প রহিয়াছে। তখন সহজেই বিবাদ মিটিয়া যায়। হিন্দু-শিষ্যগণ ঐ পুষ্পের অর্ধাংশ লইয়া কাশ্মীরে সৎকার করেন, এবং মুসলমান শিষ্যগণ অপরার্ধ লইয়া ঐ মগর গ্রামে কবরস্থ করেন।

কবীর-রচিত কয়েকটি দোহা

(১)

কবীর ভলি ভৈয়ি যো গুরু মিলে, নেহিতো হোতি হানি।
দীপক্ জ্যোতি পতঙ্গ যেঁও, পরতো পুরা জানি॥

কবীর, ক=মস্তক, ব=কণ্ঠ. ঈ=শক্তি, র=বহ্নিবীজ, মস্তক ও কণ্ঠ শক্তি পূর্বক কূটস্থ ব্রহ্মে অনেকক্ষণ থাকায় যে অবস্থা হয়, তাহার নাম কবীর। কবীর বলিতেছেন যে, বড় ভাল হইয়াছে, গুরু পাওয়া গিয়াছে, (গুরু=যিনি অন্ধকার হইতে আলোকে লইয়া যান অর্থাৎ আত্মা) নতুবা হানি হইত অর্থাৎ জন্মমৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যাইত না। জন্মমৃত্যু হইতে অব্যাহতি পাইবার নিমিত্ত যদি এই শরীরে আত্মজ্ঞান না হইল, তবেই হানি হইল। এই হানি কেমন, যেমন দীপের জ্যোতিঃ দেখিয়া পতঙ্গসকল উহাতে পড়ে—কারণ, তাহারা ভাবে যে, ইহার মত পূর্ণ আলো আর নাই, সুতরাং মোহিত হইয়া উহাতে পড়ে এবং পুড়িয়া মরে, সেইরূপ মনুষ্যসকল আত্মাকে না

দেখিতে পাইয়া এই সাংসারিক মিথ্যা জাঁকজমকে পুড়িয়া মরিতেছে। তাহারা ভাবে যে, পৃথিবীর আমোদ-প্রমোদই পূর্ণ সুখের বিষয়। ইহা অপেক্ষা আর কিছুই ভাল নাই। কিন্তু গুরু পাওয়াতে ভ্রম বুঝিতে পারায় ঐরূপ হানি হইতে অব্যাহতি পাওয়া গেল।

(২)

কবীর জ্ঞান সমাগম্ প্রেম সুখ্, দয়া ভক্তি বিশ্বাস্।
গুরু সেবাতে পাইয়ে, সৎগুরু শব্দ নেবাস্॥

কবীর। আত্মজ্ঞান সমানরূপ স্থিতিই প্রেমের সুখ। এইরূপ নিজে সুখী হইয়া অন্যে যাহাতে সুখী হয়, তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হওয়ার নাম দয়া; এইরূপ দয়া করিয়া দেখিতে পায় যে, গুরু-বাক্যের দ্বারা আমি সুখী হইয়াছি এবং সুখী হইতেছি। ইহার দ্বারা ভক্তি বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এইরূপ ভক্তি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাওয়ায় বিশ্বাস উৎপন্ন হয়। বিশ্বাসই ধ্রুবজ্ঞান এবং ধ্রুবজ্ঞানই ব্রহ্ম। ইহা আত্মার অনুগামী হইলেই ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে।

(৩)

জিন জিন সম্বল না কিয়া অসপুর পাটন পায়।
ঝাল পরে দিন আথয়ে, সম্বল কিয়া ন জায়॥

এমন মানব-জীবন লাভ করিয়া, সময় থাকিতে যদি পরকালের জন্য কিছু সঞ্চয় না কর, তাহা হইলে জীবন-সূর্য অস্ত যাইবার সময়েও কিছু সঞ্চয় করিতে পারিবে না।

(৪)

জেজন ভীজে রামরস, বিকসিত কবহুঁ ন রূখ।
অনুভব ভাব ন দরশৈ, তে নর সুখ ন দুখ॥

ভক্তিরসে আপ্লুত ব্যক্তি কখনও মলিন বা বিশুষ্ক হন না। তিনি সর্বদাই প্রসন্ন। বাসনা তাঁহাকে স্পর্শ করে না, সুখ ও দুঃখে তাঁহার কোন পরিবর্তন নাই।

(৫)

সাধু ভয়া তে ক্যা ভয়া, জো নাহ্ঁ বোল বিচার।
হতে পরাঈ আত্মা, জীভ লিয়ে তলবার॥

সত্যাসত্য বিচার করিয়া যে ব্যক্তি কথা বলে না, সে যদি সাধুর বেশ ধারণ করে, তাহাতে কি লাভ? সে তাহার জিহ্বারূপ তরবারি দ্বারা অপরের আত্মাকে বিনষ্ট করে।

(৬)

জাকো গুরু হৈ আঁধারা, চেলা কহা করায়।
অন্ধে অন্ধ ঠেলিয়া, দোউ কূপ পরায়॥

গুরুই যাহাদের অন্ধ, তাহাদের শিষ্যেরা কি করিবে? অন্ধ, অন্ধ-কর্তৃক চালিত হইয়া উভয়েই কূপে পড়িয়া থাকে।

(৭)

পূরা সাহব সেইয়ে, সব বিধি পূরা হোই
ওছে নেহ লগাইয়ে, মূলো আবৈ খোই॥

যে ব্যক্তি সেই পূর্ণ পরমেশ্বরকে ধরিয়া থাকে, তাঁহার সকল দিকই পূর্ণ ; কিন্তু যে মন অসার বস্তুতে আসক্ত, তাহার মূল পর্যন্তও বিনষ্ট হইয়া যায়।

(৮)

ভক্তি পিয়ারী রামকী, জৈসে প্যারী আগি।
সারা পাটন জরি গয়া, ফিরি ফিরি লাবৈ মাগি ॥

অগ্নিস্পর্শে সমুদায় দেশ ধ্বংস হইয়া যাইলেও লোকে যেমন অগ্নির ব্যবহার ত্যাগ করে না, সেইরূপ ঈশ্বর-ভক্তি দ্বারা সাংসারিক সুখের বিশেষ হানি হইলেও, সাধু ব্যক্তিগণ প্রাণপণে তাহাই প্রার্থনা করিয়া থাকেন।

(৯)

শ্রোতা তো ঘরহী নহী, বক্তাবদৈ সো বাদ।
শ্রোতা বক্তা এক ঘর, তব কথনী কো স্বাদ ॥

যখন শ্রোতা না থাকে, তখন সেই স্থানে বক্তার বক্তৃতা বৃথা যায়। শ্রোতা এবং বক্তা একত্র হইলেই বক্তৃতার ফল হইয়া থাকে। অর্থাৎ ঈশ্বর আমাদের অন্তরে সর্বদা কথা বলিতেছেন, কিন্তু আমাদের মন ভিতরে না থাকায়, তাঁহার উপদেশ বৃথা নষ্ট হইতেছে। মন ও ঈশ্বর একত্র হইলেই সেই উপদেশে ফল হয়।

(১০)

তৌলোঁ তারা জগমগৈ, জৌলোঁ উগৈ ন সূর।
তৌলোঁ জিয় জগ কর্মবশ, জৌলোঁ জ্ঞান ন পূর ॥

যতক্ষণ না সূর্যের উদয় হয়, ততক্ষণই তারকামালা ঝক্‌মক্ করিতে থাকে। সেইরূপ যতক্ষণ না মানবের ব্রহ্মজ্ঞান অন্তরে প্রকাশিত হয়, ততক্ষণই তাহার বিষয়-জ্ঞান কার্যকরী থাকে।

(১১)

জৈসী লাগী ঔরকী, তৈসী নিবহৈ ছোর।
কৌড়ী কৌড়ী জোরিকে, পূজ্যো লক্ষ করোর ॥

প্রথম-হৃদয়ে যেটুকু ধর্মভাবের বিকাশ হয়, সেইটুকুই অল্পে অল্পে চিরজীবন ধরিয়া বর্ধিত কর। কড়ি কড়ি করিয়া সঞ্চয় করিলে শেষে লক্ষ মুদ্রা হইয়া থাকে।

(১২)

সাঁচ বরোবর তপ নহিঁ, ঝূঁট বরোবর পাপ।
জাকে ভিতর সাঁচ হৈ, তাকে ভিতর আপ ॥

সত্যের সমান আর পুণ্য নাই, মিথ্যার সমান পাপ নাই। যাহার অন্তর সত্যভাবে পূর্ণ, তাহাতে তিনি (ঈশ্বর) স্বয়ং বাস করেন।

(১৩)

সাধু হোনা চহহু জো, পক্কাকে সঙ্গ খেল।
কাচ্চা সরযোঁ পেরিকে, খরী ভয়া নহিঁ তেল ॥

তৈল অথবা খোল প্রস্তুত করিতে হইলে কাঁচা সরিষা হইতে যেমন তাহা প্রস্তুত হয় না (পাকা সরিষারই আবশ্যক হয়), সাধু হইতে হইলে সেইরূপ সুপক্ক ভাবরাশি দ্বারা জীবন পরিচালিত করিতে হয়।

(১৪)

জাকী জিহ্বা বন্দ নাহি, হৃদযা নাহি সাঁচ।
তাকে সংগ্ ন লাগিয়া, ঘালে বটিয়া কাঁচ ॥

যাহার জিহ্বা সংযত নহে এবং হৃদয় সত্যময় নহে, তাহাকে সঙ্গী করিও না, কারণ, সে তোমাকে মন্দপথে লইয়া যাইবে।

(১৫)

হীরা পরা বজারমে, রহা ছার লপটায়।
বহুতক মুরখ চলিগযে, পারিখ লিয়া উঠায় ॥

বাজারে ধূলি-রাশির মধ্যে হীরক-খণ্ড পড়িয়া রহিয়াছে, সহস্র সহস্র মূর্খ যাতায়াত করিতেছে, কিন্তু যে ব্যক্তি জহুরী, সে তাহা উঠাইয়া লয়।

(১৬)

স্বপনে সোয়া মানবা, খোলি দেখৈ যো নৈন।
জীব পরা বহু লুটমে, না কছু লেন ন দৈন ॥

মানব মোহ-নিদ্রায় অচেতন থাকিয়া স্বপ্নেই দিন অতিবাহিত করিতেছে। যদি একবার নয়ন উন্মীলন করে, তাহা হইলে সে দেখিতে পায় যে, তাহার জীবন অতি অকিঞ্চিৎকর কার্যেই পড়িয়া রহিয়াছে এবং তাহাতে সে কোনরূপেই উপকৃত হইতে পারিতেছে না।

(১৭)

মায়া ত্যাগে ক্যা ভয়া, মান তজা নাহি জায।
জেহি মানে মুনিবর ঠগে, মান সবন কো খায় ॥

শুধু মায়া ত্যাগ করিলে কি হইবে, যদি মান (পদমর্যাদা) ত্যাগ করা না যায়। যে মানে কত মুনিঋষিরও পতন হইয়াছে, সেই মানই সকলকে বিনষ্ট করিতেছে।

(১৮)

লোহেকেরী নাবরী, পাহন গরুয়া ভার।
শিরমে বিষকী মোটরী, উতরণ্ চাহে পার ॥

লৌহের ন্যায় গুরুভারবিশিষ্ট দেহ-তরীতে মন-প্রস্তর বোঝাই করিয়া এবং বিষয়-বিষের ভাণ্ড মস্তকে লইয়া জীবসকল কোন্ ভরসায় সংসার-সাগর পার হইতে চায়।

(১৯)

সাবন কেরা মেহরা, বুন্দ পরা অসমান।
সব দুনিয়া বৈষ্ণব ভঈ, গুরু ন লাগ্যো কাণ।

শ্রাবণ মাসের বারি-বিন্দু আকাশেই থাকিয়া গেলে অর্থাৎ বর্ষণ না হইলে যেমন

তাহার দ্বারা কোনই ফল হয় না, সেইরূপ উপদেশ-রাশি যদি কেবল শোনাই থাকে, হৃদয়কে স্পর্শ না করে, তাহা হইলে তাহাতে ধর্মসমাজভুক্ত হওয়া যায় বটে, কিন্তু সদ্‌গুরুর (ঈশ্বরের) সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না।

(২০)

অর্ব খর্ব লোঁ দর্ব হৈ, উদয় অস্ত লোঁ রাজ।
ভক্তি মহাতম না তুলৈ, এ সব কৌনে কাজ ॥

যদি ধনের সংখ্যা খর্ব, নিখর্ব পরিমাণ হয় এবং উদয়াস্তব্যাপী সমুদায় পৃথিবী রাজত্ব হয়, তথাপিও তাহা ভক্তি-মাহাত্ম্যের তুলনায় কিছুই নহে, তবে এই (অসার) ধনে মানে কি প্রয়োজন ?

গুরু নানক

লাহোরের* অন্তর্গত রাভী নদীর তীরবর্তী ভাটি নামক জনপদের মধ্যে তালওয়ান্দি গ্রামে কালু বেদী নামক এক ব্যক্তি বাস করিতেন। তিনি জাতিতে ক্ষত্রিয় ছিলেন। বেদী তাঁহাদিগের উপাধি। এরূপ কথিত আছে যে, সূর্যবংশীয় সীতা-পতি রামচন্দ্র হইতে এই বেদীবংশের উদ্ভব। যখন কুলরাও লাহোরের রাজা হন, তাঁহার ভ্রাতা কুলপৎ সে সময় কুশরের রাজা। রাজ্যবিস্তৃতি লোভপরবশ কুলপৎ নিজ ভ্রাতাকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া লাহোর অধিকার করেন। কুলরাও অনন্যোপায় হইয়া দাক্ষিণাত্যের রাজা অমৃতের শরণাপন্ন হন। অমৃত তাঁহার প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া অতি যত্নে ও সমাদরে নিজ বাটীতে স্থান দেন এবং নিজ কন্যার সহিত কুলরাওর বিবাহ দেন। অমৃতের মৃত্যুর পর কুলরাও তাঁহার সিংহাসন অধিকার করেন। পরে তাঁহার পুত্র সোদীরাও রাজা হইয়া অনেক রাজ্য জয় করেন। পিতার অপমান এবং পরাজয়ের কথা শুনিয়া তিনি কুলপতির সহিত যুদ্ধ করিবার সঙ্কল্প করেন এবং কুলপৎকে পরাস্ত করিয়া, পুনরায় লাহোরের পিতৃসিংহাসন অধিকার করেন।

কুলপৎ ৺কাশীধামে পলায়ন করিয়া জীবনের অবশিষ্টাংশ সময় বেদপাঠে অতিবাহিত করেন। বেদে এই মর্মের এক উপদেশ আছে দেখিতে পাইলেন, 'পীড়ন মহাপাপ, যে পীড়ন করে, তাহার নিকট দয়ার আশা করা অন্যায়।' কুলপৎ তাঁহার ভ্রাতার প্রতি পূর্বব্যবহারের বিষয় স্মরণ করিয়া সোদীরাওর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবেন মনস্থ করিলেন। লাহোরে পৌঁছিয়া তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রের নিকট বেদ পাঠ করিলেন এবং তাঁহাকে সিংহাসন দিয়া আপন রাজ্যে চলিয়া গেলেন। কুলপৎ বেদ পড়িয়া দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহার বংশাবলী সেই হইতে বেদীনামে অভিহিত হয়।

কালু, ত্রিপতা-নাম্নী এক সুলক্ষণসম্পন্না ক্ষত্রিয়া রমণীর পাণিগ্রহণ করেন। দারপরিগ্রহ করিবার বহুদিবস পরে তাঁহার এক কন্যা হয়। তিনি ঐ কন্যার নাম জানকী রাখেন। ইহার কয়েক বৎসর পরে ১৫২৬ সংবতে (১৪৬৯ খ্রীষ্টাব্দে) কার্তিকীপূর্ণিমার দ্বিপ্রহর রাত্রে তাঁহার একটি পুত্র জন্মে। পিতা সন্তানের নামকরণের জন্য

---

* ভগবান্ রামচন্দ্র অনুজ লক্ষ্মণের প্রতি আপনার গর্ভিণী ভার্যা সীতাদেবীকে বনবাস দিবার অনুমতি করায়, তিনি অকৃতাপরাধা ভ্রাতৃবধূকে সঙ্গে লইয়া বাল্মীকি মুনির তপোবনে রাখিয়া আসেন। ঐ স্থানে সীতাদেবী লব ও কুশ নামে দুই পুত্র প্রসব করেন। কালক্রমে উভয় ভ্রাতা মহা বিক্রমশালী হইয়া উঠেন ও বহু রাজ্য অধিকার করিয়া স্ব স্ব নামে নগর প্রতিষ্ঠা করেন। লবের প্রতিষ্ঠিত নগরের নাম লাবর ও কুশের প্রতিষ্ঠিত নগরের নাম কুশর হয়। এক্ষণে ঐ সকল নাম পরিবর্তিত হইয়া লাহোর ও কশোর নামে খ্যাত হইয়াছে।

কুল-পুরোহিতকে আহ্বান করিলে, তিনি আসিয়া শিশুর অপরূপ রূপলাবণ্য ও অসাধারণ চিহ্নসকল দর্শন করিয়া জন্মতিথিনক্ষত্রাদি শ্রবণ করিয়া তাঁহার পিতাকে বলেন, 'এই শিশু আপনার কুল পবিত্র করিবে।' অনন্তর সেই কুল-পুরোহিত নবকুমারের নাম 'নানক নিরঙ্কারী' রাখিয়া প্রস্থান করেন।

শিশুকাল হইতেই সাধু মহাত্মার প্রতি নানকের অচলা ভক্তি ছিল। যখন নানকের বয়স পাঁচ বৎসর, তখন তাঁহার পিতা তাঁহাকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন। নানক অল্প দিবসের মধ্যেই স্বীয় অসাধারণ শক্তি দ্বারা সংস্কৃত, পারসী ও গণিত-বিদ্যাতে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। এরূপ কথিত আছে যে, তিনি নাকি কোন সময়ে শিক্ষক মহাশয়কে বলিয়াছিলেন,—

'শুন পাণ্ডে কেয়া লিখো জঞ্জালা।
লিখে রাম নাম গুরুমুখ গোপালা॥'

হে পণ্ডিত! কি বাজে অসার লেখা পড়া শিক্ষা দিতেছ? গুরুমুখ দ্বারা একমাত্র রামগোপাল নাম শিক্ষণীয়।

এক দিবস নানক নদীতে স্নান করিতে গিয়া দেখিতে পাইলেন যে, কয়েকজন ব্রাহ্মণ নদীতে স্নানাদি সমাপন করিয়া তর্পণ করিতেছেন। তখন তিনিও হস্তদ্বারা তীরস্থ ভূমিতে জলসেচন করিতে লাগিলেন। নানককে ঐরূপ করিতে দেখিয়া ব্রাহ্মণগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি জল লইয়া কি করিতেছ?' তাহাতে নানক বলিলেন, 'আপনারা জল লইয়া কি করিতেছেন, অগ্রে আমায় বলুন, তাহার পর আমি জল লইয়া কি করিতেছি বলিব।' ব্রাহ্মণগণ বলিলেন, 'আমরা আমাদের পরলোকস্থ পিতৃপুরুষগণকে জলদান করিতেছি।' তখন নানক বলিলেন, 'তালবণ্ডিতে আমার এক শাকের ক্ষেত্র আছে, আমি তাহাতেই জল দিতেছি।' তদুত্তরে ব্রাহ্মণগণ বলিলেন, 'তালবণ্ডিতে তোমার শাকের ক্ষেত্র আছে, তথায় এ জল কিরূপে যাইবে?' তখন নানক এই উক্তি করিলেন যে, 'আমি এখানে জলসেচন করিলে সামান্য দূর তালবণ্ডিতে যাইবে না যদি জানেন, তবে আপনারা এখানে জলসেচন করিলে, আপনাদের পরলোকস্থ পিতৃপুরুষগণ পাইবেন, এ কথা কিরূপে বিশ্বাস করেন?' নানকের কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণগণ বলিলেন, 'বাপু হে, তোমার এখনও শিক্ষার অনেক বাকি। ইহা আমাদের মন্ত্রপূত জল, মন্ত্রবলে কত অলৌকিক কার্য সম্পন্ন হইয়া থাকে, তাহা তোমার জানা নাই, সেইজন্যই তুমি আমাদিগকে ঐরূপ ভাবে পরিহাস করিলে?' নানক যখন বুঝিলেন যে, প্রকৃত পক্ষেই তাঁহার শিক্ষার অনেক বাকি আছে, তখন তিনি ধর্মসংক্রান্ত পুস্তকসকল পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন।

যথাসময়ে কালু বেদী নানকের উপনয়নসংস্কার সম্পন্ন করেন। প্রথমে তিনি যজ্ঞোপবীত ধারণ করিতে স্বীকৃত হন নাই, কিন্তু পরে লোকাচার রক্ষা এবং মাতাপিতা ও আত্মীয়-স্বজনগণের প্রীতি-সম্পাদনের জন্য তাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন। নানক উপবীত-ধারণকালে পুরোহিত মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'মহাশয়! এই সূত্র ধারণ করিলে কি হয়? যে ব্যক্তি কুকার্যে রত থাকে, এই সূত্র কি তাহাকে নরক হইতে রক্ষা করিতে পারিবে? যদি কার্পাসরূপ সন্তোষ-সূত্রে ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ দিয়া সত্য-দণ্ডী ধারণ করা যায়, তাহা হইলে মহাপাপ ক্ষয় হইতে পারে।' ছেলে-মুখে বড়ো-কথা শুনিয়া, তাঁহার মাতাপিতা নিয়তই ক্ষুব্ধ ও ক্রোধান্বিত হইতেন।

বাল্যকাল হইতে নানককে সংসারে অনাসক্ত দেখিয়া তাঁহার পিতা সংসারে প্রবৃত্তি জন্মাইবার জন্য তাঁহাকে নানাবিধ গৃহকর্ম করিতে দিতেন; কিন্তু নানক সে বিষয়ে বড় মনোযোগ করিতেন না। এক দিবস তাঁহার পিতা তাঁহাকে ব্যবসায়ে নিযুক্ত করিবার জন্য একজন ভৃত্য ও কিছু টাকা সঙ্গে দিয়া লবণ ক্রয় করিতে পাঠাইলেন। পথে যাইতে যাইতে তাঁহারা দেখিতে পাইলেন, কয়েকজন সন্ন্যাসী ক্ষুধায় কষ্ট পাইতেছেন। নানক সন্ন্যাসীদিগকে ক্ষুৎপিপাসায় কাতর দেখিয়া, দয়ার্দ্রহৃদয়ে ভৃত্যের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন, 'দেখ, আমরা লাভের জন্য ব্যবসায় করিতে যাইতেছি, কিন্তু সে লাভ ঐহিকের জন্য, দুই দিন পরে তাহা আর থাকিবে না। যাহা পরকালের সম্পত্তি, তাহাই আমাদের উপার্জন করা উচিত। যদি এই সন্ন্যাসীদিগের ক্ষুধা-নিবৃত্তির জন্য আমাদের এই অর্থ প্রদান করি, তাহা হইলে আমাদের পরকালের অক্ষয় সম্পত্তি সঞ্চিত হইবে।' তিনি এইরূপ পরামর্শ করিয়া সেই বাণিজ্যের অর্থ সন্ন্যাসীদিগকে প্রদান করিলেন। পিতৃদত্ত ব্যবসায়ের অর্থ এইরূপে খরচ করিয়া বাটী প্রত্যাগমন করিলেন; কিন্তু ভর্ৎসনার ভয়ে তিনি পিতার নিকট যাইতে ভীত হইলেন। কালু পুত্রের বাণিজ্যবিবরণ পূর্বেই শ্রবণ করিয়াছিলেন, সুতরাং তিনি পুত্রকে নিকটে আহ্বান করিয়া যথেষ্ট গালাগালি দিলেন। যাহার মন ধর্মভাবে অনুপ্রাণিত, ধর্মোচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত, তাহার মনের গতি কে নিবারণ করিতে পারে? পিতার ভর্ৎসনাতে নানকের ধর্মভাব তিরোহিত না হইয়া, সৎকর্মের প্রতি নিষ্ঠা পূর্ববৎ বলবতী রহিল।

পুত্র এখনও ব্যবসায় করিবার উপযুক্ত হয় নাই, ইহা ভাবিয়া তিনি নানককে গৃহপালিত গো-মহিষাদি চারণে নিযুক্ত করিলেন। এক দিবস নানক গো-মহিষাদি প্রান্তরে ছাড়িয়া দিয়া, প্রখর রৌদ্রের তেজে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া, বৃক্ষতলে শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইতেছিলেন, এমন সময়ে, তাঁহার গো-মহিষাদি এক ব্যক্তির শস্যক্ষেত্রে যাইয়া, তাহার শস্যসকল নষ্ট করিতেছিল। ক্ষেত্রস্বামী পশুদিগকে এইরূপ শস্য নষ্ট করিতে দেখিয়া, একবারে ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল ও উদ্দেশে নানককে বহুবিধ তিরস্কার করিতে করিতে তাঁহার অনুসন্ধান করিতে লাগিল। অনন্তর ক্ষেত্রস্বামী, যথায় নানক শ্রান্ত হইয়া নিদ্রা যাইতেছিলেন, তথায় যাইয়া উপস্থিত হইল এবং দেখিল, তিনি অতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়া গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহার মুখে অল্প অল্প সূর্যরশ্মি পতিত হওয়ায় এক কালসর্প ফণা বিস্তার করিয়া ছায়া করিয়া রহিয়াছে। তখন সেই ক্ষেত্রস্বামী আশ্চর্যান্বিত হইয়া তথা হইতে বাটী প্রত্যাগমন করিল।

নানকের পিতা গ্রাম্য তহশীলদারের কার্য করিতেন। গ্রামস্থ ব্যক্তিগণ তাঁহাকে বলিতেন, 'মহাশয়! আপনার পুত্রের মস্তিষ্ক বিকৃতভাবাপন্ন হইয়াছে, কিন্তু এখনও সময় আছে, আপনি যদ্যপি এই সময়ে উহার বিবাহ দিতে পারেন, তাহা হইলে উপকার হইতে পারে।' নানকের পিতা গ্রামস্থ ব্যক্তিদিগের কথায় সম্মত হইয়া পুত্রের বিবাহ দেওয়া স্থির করিলেন। কিছুদিন পরে তিনি বটল পরগণা-নিবাসী মোলাযোনা নামক একজন ক্ষত্রিয়ের সুলক্ষণা নাম্নী কন্যার সহিত বিবাহ দিলেন। গুরুজনের আজ্ঞাপালনের জন্য নানক দারপরিগ্রহ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সহজে গৃহবাসী হইতে সম্মত হন নাই।

নানকের ভগিনী জানকী, নানককে অতিশয় ভালবাসিতেন। দৌলত খাঁ লোদীর

অধীন জয়রাম নামক একজন হিন্দু কর্মচারীর সহিত জানকীর বিবাহ হইয়াছিল। জয়রাম যে সময়ে লাহোরের শাসনকর্তার অধীনে প্রতিপত্তির সহিত কর্ম করিতেছিলেন, সেই সময়ে জানকী নানককে অনেক বুঝাইয়া সংসারাশ্রমের প্রতি তাঁহার আসক্তি জন্মাইয়া দেন। তিনি স্বামীকে অনুরোধ করিয়া নবাব সরকারে একটি কর্মও করিয়া দিয়াছিলেন। এই সময়ে নানকের শ্রীচন্দ ও লক্ষ্মীদাস নামে দুইটি পুত্র হইয়াছিল। সংসারবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া নানক দৌলত খাঁ লোদীর অধীনে কিছুকাল কর্ম করিয়াছিলেন। তিনি স্বোপার্জিত অর্থে সংসারযাত্রা নির্বাহ করিয়া যাহা কিছু বাঁচাইতে পারিতেন, তাহা সাধু, ভক্ত, অতিথি, ফকীর ও দীনদুঃখীদিগকে বিতরণ করিতেন।

নানক রাজসরকার হইতে কর্মচ্যুত হইয়া কিছুদিন বাটীতে বসিয়া ছিলেন। ঐ সময়ে তাঁহার বন্ধুবান্ধব তাঁহাকে বিষয়কর্মে মন দিতে বলিলে, তিনি বলিতেন, 'আপনারা আমাকে ওরূপ অনুরোধ করিবেন না, যে সময়টুকু বিষয়কার্যের দিকে মনোনিবেশ করিব, সেই সময়টুকু ঈশ্বরচিন্তা করিলে, পরকালের কার্য করা হইবে। বিষয়ের চিন্তাকে একবার হৃদয়ে স্থান দিলে, ক্রমেই সমস্ত হৃদয়টুকু তাহারই অধিকারভুক্ত হইয়া যাইবে। আমার হৃদয় এখনও এত প্রশস্ত হয় নাই যে, আমি একই সময় উভয় চিন্তা করিতে পারি।'

ক্রমে নানক ঈশ্বর-প্রেমে এমন মোহিত হইয়া গেলেন যে, তিনি সংসারের আর কোন কার্যই সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইতেন না। ইহা দেখিয়া তাঁহার মাতাপিতা অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। কথিত আছে, একদিন তাঁহার পিতা তাঁহাকে নানারূপে বুঝাইয়া ক্ষেত্র কৃষিকার্যে নিযুক্ত হইতে বলিলেন। তাহাতে নানক এই উত্তর দিলেন যে, 'পিতঃ! আমি এক অতি উত্তম ক্ষেত্র পাইয়াছি, তথায় নূতন নূতন অঙ্কুর সকল বাহির হইতেছে এবং আমাকে তজ্জন্য অত্যন্ত সতর্ক ও যত্নবান থাকিতে হয়। এক্ষণে আমি অন্য ক্ষেত্রের প্রতি মনোযোগ দিতে পারিব না।' তখন তাঁহার পিতা বলিলেন, 'তুমি সর্বদাই ওরূপ প্রলাপবাক্য বল কেন? তুমি আবার নূতন ক্ষেত্র কোথায় পাইলে? আমার যে সকল ক্ষেত্র আছে, যত্ন কর, তাহাতেই প্রচুর শস্য উৎপন্ন হইবে।' তাহাতে নানক বলিলেন যে, 'সাধুসঙ্গে আমার মন কৃষক হইয়াছে; জীবন নূতন ক্ষেত্র, সৎকর্মরূপ হাল সর্বদা ইহা কর্ষণ করিতেছে, অনুরাগ-জল সেচন করিতেছি, হরিনাম তাহাতে বীজস্বরূপ হইয়াছে। সন্তোষ মৈ দ্বারা ক্ষেত্রের উচ্চনীচতাসকল সমভূমি করিতেছে ও দীনের ন্যায় বেশ করাইয়াছে এবং ভক্তি সমস্ত কৃষিকার্যের জমাট করিয়া তুলিয়াছে। ভক্তবৎসল ভগবান্ আমাকে দয়া করিয়া তাঁহার নিরাকার গৃহে স্থান দিয়াছেন।'

নানকের এই সমস্ত কথা শুনিয়া তাঁহার পিতা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। মনে করিলেন, হয় ত কৃষিকার্য নানকের অভিপ্রেত নয়, এজন্য তিনি পুনরায় বলিলেন, 'নানক! কৃষিকার্য যদি তোমার মনোনীত না হয়, তাহা হইলে তুমি একখানি দোকান কর।' তখন নানক বলিলেন, 'পিতঃ! আমি যথার্থ দোকান করিতেছি। আমার মন ভাণ্ডার-স্বরূপ হইয়াছে। হরিনাম-রত্ন তাহাতে অতি যত্নে সঞ্চিত হইতেছে। সমস্ত সাধু মহাজনের সহিত আমার নিত্যই হিসাব হইতেছে। আমার এই ব্যবসায়ে খুব লাভ হইতেছে।'

অনন্তর তাঁহার পিতা তাঁহাকে কোন চাকরী করিতে বলেন। তখন নানক এই উত্তর করিলেন যে, 'পিতঃ! আমি ভগবানের দাসত্ব করিতেছি, তাঁহার নাম অবিরত জপ করিতেছি। আমার উপর নিরাকার প্রভুর কৃপাদৃষ্টি হইলে আমি ধন্য হইব।'

এদিকে নানক যত ঈশ্বরপ্রেম-সাগরের গভীর হইতে গভীরতম প্রদেশে নিমগ্ন হইতে লাগিলেন ততই তাঁহার বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া উম্মত্তের লক্ষণসকল প্রকাশ পাইতে লাগিল। পুত্র উম্মত্ত হইয়াছে, এই ভাবিয়া নানকের পিতা এক দিবস জনৈক প্রসিদ্ধ চিকিৎসককে আনয়ন করেন। বাটীর যে স্থানে নানক নিষ্পন্দভাবে অবিচ্ছেদে ঈশ্বরের সুখময় সহবাসে মনের আনন্দে স্বর্গসুখ অনুভব করিতেছিলেন, তাঁহারা সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা দেখিলেন, নানক আপাদমস্তক বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া একটি নিভৃত কক্ষে শয়ন করিয়া আছেন, কাহারও সহিত ব্যাকালাপ করিতেছেন না। চিকিৎসক রোগ-পরীক্ষার জন্য নানকের হস্তধারণ করিলে তিনি তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, 'মহাশয়! আপনি আমার রোগের কি পরীক্ষা করিবেন?— আমার বুকের ভিতর যে রোগ আছে, তাহারই অগ্রে চিকিৎসা করুন, পরে আমায় দেখিবেন।'

নানক ধর্মলাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া হিন্দু ও মুসলমান ধর্মশাস্ত্রসকল পাঠ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহাতে তাঁহার পিপাসী প্রাণ পরিতৃপ্ত হয় নাই। তিনি সর্বত্র অন্ধ বিশ্বাস ও বাহ্যিক ক্রিয়াকাণ্ডের প্রাবল্য দেখিয়া প্রকৃত তত্ত্ব জানিবার জন্য ব্যস্ত হন এবং সন্ন্যাসিবেশে ভারতবর্ষের নানাস্থানে পরিভ্রমণ করেন। নানক যে সময়ে মক্কায় ছিলেন, সেই সময়ে এক দিবস তিনি অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়া মক্কার মসজিদের দিকে পা রাখিয়া শয়ন করিয়াছিলেন। একজন মুসলমান ফকীর, নানকের এইরূপ আচরণ দেখিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, 'ওরে কাফের! তুই যে ঈশ্বরের গৃহের দিকে পা রাখিয়া অকাতরে নিদ্রা যাইতেছিস্? তোর হৃদয়ে কি ধর্মভাব নাই?' ইহা শ্রবণ করিয়া নানক তাঁহাকে বলেন, 'ভাই! তুমি অনুগ্রহ করিয়া এমন স্থানে আমার পা দুখানি রাখিয়া দাও, যে স্থানে ঈশ্বর বা ঈশ্বরের গৃহ নাই।' মুসলমান ফকীর দেখিলেন, ঈশ্বর সর্বব্যাপী, সকল দিকেই তাঁহার গৃহ, সুতরাং তিনি সেই স্থান হইতে চলিয়া গেলেন।

নানক ভারতবর্ষের কয়েকটি প্রধান প্রধান তীর্থস্থানে ভ্রমণ করিয়া দেখিলেন যে সর্বত্রই বাহ্য অনুষ্ঠানের আড়ম্বর, বাহ্যিক ক্রিয়াকাণ্ড ও কুসংস্কার এবং প্রকৃত পবিত্রতার অভাব বিদ্যমান রহিয়াছে। যাহাতে দেশ হইতে এই বাহ্য ক্রিয়াকলাপ ও জাত্যাভিমানের উম্মূলন হয়, যাহাতে লোক পরস্পর ভ্রাতৃভাবে মিলিত হইয়া, পরিশুদ্ধ ধর্ম ও সাধু-বৃত্তি অবলম্বন করে এবং ইন্দ্রিয়দমন ও চিত্তসংযম করিতে চেষ্টা করে, তাহারই উন্নতির জন্য তিনি স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন।

তীর্থ-ভ্রমণকালীন তিনি আপনার মত যখন প্রচার করিয়াছিলেন, তখন বালাভাই, ভগীরথ, মনসুখ, মর্দনা* প্রভৃতি কয়েক ব্যক্তি তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। ক্রোড়িয়া নামক নানকের এক পরম ভক্ত, কর্তারপুরে একটি বাটী নির্মাণ করিয়া ঐ বাটী তাঁহাকে গ্রহণ করিতে বলেন। নানক ঐ প্রস্তাব অস্বীকার করায় তিনি মর্মাহত হন ও

* নানক যে সময়ে আফগানিস্থানে গিয়াছিলেন, সেই সময়ে মর্দনার মৃত্যু হয়।

বার বার গুরুকে উহা গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। অবশেষে তিনি শিষ্যের মনস্তুষ্টির জন্য ঐ প্রস্তাবে সম্মত হন এবং মাতা, পিতা, স্ত্রী, পুত্র, সকলকেই আনাইয়া ঐ গৃহে বাস করিতে থাকেন।

কর্তারপুরে থাকিয়া কিছুকাল সংসারধর্ম করিবার পর নানকের মনে বৈরাগ্যের উদয় হয়। তিনি গার্হস্থ্যাশ্রম* ত্যাগ করিয়া সাধু-সন্ন্যাসীর আশ্রমে প্রবেশ করেন। তিনি কাহার দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার কোনই উল্লেখ নাই; কিন্তু যোগ-সাধন-প্রণালী এরূপ শিক্ষা করিয়াছিলেন যে, যোগাসনে বসিয়া অবলীলাক্রমে দুই তিন দিন অনাহারে ও অনিদ্রায় কাটাইয়া দিতে পারিতেন। এরূপ কথিত আছে যে, তিনি কোন সময়ে সুলতানপুরের নিকট দিয়া নদীতে স্নান করিতে যাইয়া, তিন দিবসকাল জলে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। জল হইতে উঠিয়া তিনি যে বৃক্ষতলে বসিয়াছিলেন, লোকে তাহাকে 'বাবাকীরেন' বলিয়া থাকে। তিনি যে ভীষণ বনমধ্যে বসিয়া যোগ-সাধন করিতেন, লোকে তাহাকে 'রোরী-সাহেব বলে।

নানক সাধনায় সিদ্ধ হইয়া হিন্দু ও মুসলমানদিগকে এক ধর্মে দীক্ষিত করিবার জন্য বালা ও মর্দনা নামক দুইজন শিষ্য সঙ্গে লইয়া প্রচারকার্যে বহির্গত হন। তিনি মুলতানের গড়ছত্র মেলায় কোরাণ ব্যতীত অন্য ধর্ম প্রচার করিতেছিলেন বলিয়া, ইব্রাহীম লোদীর আজ্ঞায় বন্দীকৃত হন। প্রায় সাত মাসকাল বন্দীভাবে থাকিবার পর ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে পাণিপথের যুদ্ধে সম্রাট বাবর কর্তৃক নবাব পরাজিত ও নিহত হইলে, তিনি অব্যাহতি লাভ করেন।

এরূপ কথিত আছে যে, নানক দেশ-পর্যটন-সময়ে এক দিবস অত্যন্ত তৃষ্ণাতুর হইয়া বুদ্ধা নামক এক ব্যক্তিকে নিকটস্থ কোন পুষ্করিণী হইতে জল আনিতে বলেন। বুদ্ধা

---

* আশ্রম চারি প্রকার,—যথা ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও ভৈক্ষ্য। উপনয়ন-সংস্কার দ্বারা ব্রহ্মচর্যে অধিকার জন্মানোর নাম ব্রহ্মচর্য। বিবাহসংস্কারে সংস্কৃত হওয়ার নাম গার্হস্থ্য। উপযুক্ত পুত্রে গার্হস্থ্য ধর্মের ভার সমর্পণ করিয়া বয়ঃক্রমের তৃতীয় ভাগে বনবাসী হওয়ার নাম বানপ্রস্থ। শেষাবস্থায় কামনাশূন্য হইয়া, সন্ন্যাসধর্ম অবলম্বন করার নাম ভৈক্ষ্য বা যতিধর্ম।

কোন্ কোন্ জাতি কোন্ কোন্ আশ্রমের অধিকারী, তাহা বামনপুরাণে বিশেষরূপে লিখিত আছে। সাধারণের অবগতির জন্য তাহার কয়েক পংক্তি এই স্থানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

'চত্বার আশ্রমাশ্চৈব ব্রাহ্মণস্য প্রকীর্তিতাঃ।
ব্রহ্মচর্যঞ্চ গার্হস্থ্যং বানপ্রস্থঞ্চ ভিক্ষুকম্॥
ক্ষত্রিয়স্যাপি কথিতা আশ্রমাস্ত্রয় এব হি।
ব্রহ্মচর্যঞ্চ গার্হস্থ্যমাশ্রমদ্বিতয়ং বিশঃ।
গার্হস্থ্যমুচিতন্ত্বেকঃ শূদ্রস্য ক্ষণমাচরেৎ॥' বামনপুরাণ।

অর্থাৎ ভৈক্ষ্য ব্যতীত অপর তিনটিতে ক্ষত্রিয়ের অধিকার দেখা যায়। বৈশ্যের পক্ষে শেষ দুই আশ্রম নাই। শূদ্রজাতি একমাত্র গার্হস্থ্যাশ্রম দ্বারাই অন্য তিন আশ্রমের ফলাধিকারী হন। ব্রাহ্মণের চারি আশ্রমেরই অনুষ্ঠানের নিত্যত্ব ও অবশ্যকরণীয়তা দৃষ্ট হয়।

নিকটস্থ একটি ক্ষুদ্র পুষ্করিণীতে গিয়া দেখেন যে, তাহাতে জল নাই। বুদ্ধা নানককে শুষ্করিণীর অবস্থার কথা বলিলে, তিনি বলেন, 'তুমি পুনরায় গিয়া দেখ, উহাতে প্রচুর পরিমাণে উত্তম পানীয় জল আছে।' বুদ্ধা ঐ পুষ্করিণীর ধারে আসিয়া উহা জলপূর্ণ দেখিয়া বিস্মিত হন এবং পরিশেষে নানকের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। গ্রামবাসিগণ জলাভাবে অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছিল, হঠাৎ শুষ্ক পুষ্করিণী স্বচ্ছ-বারিপূর্ণ দেখিয়া তাহারাও বিস্ময়-সাগরে ডুবিয়া যায় এবং নানকের গুণগরিমা শ্রবণ করিয়া তাহাদিগের মধ্যে অনেকেই তাঁহার শিষ্য হয়। যে স্থানে এই ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল, সেই স্থানের নাম অমৃতসর। অমৃতসর শিখদিগেব প্রধান তীর্থস্থান।

অমৃতসর পূর্বে একটি ক্ষুদ্র গ্রাম মাত্র ছিল। তখন ঐ গ্রামের নাম যে কি ছিল, তাহা এ পর্যন্ত প্রকাশ নাই। নানকের কথায় শুষ্ক পুষ্করিণীতে হঠাৎ উত্তম পানীয় জলের আবির্ভাব হওয়ায়, তত্রত্য সকলেই উহাকে 'অমৃত সায়র' বলিত। অমৃত সায়র হইতেই 'অমৃতসর' নামের উৎপত্তি হইয়াছে। শিখদিগের চতুর্থ গুরু রামদাস ১৫৭৪ খ্রীষ্টাব্দে ঐ পুষ্করিণীকে বৃহদাকারে খনন করাইয়া তাহার মধ্যস্থলে একটি মন্দির নির্মাণ করাইয়া দেন। ঐ মন্দিরকে শিখেরা 'গুরু দরবার' বা 'দরবার সাহেব' বলে। ১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দে আফগান আমেদসা শিখদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া অমৃতসর নগর ধ্বংস করে। মন্দির তোপে উড়াইয়া দেয়। গো-হত্যার দ্বারা সেই পবিত্র স্থান কলঙ্কিত করে; ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজ রণজিৎ সিংহ অমৃতসর অধিকার করেন এবং অনেক অর্থব্যয় করিয়া সেই মুসলমান-কলঙ্কিত পুষ্করিণী ও মন্দিরের উদ্ধার-সাধন করেন। মন্দিরের নির্মাণ-কার্য সমাপ্ত হইলে তিনি উহা স্বর্ণমণ্ডিত করিয়া দেন। সেই দিন হইতে উহা 'সুবর্ণ-মন্দির' নামে খ্যাত হইয়াছে। ইংরেজরা ইহাকে 'গোল্ডেন টেম্পল' বলিয়া থাকে।*

অমৃত-সরোবর সুবিস্তীর্ণ, দীর্ঘে ও প্রস্থে সমান, সর্বদাই জলে পরিপূর্ণ থাকিয়া টলমল করিতেছে। ইহার চতুর্দিকে শ্বেত-প্রস্তর দ্বারা গ্রথিত। ইহার মধ্যস্থলে মন্দিরটি বৃহৎ না হইলেও নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে। মন্দিরের অতুল সৌন্দর্যে মানবের মন বিমুগ্ধ হয়। তীর হইতে সরোবর-মধ্যস্থিত স্বর্ণ-মন্দিরে যাইতে এক মর্মর-সেতু আছে। মন্দিরটিও মার্বেল প্রস্তর দ্বারা নির্মিত। মন্দিরমধ্যে কয়েকটি প্রকোষ্ঠ। তাহার প্রধান ও বৃহৎ প্রকোষ্ঠে নানক, গুরুগোবিন্দ প্রভৃতি শিখগুরুদিগের রচিত ধর্মগ্রন্থ-সকল রক্ষিত আছে। ঐ সকল গ্রন্থ বহুমূল্য আচ্ছাদনে আবৃত। শিখেরা অতি ভক্তিসহকারে ঐ গ্রন্থনিচয়ের পূজা করিয়া থাকে।

নানক সাধনার দ্বারা ত্রিকালজ্ঞ হইয়াছিলেন। এরূপ কথিত আছে যে, কোন এক ব্যক্তি অসদুপায়ে অর্থোপার্জনের জন্য তীর্থ-যাত্রার পথে একটি পান্থনিবাস প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল। কোন ব্যক্তি সেই পান্থনিবাসে উপস্থিত হইলে, সে আনন্দের সহিত তাহার আতিথ্য-সৎকার করিত। পরে রাত্রি হইলে, তাহাকে হত্যা করিয়া তাহার যথাসর্বস্ব লুণ্ঠন করিত। নানক ঐ পথ দিয়া গমন-সময়ে তাঁহার অতীন্দ্রিয় দৃষ্টির দ্বারা ঐ ব্যক্তির স্বভাব বুঝিতে পারিয়া তাহাকে সতর্ক করিয়া দেন এবং অবশেষে

*ইহার বিস্তারিত বিবরণ আমার 'ভ্রমণ-কাহিনী' নামক পুস্তকে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

দেখিয়া বাদশাহ বলেন, 'আপনি উপাসনা না করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন কেন ?' ইহার উত্তরে নানক বলিয়াছিলেন 'আমি ত দাঁড়াইয়া ছিলাম, আপনারা কিরূপ উপাসনা করিলেন, বলুন দেখি ? আপনি মনে মনে বেগমসাহেবের অপূর্ব কান্তির বিষয় এবং কাজী মহাশয় স্বীয় কন্যার পীড়ার বিষয় ভাবিতেছিলেন, আপনাদের ঈশ্বরারাধনা ত এইরূপ।' নানকের কথা শুনিয়া সকলে আশ্চর্য হইয়া গেল। সেই দিন অবধি নানকের উপর মুসলমানদিগের প্রগাঢ় বিশ্বাস ও অতিশয় ভক্তি জন্মিতে লাগিল।

১৫৩৯ খ্রীষ্টাব্দে নানক শাহ আপনার প্রধান শিষ্য অঙ্গদকে * আপনার বেশভূষা অর্পণ করিয়া ৭১ বৎসর বয়সে কর্তারপুর নগরে যোগাবলম্বনে মানবলীলা সংবরণ করেন।

পরলোক গমনের পর কবীরের ন্যায় শবদেহ লইয়া হিন্দু ও মুসলমান শিষ্যের মধ্যে মহা বিরোধ উপস্থিত হয়। বিরোধ মীমাংসার জন্য উহাদের মধ্যে এক ব্যক্তি মধ্যস্থ হইয়া শবদেহ দেখিতে চান। তাঁহার আজ্ঞায় মৃত দেহের আচ্ছাদন-বস্ত্র উত্তোলন করায় কেহই শবদেহ দেখিতে পাইলেন না। তখন শিষ্যেরা বিস্ময়াপন্ন হইয়া শব-আচ্ছাদন-বস্ত্রখানিকে দ্বিখণ্ড করেন ও আপনাদের মধ্যে বিভাগ করিয়া লন। ঐ স্থানে অদ্যাপি নানকের সমাজগৃহ বর্তমান আছে। তথায় প্রতি বৎসর একটি করিয়া মেলা হইয়া থাকে। গুরু নানক শিষ্যদিগকে যে সকল উপদেশ দিয়াছিলেন, শিষ্যেরা তাহা সংগ্রহ করিয়া 'আদিগ্রন্থ' এই নাম প্রদান করেন ও উঁহাকে গুরুর ন্যায় ভক্তি করিয়া থাকেন।

আদিগ্রন্থে নানাপ্রকার রাগ-রাগিণীসংযুক্ত গীত, জপজী, সোদররেরাস, কীর্তি-সোহিলা, আশাকিবার, ভেগকী-বাণী, প্রাণসাংলি প্রভৃতি কতকগুলি বিভাগ আছে। আদিগ্রন্থে নানকের রচিত উপদেশ ও গান ব্যতীত কয়েকজন গুরু ও কয়েকজন ভক্তেরও

* নানকের লেহনা নামক একজন অতি গুরুভক্ত শিষ্য ছিলেন। তিনি গুরুর আজ্ঞা প্রতিপালনের জন্য আহার নিদ্রা, এমন কি, নিজের প্রাণকেও অতি তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন। এক দিবস নানক কয়েকজন শিষ্য সমভিব্যাহারে নদী-তীরে পদচারণা করিতেছিলেন। তাঁহারা দেখিলেন, নদীবক্ষে বস্ত্রাচ্ছাদিত একটি শব ভাসিয়া যাইতেছে। নানক ঐ আচ্ছাদিত শবটি শিষ্যবর্গকে দেখাইয়া বলেন, 'তোমাদিগের মধ্যে এমন কে আছে, ঐ গলিত শবটিকে ভক্ষণ করিতে পারে ?' গুরুর মুখ হইতে এই কথা নিঃসরণ হইবামাত্র লেহনা তৎক্ষণাৎ জলে ঝাঁপ দিয়া শবের নিকট যাইতে যাইতে গুরুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'শবের কোন স্থান হইতে ভক্ষণ আরম্ভ করিব ?' নানক তাঁহাকে শবের পদদ্বয় হইতে ভক্ষণ করিতে বলেন। লেহনা ঐ বস্ত্রাচ্ছাদিত শবটিকে তীরে তুলিয়া তাহার আচ্ছাদনখানি খুলিবামাত্র দেখিলেন, একটি পাত্রে উত্তম ভক্ষদ্রব্য রহিয়াছে। নানক লেহনার কার্যে সন্তুষ্ট হইয়া লেহনাকে নিজ অঙ্গসদৃশ জ্ঞান করিয়া তাঁহাকে 'অঙ্গদ' নাম প্রদান করেন। অঙ্গদই গুরুর আসন গ্রহণ করিবার উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিয়া, সমাধি সময়ে তাঁহাকেই গুরুপদ প্রদান করিয়া যান।

রচনা আছে। শিখ ধর্মাবলম্বীদের ধর্মগুরু দশজন। ১ম—গুরু নানক *। ২য়—নানকের শিষ্য অঙ্গদজী। ৩য়—অঙ্গদের শিষ্য অমরদাস। ৪র্থ—অমরদাসের শিষ্য ও জামাতা রামদাস। ইনিই অমৃতসরের 'গুরুদরবারের' প্রতিষ্ঠাতা। ৫ম—রামদাসের পুত্র অর্জুন। ইনি গুরু নানক ও অন্যান্য গুরুদিগের উক্তি ও রচনা ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া 'গ্রন্থ সাহেব বা আদিগ্রন্থ' প্রস্তুত করেন। ৬ষ্ঠ—অর্জুনের পুত্র হরগোবিন্দ। ইনিই শিখদিগের মধ্যে মুসলমানদিগের সহিত যুদ্ধার্থে প্রথম তলবার ধারণ করেন। ৭ম—হরগোবিন্দের পুত্র হর রায়। ৮ম—হর রায়ের পুত্র হরকিষণ। ৯ম—তেগবাহাদুর। ইনি ৬ষ্ঠ গুরু হরগোবিন্দের ভ্রাতা। ১০ম—তেগবাহাদুরের পুত্র গুরুগোবিন্দ। ইনিই শিখ জাতিকে যোদ্ধৃজাতিতে পরিণত করেন। ইহার পরে আর উপযুক্ত ব্যক্তি না থাকায় গুরুপদ উঠিয়া যায়।

'জপজী', আদিগ্রন্থের শিরোভাগ বলিলেই হয়। নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণেরা যেরূপ গায়ত্রী জপ না করিয়া জলগ্রহণ করেন না, শিখেরা সেইরূপ জপজীর কতকটা অংশ প্রত্যূষে পাঠ না করিয়া সংসারকর্মে প্রবৃত্ত হয় না। জপজীর সকল পদগুলি আধ্যাত্মিক ভাবে পরিপূর্ণ। নমুনাস্বরূপ এই স্থলে জপজীর কয়েকটা পদ 'সাহিত্য সংহিতা' হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

'সাচা সাহেব, সাহা নাঁউ, ভাখ্য়া ভাউ অপার,
আখৈ মংগগে দে* দে* দাত করে দাতার।
ফের কি আগে রাখয়ে, জিত দিসৈ দরবার?
মুহঁ কি বোলন বোলিয়ে, জিত্ সুন ধরে পিয়ার,
অমৃত বেলা সচ্ নাঁউ বড্ডিয়াই বিচার।
করমী আবৈ, কপ্ড়া নদরী মোখ দুয়ার।
নানক, এবৈঁ জানিয়ে সভ্ আপে সচিয়ার।'

অর্থ—পরমাত্মা সত্যস্বরূপ, তাঁহার নাম সত্য এবং তাঁহার ভাব অনন্ত। তাঁহার নিকট যে যাহা প্রার্থনা করিতেছে, সে তাহা প্রাপ্ত হইতেছে। কোন বিষয় তাঁহার সম্মুখে রাখিলে, অর্থাৎ কি কার্য করিলে সেই পরমাত্মার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এই প্রশ্নের উত্তরে নানক বলিতেছেন যে, পরমাত্মার মহিমা যাহা শুনিতে ভাল লাগে, তাহা মুখে বর্ণনা করিবে; অতি প্রত্যূষে তাঁহার সত্যনাম এবং মহিমার বিচার করিবে; কর্মদ্বারা জীব পাঞ্চভৌতিক শরীর গ্রহণ করে এবং জ্ঞানরূপ বস্তুকে লক্ষ্য করিয়া মোক্ষপ্রাপ্ত হয়। এইরূপ জ্ঞান প্রাপ্ত হইলে আমি অর্থাৎ দ্রষ্টা সত্য এবং দৃশ্যও সত্য বলিয়া বোধ হয়।

তীরথ নাঁবা, জে তুদ্ ভাবা, বিন ভাঁনে কি নাই করি।
জেতী সিরসঠ্ উপায়ই বেখা, বিনু করমা কি মিলে লই।

---

* নানকের নূতন ধর্মমত শ্রবণ করিয়া যাঁহারা তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদিগকে শিখ নামে অভিহিত করেন। বোধ হয়, শিষ্য শব্দের অপভ্রংশে 'শিখ' শব্দের উৎপত্তি হইয়াছিল। নানক শিষ্য-সম্প্রদায় স্থাপন করিয়া তাহার কর্তা হইয়া 'গুরু' উপাধি গ্রহণ করেন। সেই অবধি তিনি গুরু নানক বলিয়া বিখ্যাত হন।

মতিবিচ রতন্, জবাহার মাণিক,
যে ইক গুরুকী শিখসুনী, গুরু ইক দেহি বুঝাই।
সভনা জীয়াকা একদাতা, সোমে বিসরি ন জাই॥

অর্থ—পরমাত্মার মনন ভিন্ন আত্মরূপী তীর্থে কেহ স্নান করিতে সমর্থ হয় না; অনুভব ভিন্ন ঐ তীর্থ লাভ করিবার অন্য উপায় নাই। যত প্রকার জীব সৃষ্ট হইয়াছে, তাহার আত্মকর্ম ভিন্ন পরমাত্মার সহিত মিলিত হইতে পারে না। সকল মনুষ্যের ভিতরে জ্ঞানরূপ মণিমাণিক্যাদি বিরাজ করিতেছে, কিন্তু, সদ্‌গুরুর কৃপা দ্বারাই জ্ঞানরূপ রত্নাদি লাভ হয়। নানক বলিতেছেন যে, পরমাত্মার অনুভব বাক্য দ্বারা ব্যক্ত করা যায় না; সদ্‌গুরুর কৃপায় জ্ঞানরূপ দেহ লাভ হয়। পরমাত্মা যে সকল জীবের একমাত্র দাতা, কখন ভুলিব না।

ভরিয়ে হথ পৈর তন দেহ,
পানি ধোতে উতরস্ খেহ্
মূত পলিতী কাপড় হোই,
দে সাবুন লইয়ে উহ্ ধোই।
ভরিয়ে মতি পাপ কে সঙ্গ,
উহ্ ধোপে নাব কে রঙ্গ।
পুন্নী পাপী আখন নাহ
কর কর করনা লিখনে জাহ্
আপে বীজি আপেহি খাহ্,
নানক, হুকমী আবে জাহ্।

অর্থ—হস্ত, পদ এবং শরীরে ময়লা লাগিলে জলের দ্বারা ধৌত করিলে ময়লা দূর হয়। বিষ্ঠা এবং মূত্র দ্বারা কাপড় মলিন হইলে সাবানের দ্বারা ধুইলে উহাদের মল ধৌত হইয়া যায়। পাপের দ্বারা যদি মন পরিপূর্ণ হয়, অর্থাৎ অবিদ্যার দ্বারা যদি লোকে ভ্রমে আবৃত হইয়া থাকে, তাহা হইলে পরমাত্মার নামের দ্বারা, অর্থাৎ নামরূপী অনুভবের দ্বারা মলিনতারূপ ভ্রম এবং সংশয় দূর হয়। পুণ্যবান্ এবং পাপী বলিয়া কোন ব্যক্তি নাই; অবিদ্যার ভ্রমে পাপ এবং পুণ্য বলিয়া দুই প্রকার ভ্রান্তি দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। ঐ ভ্রমকে যে ব্যক্তি নিশ্চয় করিয়া গ্রহণ করে, তাহার নিকট উহা পাপ কিংবা পুণ্য বলিয়া গণ্য হয়। মানব নিজেই কর্ম করিয়া থাকে এবং নিজেই কর্মের ফলভোগ করিয়া থাকে। নানক বলিতেছেন যে, পরমাত্মার আদেশানুসারে লোকে সংসারে ঐ ভ্রান্তিবশতঃ যাতায়াত করিতেছে।

নানকের রচিত 'সোদররে-রাস' সায়ংকালে এবং 'কীর্তি-সোহিলা' শয়নের পূর্বে পঠিতব্য। 'ভেগকী-বাণীতে' ভগবানের স্তোত্র ও কতকগুলি উপদেশ আছে। 'প্রাণসাংলি' গ্রন্থে অনেক বিষয়ের বিধি ও নিষেধের কথা আছে।

—ঃ০ঃ—

হরিদাস সাধু

হরিদাস সাধু কোন্ দেশীয় লোক, কোথায় ইঁহার জন্ম, বাল্যাবস্থাই বা ইঁহার কিরূপে অতিবাহিত হইয়াছিল, তাহার সবিশেষ বিবরণ কেহই অবগত নহেন এবং আমরাও এ পর্যন্ত তাহা সংগ্রহ করিতে পারি নাই। তবে এরূপ শুনিতে পাওয়া যায় যে, হরিদাসের প্রধান শিষ্য রামতীর্থ মহারাজ রণজিৎ সিংহের নিকট বলিয়াছিলেন, হরিদাসের জন্ম মহারাষ্ট্রীয় দেশে। যে সময়ে ইঁহার বয়ঃক্রম ১৬।১৭ বৎসর, সেই সময়ে ইঁহার বাটীর সন্নিকটে একজন মহাযোগী পুরুষ আসিয়া তাঁহার আসন প্রতিষ্ঠা করেন। পূর্বজন্মের সুকৃতিফলে হরিদাস ঐ সাধুর নিকট দীক্ষিত হন, এবং কিছুদিন ঐ গ্রামে থাকিয়া সকলের অজ্ঞাতসারে দীক্ষাগুরুর সহিত প্রস্থান করেন। ইঁহার মাতা-পিতা, আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবর্গেরা বিস্তর অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, কিন্তু কেহই ইঁহার সাক্ষাৎ পান নাই। এরূপ কথিত আছে যে, ঐ সময়ে হরিদাস গুরুর সহিত পর্বত-গুহায় বসিয়া যোগাভ্যাস করিয়াছিলেন।

এই ঘটনার বহুকাল পরে হরিদাসকে পঞ্জাবের অন্তর্গত অমৃতসহরে দেখিতে পাওয়া যায়। ইনি তথায় আপন শিষ্যদিগকে যোগবল দেখাইয়াছিলেন। হরিদাসের অলৌকিক ক্ষমতা দেখিয়া অনেকেই স্তম্ভিত হন এবং লোকপরম্পরায় তিনি পঞ্জাব-অঞ্চলে একজন প্রসিদ্ধ যোগী বলিয়া বিখ্যাত হন। লুধিয়ানার মেডিকেল টপোগ্রাফির উপসংহারে ডাক্তার ম্যাক্‌গ্রেগর ইঁহার কতকগুলি চাক্ষুষ ঘটনা প্রকাশ করেন।

হরিদাস কঠোর পরিশ্রমে যোগাভ্যাস করিয়া সিদ্ধ হন। তিনি অনাহারে ও অনিদ্রায় ছয়মাস কাল মৃত্তিকা মধ্যে প্রোথিত থাকিলেও জীবিত থাকিতেন। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের প্রথম তারিখে ইনি পঞ্জাবের অন্তর্গত জেসলমির নামক স্থানে মৃত্তিকা-মধ্যে সমাধিস্থ হন। ঐ সময়ে লেফ্‌টেনাণ্ট বৈলো তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, 'হরিদাস যে গর্তের মধ্যে আসন-বন্ধন করিয়া বসিয়াছিলেন, তাহার পরিমাণ দুই হাত দীর্ঘ, দেড় হাত প্রস্থ ও দুই হাত গভীর। পাছে কোন কীটাদিতে তাঁহার শরীর দংশন করে, সেই জন্য উহার চতুর্দিকে রেশমী বস্ত্রের দ্বারা মোড়া ছিল। হরিদাস আসন-বন্ধন করিয়া সমাধিতে বসিলে, শিষ্যেরা তাঁহাকে কয়েকখণ্ড গেরুয়া বস্ত্রের দ্বারা আবৃত করিয়া চতুর্দিকে সেলাই করিয়া দেয়, পরে গহ্বরমধ্যে বসাইয়া দিয়া দুইখণ্ড বৃহদাকার প্রস্তর সমাধি-গর্তের উপর অতি দৃঢ়ভাবে আঁটিয়া দেয়। পাছে ইহার মধ্যে শিষ্যদের কোনরূপ প্রবঞ্চনা থাকে, ইহা মনে করিয়া জেসলমিরের রাজা মহারাওলের মন্ত্রী ঈশ্বরীলাল ঐ প্রস্তরের উপর মৃত্তিকার লেপ দিয়া দেন ও গৃহের দ্বার প্রস্তর দিয়া গাঁথাইয়া দেন, এরূপ করিয়াও তিনি নিঃসন্দেহ হন নাই। পাছে শিষ্যেরা অন্য কোন উপায়ে গৃহমধ্যে প্রবেশ করে, সেই জন্য তিনি ঐ গৃহের চতুর্দিকে অস্ত্রধারী প্রহরী নিযুক্ত করিয়া দেন।'

এইরূপে হরিদাস মৃত্তিকামধ্যে একমাসকাল প্রোথিত থাকেন। ১লা এপ্রেল হরিদাসকে উঠাইবার দিন নির্দিষ্ট ছিল, সুতরাং ঐ দিবস বহু দেশদেশান্তর হইতে

লোকজন আসিয়া সমাধিস্থানে উপস্থিত হইতে লাগিল। ঈশ্বরীলাল সমাধি-মন্দিরের চতুর্দিক পরীক্ষা করিয়া গ্রথিত প্রস্তর ভাঙ্গিতে হুকুম দেন। প্রস্তর ভাঙ্গিয়া দরজা খোলা হইলে ঈশ্বরীলাল পুনরায় গহ্বরের উপরিস্থিত প্রস্তর পরীক্ষা করিয়া দেখেন; কিন্তু কোনরূপ সন্দেহের চিহ্ন প্রাপ্ত না হইয়া যোগীকে গহ্বর হইতে উঠাইবার অনুমতি প্রদান করেন। ঈশ্বরীলালের অনুমতি পাইয়া, শিষ্যেরা প্রস্তর সরাইয়া ফেলে ও দেখে যে, যোগী পূর্বাবস্থার ন্যায় বসিয়া আছেন। তাঁহাকে গহ্বর হইতে তুলিয়া তাঁহার গাত্রস্থ গৈরিক বস্ত্র খুলিয়া দেওয়া হইলে, সকলে দেখিলেন, সংজ্ঞাহীন হরিদাসের চক্ষু মুদ্রিত, হস্তপদাদি কুঞ্চিত এবং দন্তের সহিত দন্ত সংযুক্ত। ঐ সময়ে হরিদাসের আকৃতি-প্রকৃতি দেখিয়া সকলেই স্থির করিয়াছিলেন যে, হরিদাস ভবের খেলা সাঙ্গ করিয়াছেন; কিন্তু শিষ্যেরা কয়েক ঘণ্টাকাল সেবাশুশ্রূষা করিবার পর, তাঁহার শুষ্কদেহে পুনরায় প্রাণের সঞ্চার হইল, ক্রমে ক্রমে তাঁহার হস্তপদাদি নাড়িতে লাগিল; তিনি চক্ষরুন্মীলন করিলেন, কিন্তু দুর্বলতার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইতে পারিলেন না। হরিদাসের শুষ্কদেহে প্রাণের সঞ্চার হইতে দেখিয়া, সকলে বিস্মিত হইল এবং তাঁহার অসাধারণ যোগবল দেখিয়া, ঈশ্বরের অংশ ভাবিয়া, কি হিন্দু, কি মুসলমান, সকলেই তাঁহার উদ্দেশে মস্তক নত করিতে লাগিল।

হরিদাসের অদ্ভুত ক্ষমতার বিষয় জনসমাজে প্রচারিত হওয়ায়, মহারাজ রণজিৎ সিংহ উহা স্বচক্ষে দর্শন করিবার জন্য ঐ সাধুকে লাহোরে আনয়ন করেন। সাধু রাজসভায় উপস্থিত হইলে, মহারাজ রণজিৎ সিংহ তাঁহাকে সমাধিস্থ হইতে বলেন। রাজাজ্ঞা অবমাননা করা উচিত নয়, এইরূপ বিবেচনা করিযা তিনি তাঁহাব কথায় স্বীকৃত হন। রাবী নদীর কূলে, 'সর্দার গওলাসিংহ-ভরণীয়াওয়ালা' নামক সুরম্য উদ্যানে সমাধির স্থান নির্দিষ্ট হয়। সমাধিব নির্দিষ্ট দিবস উপস্থিত হইলে, হরিদাসকে উক্ত বাগান-মধ্যে প্রাচীর-বেষ্টিত বাবদ্বারী স্থানে লইয়া যাওয়া হয়। ঐ সময়ে তথায় মহারাজ রণজিৎ সিংহ, তাঁহার পুত্র কোরক সিংহ ও পৌত্র নবনেহল সিংহ এবং শের সিংহ, সুচেত সিংহ, হীরা সিংহ, জেনারেল ভেণ্টুরা, রাজা ধ্যান সিংহ, রণজিৎ সিংহের খাজাঞ্জি বলরাম মিশ্র প্রভৃতি বহুসংখ্যক গণ্যমান্য ব্যক্তি তথায় উপস্থিত হন। হরিদাস সমাধির পূর্বানুষ্ঠান শেষ করিয়া মহারাজ রণজিৎ সিংহকে এই কথা বলেন যে, 'মহারাজ! আমাকে চল্লিশ দিবসের পরদিনেই যেন মৃত্তিকা হইতে উত্তোলন করা হয়।' মহারাজ তাহাতে স্বীকৃত হইলে, হরিদাস যোগাবলম্বন করিলেন। যোগাসনে বসিবার অল্পক্ষণ পরেই ইঁহার বাহ্যজ্ঞান রহিত হইয়া যায়। তখন রণজিৎ সিংহের আজ্ঞায় বলরাম মিশ্র হরিদাসকে একটি কাষ্ঠের সিন্দুকের মধ্যে রাখিয়া চাবিবন্ধ করিয়া দেন। ঐ সিন্দুক পূর্বোল্লিখিত বারদ্বারীর মধ্যে গর্ত খনন করিয়া পুতিয়া রাখা হয়। এত করিয়াও মহারাজের সন্দেহ মিটিল না। তিনি ঐ সমাধির উপর যব বুনিতে, বারদ্বারীর দ্বারসকল ইষ্টক দ্বারা গাঁথাইয়া গৃহের চতুর্দিক বন্ধ করিয়া দিতে ও প্রহরী নিযুক্ত করিতে আদেশ করিলেন। এইরূপ অবস্থায় হরিদাসকে ঊনচল্লিশ দিবস পর্যন্ত মৃত্তিকা মধ্যে রাখিয়া, চল্লিশ দিবসের মধ্যাহ্নকালে সমাধিপ্রাপ্ত হরিদাসকে মৃত্তিকা খনন করিয়া উঠান হয়। যোগীকে উঠাইবার পূর্বে মহারাজ রণজিৎ সিংহ, পলিটিক্যাল এজেন্ট কাপ্তেন ওয়েড, ডাক্তার ম্যাকগ্রেগর, ডাক্তার ম্যরে, জেনারেল ভেণ্টুরা প্রভৃতি বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি ঐ স্থান পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখেন; কিন্তু

কেহই কোনরূপ সন্দেহজনক চিহ্ন দেখিতে পান নাই। বারম্বারীর গ্রথিত প্রাচীর ভাঙ্গা হইলে সকলেই দেখিলেন, সমাধির উপর এক হস্ত পরিমিত যবের গাছ জন্মাইয়াছে। মৃত্তিকা খনন করিয়া সিন্দুক পরীক্ষা করিয়া সকলেই দেখেন যে, উহা পূর্বের ন্যায় চাবি-বন্ধ রহিয়াছে। মহারাজের অনুমতিক্রমে বাক্সের চাবি খোলা হইলে সকলেই দেখিলেন, হরিদাস পূর্বের ন্যায় যোগাসনে বসিয়া আছেন। রেসিডেন্সি সার্জন ম্যাক্‌গ্রেগর ও ডাক্তার ম্যরে উভয়ে সাধুকে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে তাঁহার সর্বাঙ্গ শীতল এবং দেহে প্রাণ নাই; বুক পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, বুকে স্পন্দন-শব্দ নাই। চোখের পাতা উল্টাইয়া দেখিলেন, চোখে ঘোলা পড়িয়া আছে। ডাক্তার মহাশয়েরা সমস্ত দেহ পরীক্ষা করিবার পর সবিস্ময়ে যখন বলিলেন, এ দেহ পুনর্জীবিত হওয়া অসম্ভব, তখন সাধুর শিষ্যেরা গুরুর চৈতন্যসম্পাদনের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কয়েক ঘণ্টাকাল শুশ্রূষা করিবার পর সাধুর জড়দেহে প্রাণের সঞ্চার হইল। ক্রমে তিনি চক্ষুরুন্মীলন করিলেন, দুই একটি কথা কহিতে লাগিলেন, এবং হস্ত-পদাদি নাড়িতে লাগিলেন। ডাক্তারেরা তাঁহাকে পুনরায় পরীক্ষা করিয়া অবাক হইয়া গেলেন। সংজ্ঞাহীন সাধু সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইলে মহারাজ রণজিৎ সিংহ তাঁহার সম্মানের জন্য কয়েকটি তোপধ্বনি করিতে আজ্ঞা দেন। ডাক্তার ম্যাক্‌গ্রেগর তাঁহার পুস্তকে হরিদাসের বিষয়ে কিরূপ লিখিয়াছেন, দেখুন,—

'A Fakir who arrived at Lahore engaged to bury himself for, any length of time, shut up in a box, and without either food or drink. Runjit naturally, disbelieved the man's assertions, and was determined to put them to the test. For this purpose the Fakir was shut up in an wooden box, which was placed in a small apartment below middle of the ground; there was a folding door to his box, which was secured by lock and key. Surrounding this apartment there was the garden house, the door of which was likewise locked, and out-side the whole, a high wall, having its doorway built up with bricks and mud. In order to prevent any one from approaching the place, a line of *Sentries* was placed, and relieved and regular intervals. The strictest watch was kept up for the space of forty days and forty nights.

'At the expiration of which period (forty days) the Maharajah, attended by his grandson and several of his *Sardars*, as well as General Ventura, Captain Wade, and myself proceded to disinter the Fakir. The bricks and the mud were removed from the outer doorway, the door of the garden house was next unlocked, and lastly that of the wooden box containing the Fakir; the latter was found covered whith a white sheet, on removing which, the figure of the man represented itself in a sitting posture, his hands and arms were pressed to his sides and his legs and thighs crossed. The first step of the operation of resuscitation consisted in pouring over his head a quantity

of warm water ; after this, a hot cake of *atta* was placed on the crown of his head ; a plug of wax was next removed from one of his nostrils, and on this being done, the man breathed strongly through it. The mouth was now opened, and the tongue, which had been closely applied to the roof of the mouth, brought forward and both it and lips anointed with *ghee* during this part of the proceeding I could not feel the pulsation of the wrist, though the temperature of the body was much above the natural standard health. The legs and arms being extended and the eyelids raised, the former were well rubbed, a little *ghee* applied to the latter. Eyballs presented a dimmed, suffused appearance, like those of a corpse. The man now evinced sings of returning animation, the pulse become perceptible at the wrist whilst the unnatural temperature of the body rapidly diminished. He made several ineffectural efforts to speak, and at lenght uttered a few words, but in a tone so low and feeble as to render them inaudible. By and by his speech was re-established and he recognised some of the by-standers, and addressed the Maharajah, who was seated opposite to him watching all his movements, when the Fakir was able to converse the completion of the feat was announced by the discharge of guns, and other demonstrations of joy. A rich chain gold was placed round his neck by Ranjit and earrings and shawls were presented to him '

—*Dr. Mc. Gregor.*

হরিদাসের আর দুইটি ক্ষমতা জন্মিয়াছিল। তিনি জলের উপর দিয়া হাঁটিয়া বেড়াইতে পারিতেন এবং যোগবলের দ্বারা শূন্যে অবস্থিতি করিতে পারিতেন। ইনি কত বয়সে এবং কোথায় দেহরক্ষা করেন, তাহার সবিশেষ বিবরণ জানিবার উপায় নাই ; তবে এরূপ শুনিতে পাওয়া যায় যে, তিনি একশত বৎসরেরও অধিককাল জীবিত ছিলেন।

—:০:—

যবন হরিদাস

১৩৭১ শকাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে নদীয়া জেলার অন্তর্গত বুড়ন গ্রামে সুমতি ঠাকুরের ঔরসে গৌরী দেবীর গর্ভে হরিদাসের জন্ম হয়। হরিদাসের বয়স যখন ছয় বৎসর, সেই সময়ে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়, জননীও স্বামীর সহিত সহমৃতা হন। নিরাশ্রয় বালক হরিদাস যবনের হস্তে পড়িয়া মুসলমান-ধর্মে দীক্ষিত হন। হরিদাস বাল্যকাল হইতেই অনুরাগের সহিত মুসলমান ধর্মগ্রন্থ পাঠ করিতেন। বাল্যকালেই তাঁহার ধর্মানুরাগ প্রবল হইয়া উঠে। হরিদাস, অদ্বৈতের ধর্মানুরাগের কথা শুনিয়া শান্তিপুর যাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। সেই স্থানে যাইয়া তিনি দেখেন, অদ্বৈত সমাধিস্থ হইয়া আছেন। হরিদাস অদ্বৈতকে ধ্যান-মগ্ন দেখিয়া ঐরূপ ভাব পাইবার জন্য ব্যাকুল হন এবং তাঁহার সমাধিভঙ্গের প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান থাকেন। অদ্বৈতের সমাধিভঙ্গ হইলে, হরিদাস বিনীত ভাবে তাঁহার নিকট ধর্মযাচঞা করেন। অদ্বৈত প্রভু প্রথমে তাঁহাকে ম্লেচ্ছ বলিয়া ধর্ম দান করিতে অস্বীকার করেন, কিন্তু তাঁহার বিনয়, সরলতা ও ব্যাকুলতা দেখিয়া মুগ্ধ হন ও তাঁহাকে হরিনাম মন্ত্রে দীক্ষিত করেন। হরিদাস হরিভক্তিপরায়ণ হইয়া সতত হরিনাম করিতেন। হরিনাম জপ করিবার জন্য তিনি ফুলিয়া গ্রামের সন্নিহিত কোন নির্জন স্থানে একটি কুটীর নির্মাণ করিয়াছিলেন। তিনি ঐ কুটীর মধ্যে বসিয়া একমনে হরিনাম জপ করিতেন।

হরিদাস মুসলমান ধর্ম ত্যাগ করিয়া হিন্দুর ন্যায় হরিনাম করায়, স্থানীয় কাজী ইঁহার উপর অতিশয় বিরক্ত হন এবং মুসলমান-ধর্মে পুনরায় আনয়ন করিবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করেন; কিন্তু তাঁহার সকল চেষ্টা বিফল হইয়া যায়। ইসলাম-ধর্মে ইঁহাকে পুনরায় আনয়ন করিতে অসমর্থ হইয়া, কাজী সাহেব শাস্তির জন্য হরিদাসকে নবাবের নিকট প্রেরণ করেন। নবাব বাহাদুর কাজীর পরামর্শে হরিদাসকে বেত্রাঘাত করিয়া মারিয়া ফেলিতে আজ্ঞা দেন। হরিদাস বেত্রাঘাতে জর্জরিত ও অচৈতন্য হইয়া ভূপতিত হইলে, সকলেই মনে করিয়াছিল যে, হরিদাসের আত্মা তাঁহার দেহ ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছে। কাজী হরিদাসের অবস্থা দেখিয়া পাইকদিগকে ঐ দেহ ভূগর্ভে প্রোথিত করিতে বলেন। পাইকেরা হরিদাসকে গোরস্থানে লইয়া গিয়া মৃত্তিকামধ্যে স্থাপন করিবার উপক্রম করিতেছে, এরূপ সময়ে ইঁহার সংজ্ঞা হয়। পাইকেরা এই সংবাদ কাজীর কর্ণগোচর করে। কাজী সাহেব, জীবন্ত মনুষ্যকে কবরস্থ করা ধর্মবিরুদ্ধ মনে করিয়া, উঁহাকে নদীর জলে নিক্ষেপ করিতে আদেশ করেন। হরিদাস গঙ্গায় নিক্ষিপ্ত হইয়া, ভাসিতে ভাসিতে তীরে উঠেন। তিনি কাজীর ভয়ে ভীত হইয়া, সপ্তগ্রামের*

* সপ্তগ্রামের নামোৎপত্তি বিষয়ে এরূপ কথিত আছে যে, পুণ্যসলিলা ভাগীরথীর ন্যায় এক সময়ে সরস্বতী আর্যজাতির পরমারাধ্যা তটিনী ছিলেন। সরস্বতী পশ্চিম হিমালয় হইতে সমুদ্ভূত হইয়া ব্রহ্মসর দিয়া কুরুক্ষেত্রে প্রবেশ করেন এবং তথা হইতে পশ্চিম দিকে প্রসৃত হইয়া সমুদ্র পর্যন্ত প্রবাহিত হন। কান্যকুব্জাধিপতি

অন্তর্গত চাঁদপুর গ্রামে, বলরাম আচার্যের বাটীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। আচার্য মহাশয় অতি হরিভক্ত ছিলেন। তিনি হরিদাসকে পাইয়া, পরম প্রীতির সহিত তাঁহাকে আপন বাসভবনে রাখিয়া দেন। যে সময়ে হিন্দুসমাজ মুসলমানদিগকে অতি ঘৃণার চক্ষে দেখিত, যে সময়ে মুসলমানগণ হিন্দুর বাসগৃহে পদার্পণ করিলে, গৃহদেবতা হইতে সমস্ত গৃহসামগ্রী পর্যন্ত অপবিত্র হইত, যে সময়ে হিন্দুগণ মুসলমানসংস্পর্শে থাকিলে জাতিচ্যুত হইত, সেই সময়ে আচার্য মহাশয় কোনো দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া প্রফুল্লিতান্তঃকরণে তাঁহাকে আশ্রয় প্রদান করেন।

হরিদাস ভক্তাবাসরূপ অভেদ্য দুর্গে আশ্রয় লাভ করিয়া প্রাণ ভরিয়া হরিনাম করেন। তিনি নাম-রসে মাতোয়ারা হইয়া কখনো বা দুই চক্ষে গঙ্গা-যমুনার প্রপাত প্রদর্শন করিতেন, কখনো বা প্রেমে বিগলিত হইয়া উন্মত্তের ন্যায় নৃত্য করিতেন। হরিদাসের ভাব-ভক্তি দেখিয়া গ্রামের লোকেরা বলিতেন, বলরাম একটা পাগল পুষিয়াছে।

ঐ সময়ে নবাবের তহশীলদার গোবর্ধন দাসের একমাত্র পুত্র রঘুনাথ দাস, বলরাম আচার্যের নিকট অধ্যয়ন করিতে যাইতেন। তিনি হরিদাসের নাম-গানে বিমোহিত হইয়া আপন লেখাপড়া সমস্ত ছাড়িয়া দেন। রঘুনাথের পিতা, রঘুনাথের এই আকস্মিক পরিবর্তন দেখিয়া, তিনি আপন কুলপুরোহিত বলরাম আচার্যকে হরিদাসের অন্যত্রে বাসা নির্মাণ করিয়া দিতে বলেন। হরিদাস, তহশীলদারের মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া, তথা হইতে শান্তিপুরে আসিয়া ভাগীরথীর তীরে বাস করেন। ঐ স্থানে হরিদাস নবানুরাগে, প্রফুল্লমনে, উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম কীর্তন করিতেন। প্রত্যহ লক্ষাধিক-বার হরিনাম জপ না করিয়া হরিদাস জলগ্রহণ করিতেন না। ইঁহার ভক্তি এবং বিশুদ্ধ চরিত্রে মোহিত হইয়া সকলে ইঁহাকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিত।

জনৈক জমিদার, হরিদাসের সাধনায় বিঘ্নোৎপাদনার্থ একদা রজনীযোগে তাঁহার কুটীরে একটি দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোককে প্রেরণ করেন। ঐ বেশ্যা কুটীরে উপস্থিত হইলে, হরিদাস তাহাকে নামজপ শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে বলেন, কিন্তু সমস্ত রাত্রিতেও ইঁহার নামজপ শেষ হইল না। ঐ বেশ্যা পুনরায় পরদিন সন্ধ্যার সময় আসিয়া উপস্থিত হইল এবং হরিদাসকে ব্যঙ্গ করিবার জন্য তাঁহারই সন্নিকটে বসিয়া নামজপের অনুকরণ করিতে লাগিল। ঐ বারবিলাসিনী কয়েক ঘণ্টাকাল ঐরূপ করিয়া হরিদাসের প্রতি বিরক্ত হইয়া চলিয়া গেল। অর্থের প্রলোভনে পড়িয়া ঐ বারবণিতা পরদিন পুনরায় হরিদাসের কুটীরে আসে ও পূর্বদিনের ন্যায় ব্যঙ্গ করিতে থাকে।

প্রিয়বন্তের সপ্তপুত্র (১ম আগ্নিধ্র, ২য় রমণক, ৩য় ভপিস্তু, ৪র্থ স্বরবান্, ৫ম বরাট, ৬ষ্ঠ সবন্, ৭ম দ্যুতিমন্ত) সরস্বতী-তীরে বাসুদেবপুর, বাঁশবেড়িয়া, কৃষ্ণপুর, নিত্যানন্দপুর, শিবপুর, শম্বচোরা এবং বদলঘাটী, এই সাতটি গ্রামে অবস্থান করিয়াছিলেন বলিয়া উহাদের সমষ্টির নাম সপ্তগ্রাম হয়। যে সরস্বতী নদী এখন একটি সামান্য পয়ঃপ্রণালী আকারে প্রবাহিত হইয়া আপনার উভয় তীরস্থ গ্রামগুলিকে সংক্রামক রোগে জর্জরিত করিতেছে, পূর্বে উহা সামুদ্রিক পোতসকলকে বক্ষে ধারণ করিয়া গর্বে নৃত্য করিত। সপ্তগ্রাম বঙ্গদেশের কেন্দ্রস্থল ছিল।

ইহার বিস্তারিত বিবরণ আমার 'ভ্রমণ-কাহিনী' নামক পুস্তকে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

ব্যঙ্গ করিতে করিতে কিছুক্ষণ পরে ঐ বারাঙ্গনা হরিনামের প্রেমে উন্মত্ত হইয়া উঠে ও পূর্বকৃত পাপের আত্মগ্লানিতে দগ্ধ হইয়া তাঁহার নিকট হরিনাম মন্ত্রে দীক্ষিত হয়।

এই ঘটনার পর হরিদাস নবদ্বীপে গমন করিয়া বৈষ্ণবদিগের সহিত মিলিত হন। তাঁহার ভক্তি ও প্রেমে সাধু বৈষ্ণবগণ মোহিত হইয়া তাঁহাকে বিলক্ষণ শ্রদ্ধা করিতেন। চৈতন্যদেব নীলাচলে গমন করিলে, হরিদাস তথায় গমন করেন এবং সাধু বৈষ্ণবগণ-পরিবেষ্টিত হইয়া শেষ-জীবন সুখে অতিবাহিত করেন। চৈতন্যদেবের তিরোভাবের পূর্বে হরিদাসের জীবনান্ত হয়। হরিদাসের অন্তিমকালে চৈতন্যদেব সশিষ্য তাঁহার কুটীর-প্রাঙ্গণে আসিয়া কীর্তন আরম্ভ করেন। হরিদাসও নামজপ করিতে করিতে দেহত্যাগ করেন। হরিদাসের জীবনান্ত হইলে, চৈতন্যদেব শিষ্যবর্গের সহিত মিলিত হইয়া কীর্তন করিতে করিতে তাঁহার শবদেহ সমুদ্রতীরে লইয়া যান ও বালুকা গর্ভে তাঁহার সমাধি করেন।

—:০:—

সাধক রামপ্রসাদ

হালিসহরের অন্তর্গত 'কুমারহট্ট' বা কুমারহাটা গ্রামে ১৬৪০ হইতে ১৬৪৫ শকের মধ্যে রামপ্রসাদ বৈদ্যকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যে স্থানে তিনি জন্মিয়াছিলেন, এখন তাহার আর কোন চিহ্ন নাই, তবে তাঁহার সাধনার পঞ্চমুণ্ডি আসনের কিয়দংশ স্থান আজিও বিদ্যমান আছে।

রামপ্রসাদের পিতার রামরাম সেন।* ইনি যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন পুত্রের সৎশিক্ষার জন্য ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। অতি অল্প বয়সেই রামপ্রসাদ সংস্কৃত, পারস্য ও বঙ্গভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন। শুনা যায় যে, তিনি ১৬ বৎসর বয়সের সময়েই অসাধারণ কবিত্বশক্তি দেখাইয়াছিলেন। তন্ত্রশাস্ত্রের প্রতি ইঁহার বিশেষ দৃষ্টি থাকায় কৌলাচার ধর্মেই বিলক্ষণ শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রকাশ করিতেন। রামপ্রসাদ জ্ঞানাংশেও নিতান্ত হীন ছিলেন না। তাঁহার স্বরচিত পদাবলীতেই তাঁহার পরিচয় পাওয়া যায়।

অতি অল্প বয়সেই রামপ্রসাদের কোমল স্কন্ধে সংসারের গুরুভার পতিত হইয়াছিল। পিতার মৃত্যুর পর রামপ্রসাদ বাধ্য হইয়া কলিকাতায় চাকুরীর চেষ্টায় আসিয়াছিলেন। এরূপ শুনিতে পাওয়া যায় যে, সেই সময়ে রামপ্রসাদের বয়স ১৭।১৮ বৎসর মাত্র ছিল। তিনি কলিকাতায় বা তন্নিকটস্থ কোন ধনী ব্যক্তির গৃহে মুহুরীর কার্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু কাহার নিকটে কর্ম করিতেন, তাহা জানিবার উপায় নাই। এই বিষয়ে দুই প্রকার জনশ্রুতি আছে। কেহ বলেন, ভুকৈলাসের দেওয়ান গোকুলচন্দ্র ঘোষালের নিকট, আবার কেহ বলেন, দুর্গাচরণ মিত্র মহাশয়ের নিকট দাসত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। যাহা হউক, তিনি কার্যে নিযুক্ত হইয়া অতি পরিশ্রমসহকারে কার্য করিতে লাগিলেন। রামপ্রসাদ প্রতিদিন আয়-ব্যয়ের হিসাব করিয়া কৈফিয়ৎ কাটিয়া, খাতার অবশিষ্ট প্রত্যেক স্থানে এক একটি ভক্তিরসাভিষিক্ত কালী-গুণানুবাদ-পরিপূরিত পদ লিখিয়া রাখিতেন। রামপ্রসাদ অতি শিশুকাল হইতে ধর্মভীরু ও কালীভক্ত ছিলেন। তিনি সর্বদা কালীর ভাবে মোহিত হইয়া থাকিতেন। তাঁহার মনের ভাব স্বতঃই সুমধুর সঙ্গীতে ব্যক্ত হইত। বোধ হয়, সে সময়ে তাঁহার বাহ্যজ্ঞান

* অনেকে রামপ্রসাদকে রামদুলাল সেনের পুত্র বলিয়া উল্লেখ করেন; কিন্তু তাহা ঠিক নহে। ইহার প্রমাণস্বরূপ তাঁহার বিদ্যাসুন্দর হইতেই কয়েক স্থল উদ্ধৃত করিয়া দেখান হইল ;—

রামরাম সেন নাম, মহাকবি গুণধাম,
সদা যারে সদয়া অভয়া।
তৎসুত রামপ্রসাদে, কহে কোকনদ পদে,
কিঞ্চিৎ কটাক্ষে কর দয়া॥

(গণেশ-বন্দনা)

থাকিত না, সেই জন্যই তিনি হিসাবের পাকা খাতায় ঐরূপ করিতেন। এক দিবস তাঁহার উর্ধতন কর্মচারী দেখিলেন যে, নির্বোধ মুহুরী খাতার মধ্যে গান লিখিয়া জমিদারের পাকা খাতা নষ্ট করিয়াছে। হিসাবের খাতায় গান লেখা দেখিয়া, তিনি অতিশয় বিরক্ত এবং ক্রুদ্ধ হইলেন এবং অনতিবিলম্বে ঐ সকল খাতা তাঁহাদের প্রভুকে দেখাইলেন। প্রভু খাতার প্রথম পৃষ্ঠাতেই রামপ্রসাদের এই গীতটি দেখিলেন,—

'আমায় দাও মা তবিলদারী,
আমি নিমকহারাম নই শঙ্করী।
পদ-রত্নভাণ্ডার সবাই লুটে, ইহা আমি সইতে নারি।
ভাঁড়ার জিম্মা যার কাছে মা, সে যে ভোলা ত্রিপুরারি।
শিব আশুতোষ স্বভাব-দাতা তবু জিম্মা রাখ তারি॥
অর্ধ-অঙ্গ জায়গীর, তবু শিবের মাইনে ভারি।
আমি বিনা মাইনের চাকর, কেবল চরণ-ধূলার অধিকারী॥
যদি তোমার বাপের ধারা ধর, তবে বটে আমি হারি।
যদি আমার বাপের ধারা ধর, তবে ত মা পেতে পারি॥'
প্রসাদ বলে এমন পদের বালাই লয়ে আমি মরি।
ও পদের মত পদ পাই ত, সে পদ লয়ে বিপদ সারি॥'

প্রভু এই গীতটি দুই-তিনবার পাঠ করিয়া ভাবে গদগদচিত্ত হইয়া রামপ্রসাদকে ডাকাইলেন। রামপ্রসাদ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলে, তিনি প্রেমাশ্রুপূর্ণলোচনে কহিলেন, 'রামপ্রসাদ! তুমি অতি সাধুপুরুষ, তোমায় আর পরাজ্ঞাবর্তী হইয়া থাকিবার প্রয়োজন নাই। আমি তোমায় মাসিক ত্রিশ টাকা বৃত্তি নিরূপণ করিয়া দিলাম, তুমি তোমার ইচ্ছামত স্থানে থাকিয়া সুখে কালযাপন কর।'

এই ঘটনা হইতেই রামপ্রসাদের ভাবী জীবনের পথ পরিষ্কৃত হইল। যদি ধনস্বামী

ধনহেতু মহাকুল, পূর্বাপর শুদ্ধমূল,
কীর্তিবাস তুল্য কীর্তি কই।
দানশীল দয়াবন্ত, শিষ্ট শান্ত গুণবন্ত,
প্রসন্না কালিকা কৃপাময়ী॥
সেই বংশ-সমুদ্ভূত, ধীর সর্বগুণযুত,
ছিল কত কত মহাশয়।
অনতিচর দিনান্তর, জন্মিলেন রামেশ্বর,
দেবীপুত্র সরল হৃদয়॥
তদঙ্গজ রামরাম, মহাকবি গুণধাম,
সদা যারে সদয়া অভয়া।
প্রসাদ তনয় তার, কহে পদ কালিকার,
কৃপাময়ী ময়ি কুরু দয়া।

(বিদ্যাসুন্দর)

• এই সকল দেখিয়া বেশ অনুমান হয় যে, রামপ্রসাদ সেন কখনই রামদুলাল সেনের পুত্র নহেন। রামদুলাল, রামপ্রসাদের পুত্র।

তাঁহার প্রতি গুণ-বিমূঢ়ের ন্যায় ব্যবহার করিতেন, তাহা হইলে রামপ্রসাদের পরিণাম কি হইত ? হয় ত তাঁহার জীবন কেবল দুঃখ-ভার-বহনেই অতিবাহিত হইত এবং তাঁহার রসভাবময়ী লেখনী হয় ত কেবল খাতা লিখিয়া ক্ষুণ্নমনে ক্ষান্ত থাকিত। কিন্তু গুণগ্রাহী প্রভুর সামাজিকতা ও বদান্যতা-গুণে তাঁহার মন চিরদিনের মত স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়াছিল।

রামপ্রসাদ বাটী প্রত্যাগত হইয়া নিশ্চিন্তে অহরহঃ শ্যামা-গুণানুকীর্তনে অভিনিবিষ্ট হইলেন এবং পঞ্চমুণ্ডি আসন প্রস্তুত করিয়া করালবদনা কালীর সাধনা করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে রামপ্রসাদের আয়বৃদ্ধির আরও একটি উপায় হইয়াছিল। যাহাদিগের কীর্তনাদি কোন গীতের প্রয়োজন হইত, তাহারা সকলেই তাঁহার নিকট রচনা করাইয়া লইয়া যাইত এবং কালীর ও কবির প্রণামী স্বরূপ নানাপ্রকার উপহার প্রদান করিত। ঐ সময়ে রামপ্রসাদের যেরূপ আয় হইতে লাগিল, তাহাতে তিনি অর্থপ্রিয় হইলে, সংসারের আবশ্যক ব্যয় নির্বাহ করিয়াও, অনায়াসে বিপুল ধনসঞ্চয় করিতে পারিতেন ; কিন্তু তিনি সে প্রকৃতির লোক ছিলেন না। তাঁহার হাতে কিছু থাকিলে সম্মুখে দানোচিত পাত্র উপস্থিত দেখিলেই, তাহাকে যথাসাধ্য দান করিতেন।

রামপ্রসাদ কোন্ সময়ে বিবাহ করিয়াছিলেন, তাহা ঠিক বলা যায় না। কেহ কেহ বলেন, অনুমান ১৬ বৎসর বয়সে তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। এরূপ জনশ্রুতি আছে যে, রামপ্রসাদ অপেক্ষা তাঁহার স্ত্রী অধিকতর সৌভাগ্যবতী ছিলেন ; কারণ, তিনি প্রায়ই স্বপ্নযোগে শ্যামা মায়ের সাক্ষাৎ লাভ করিতেন। রামপ্রসাদ একস্থলে বলিয়াছেন,—

'ধন্য দারা স্বপ্নে তারা প্রত্যাদেশ তাবে।
আমি কি অধম এত বৈমুখ আমারে॥
জন্মে জন্মে বিকায়েছি পাদপদ্মে তব।
কহিবার কথা নয়, বিশেষ কি কব॥'

ইহা হইতেই অনুমান হয়, তাঁহার স্ত্রী ভাগ্যবতী ছিলেন।

কুমারহট্ট গ্রাম মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের জমিদারীভুক্ত ছিল। এই গ্রাম ভাগীরথীর নিকটস্থ বলিয়া মহারাজ এই স্থানে এক ধর্মাধিকরণ ও বায়ুসেবনের জন্য একটি অট্টালিকা নির্মাণ করাইয়াছিলেন। অবসরক্রমে তিনি এখানে আসিয়া বিশ্রাম করিতেন। রামপ্রসাদের গুণরূপ প্রফুল্ল-অরবিন্দ-বিনির্গত যশঃ পরিমল, প্রশংসাসমীরণসহকারে চতুর্দিক আমোদিত করায়, গুণগ্রাহী যশোরাশি নবদ্বীপাধিপতি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় মহোদয়ের মানস-মধুকরকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। এরূপ শুনিতে পাওয়া যায় যে, রাজা তাঁহার অসামান্য গুণের বশবর্তী হইয়া মাসিক বৃত্তি নির্ধারণপূর্বক স্বীয় সভাসদ্‌গণের মধ্যে সন্নিবেশিত করিবার জন্য বিস্তর চেষ্টা পাইয়াছিলেন ; কিন্তু রামপ্রসাদের তাদৃশ বিষয়াকাঙ্ক্ষা না থাকায়, তিনি মহারাজের প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারেন নাই। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের অনুরোধ প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিল বলিয়া, তিনি কিছুমাত্র অসন্তোষ প্রকাশ করেন নাই কিংবা দুঃখিতও হন নাই ; বরং তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে 'কবিরঞ্জন' উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন, এবং কবির উৎসাহ বর্ধনের জন্য ১১৬৫ সালে ১৪ বিঘা নিষ্কর ভূমি দান করিয়াছিলেন।

রামপ্রসাদ রাজদত্ত উপাধিপ্রাপ্ত হইয়া তাঁহার গৌরব-রক্ষার জন্য, এই সময়ে

'বিদ্যাসুন্দর' নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া ঐ গ্রন্থের 'কবিরঞ্জন' নাম প্রদান করেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র পুনরায় কুমারহট্টে আগমন করিলে, তিনি ঐ পুস্তকখানি তাঁহার সমক্ষে পাঠ করেন।* রাজা, বিদ্যাসুন্দর শ্রবণ করিয়া কবিরঞ্জনের কবিত্ব-শক্তির যথোচিত প্রশংসা করেন। এইরূপে রামপ্রসাদের কবিকীর্তি প্রচার এবং কবিরঞ্জন বিদ্যাসুন্দরের জন্ম হয়।

কুমারহট্টে অচ্যুত গোস্বামী নামে এক ব্যক্তি বাস করিতেন। তাঁহাকে সকলে আজু গোঁসাই বলিয়া ডাকিত। ইঁহার দ্রুত রচনাশক্তির ক্ষমতা ছিল। আজু গোঁসাই রামপ্রসাদের যখনই গান শুনিতে পাইতেন, তখনই তিনি পরিহাস-রসিকতার সহিত তাহার উত্তর দিয়া রামপ্রসাদকে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিতেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র সেইজন্য কখনও কখনও উভয়কে একত্র করিয়া সেই আমোদ দেখিতেন। এক দিবস রামপ্রসাদ গাইতেছেন—

এই সংসার ধোকার টাটী! ও ভাই আনন্দ-বাজারে লুটী॥
ওরে, ক্ষিতি জল বহ্নি বায়ু, শূন্যে পাঁচে পরিপাটী॥

'বিদ্যাসুন্দর' কোন বঙ্গীয় কবির স্বকপোলকল্পিত কাব্য নহে। বররুচী প্রণীত সংস্কৃত গ্রন্থই ইহার মূল। সেই গ্রন্থের আভাস গ্রহণ করিয়া প্রথমে শ্রীকবিবল্লভ 'কালিকামঙ্গল বিদ্যাসুন্দব' নাম দিয়া গৌড়ীয় ভাষায় রচনা করেন, তৎপরে প্রাণরাম চক্রবর্তী এবং তাহার পর রামপ্রসাদ ও সর্বশেষ ভারতচন্দ্র স্ব স্ব কবিত্বে রচনা করিয়াছিলেন।

'কালিকামঙ্গল বিদ্যাসুন্দর' কোন্ সময়ে রচিত হইয়াছিল দেখুন—

'বসুদ্বয় বাণ চন্দ্র শক নিরূপণ।
কালিকামঙ্গল গীত হৈল সমাপন। (১৫৮৮)
শ্রীকবিবল্লভ দ্বিজ রচিত আছিল।
এই গ্রন্থ রামচন্দ্র প্রকাশ করিল॥
আছিল অনেক লুপ্ত শব্দ একে আর।
শোধন পূর্বক পুনঃ হইল উদ্ধার॥
বিদ্যাসুন্দরের এই প্রথম প্রকাশ।
তদনন্তর কৃষ্ণরাম বিনতা যার বাস॥
তাঁহার রচিত গ্রন্থ আছে ঠাঁই ঠাঁই।
রামপ্রসাদের কৃত দেখা আর নাই॥
পরেতে ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গলে।
রচিলেন উপাখ্যান প্রসঙ্গের ছলে॥'

অন্নদামঙ্গলের শেষে ভারতচন্দ্র লিখিয়াছেন—

বেদ লৈয়া ঋষিরসে ব্রহ্ম নিরূপিলা। (১৬৭০)
সেই শকে এই গ্রন্থ ভারত রচিলা॥

অতএব ইহাতে জানা যায় যে, কালিকামঙ্গল রচনা হওয়ার ৮৬ বৎসর পরে অন্নদামঙ্গল রচিত হইয়াছে।

প্রথমে প্রকৃতি স্থলা, অহঙ্কারে লক্ষ কোটি।
যেমন সরার জলে সূর্য-ছায়া, অভাবেতে স্বভাব যেটি ॥
গর্ভে যখন যোগী তখন, ভূমে প'ড়ে খেলাম মাটি।
ওরে ধাত্রীতে কেটেছে নাড়ী, মায়ার বেড়া কিসে কাটি ॥
রমণী-বচনে সুধা, সুধা নয় সে বিষের বাটী।
আগে, ইচ্ছাসুখে পান ক'রে, বিষের জ্বালায় ছটফটী ॥
আনন্দে রামপ্রসাদ বলে, আদি পুরুষের আদি মেয়েটি।
ও মা, যাহা ইচ্ছা তাহাই কর মা, তুমি যে পাষাণের বেটী ॥

রামপ্রসাদের গান শুনিয়া, আজু গোঁসাই এই গানটি গাইতে লাগিলেন—

এ সংসার সুখের কুটি।
ওরে খাই দাই আর মজা লুটি ॥
যার যেমন মন, তেমনি ধন, মন কর রে পরিপাটি।
ওহে সেন অল্পজ্ঞান বুঝ কেবল মোটামুটি ॥
ওরে ভাই, বন্ধু, দারা, সুত, পি'ড়ে পেতে দেয় দুধের বাটি ॥
তুমি ইচ্ছা সুখে ফেলে পাশা কাঁচায়েছ পাকা গুটি ॥
মহামায়ার বিশ্ব ছাওয়া কোথা যাবে মায়া কাটি।
আমার মায়ের দোহাই দিয়ে, ধর্ গে বাবার চরণ দুটি ॥

রামপ্রসাদ গাইতেছেন—

ডুব দে মন কালী ব'লে।
হৃদি-রত্নাকরের অগাধ জলে ॥
রত্নাকর নয় শূন্য কখন্, দু'চার ডুবে ধন না পেলে।
তুমি দম সামর্থে একডুবে যাও, কুল-কুণ্ডলিনীর কূলে ॥
জ্ঞান-সমুদ্রের মাঝে রে মন, শক্তিরূপা মুক্তা ফলে।
তুমি ভক্তি ক'রে কুড়িয়ে পাবে, শিবযুক্তি মতন চাইলে ॥
কামাদি ছয় কুম্ভীর আছে, আহার লোভে সদাই চলে।
তুমি বিবেক-হলুদ গায়ে মেখে যাও, ছোঁবে না তার গন্ধ পেলে ॥
রতন মাণিক কত শত প'ড়ে আছে সেই জলে।
রামপ্রসাদ বলে ঝম্প দিলে, মিলবে রতন ফলে ফলে ॥

আজু গোঁসাই উত্তর দিতেছেন—

ডুবিস্‌নে মন ঘড়ি ঘড়ি।
দম আটকে যাবে তাড়াতাড়ি ॥
একে তোমার কফো নাড়ী, ডুব দিও না বাড়াবাড়ি।
তোমার হ'লে পরে জ্বর-জাড়ি, যেতে হবে যমের বাড়ী ॥
অতিলোভে তাঁতি নষ্ট, মিছে কষ্ট কেন করি।
তুই ডুবিস্‌নে মন, ধর গে ভেসে, রাধাশ্যামের চরণ-তরী ॥

রামপ্রসাদ গাইতেছেন,—

কাজ কি রে মন যেয়ে কাশী।
কালীর চরণ কৈবল্য-রাশি।

সার্ধ ত্রিশ কোটি তীর্থ, মাধের ও চরণবাসী।
যদি সন্ধ্যা জান, শাস্ত্র মান, কাজ কি হয়ে শ্মশানবাসী।
হৃৎকমলে ভাব ব'সে চতুর্ভুজা মুক্তকেশী।
রামপ্রসাদ এই ঘরে বসি, পাবে কাশী দিবানিশি॥

গোস্বামীর উত্তর,—

পেসাদে তোরে যেতেই হবে কাশী।
ওরে সেথায় গিয়ে দেখ্‌বিরে তোর মেসো আর মাসী॥
ঘরে ব'সে থাকিস্ যদি, ধ'রবে তোরে যক্ষ্মা কাসি।
এই বেলা নে তল্পি বেঁধে, পথের সম্বল রাশি রাশি॥

রামপ্রসাদ তান্ত্রিক মতাবলম্বী সাধক ছিলেন, সুতরাং তিনি উপাসনার অঙ্গবোধে অল্প পরিমাণে সুরা পান করিতেন, ইহাতে অনেকে তাঁহাকে মাতাল বলিত; কিন্তু তিনি তাহাতে ক্রুদ্ধ হইতেন না। এক দিবস তিনি পথিমধ্য দিয়া যাইবার সময়, কয়েক ব্যক্তির মুখে এই কথা শুনিলেন যে, 'ওরে মাতালটাকে পথ ছেড়ে দে।' রামপ্রসাদ ইহা শুনিয়াই গাইতে আরম্ভ করিলেন,—

ওরে সুরাপান করিনে আমি, সুধা খাই জয় কালী ব'লে,
মন-মাতালে মাতাল করে, মদ-মাতালে মাতাল বলে,
গুরুদত্ত গুড় লয়ে, প্রবৃত্তি মসলা দিয়ে, মা,
আমার জ্ঞান-শুঁড়ীতে চুয়ায় ভাটী, পান করে মোর মন-মাতালে।
মূল মন্ত্র যন্ত্র ভরা, শোধন করি বলে তারা মা;
রামপ্রসাদ বলে এমন সুরা খেলে চতুর্বর্গ মেলে॥

রামপ্রসাদ একবার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত মুর্শিদাবাদ গিয়াছিলেন। তথায় তিনি ভাগীরথী-বক্ষে নৌকামধ্যে গান করিতেছিলেন। দৈবযোগে নবাব সিরাজউদ্দৌলা নৌকা করিয়া তাঁহারই নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। তিনি রামপ্রসাদের গান শুনিতে পাইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে স্বীয় তরণীতে আনাইয়া গান করিতে আদেশ করিলেন। রামপ্রসাদ প্রথমে হিন্দি গান আরম্ভ করেন। তাহাতে নবাব বিরক্ত হইয়া রাজার নৌকায় যেরূপ গান হইতেছিল, সেইরূপ গান করিতে আদেশ করিলেন। ইহা শুনিয়া রামপ্রসাদ এমন সুন্দর শক্তিগুণ গান করিয়াছিলেন যে, তাঁহার করুণ স্বরে নবাবেরও পাষাণ হৃদয় দ্রব হইয়াছিল।

রামপ্রসাদ শক্তির উপাসনা করিতেন। তিনি পঞ্চবটীর তলে পঞ্চমুণ্ডী আসন প্রস্তুত করিয়া তাহাতে বসিয়া সাধনা করিতেন। ঐ আসন আজিও বর্তমান আছে।

রামপ্রসাদ সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক প্রবাদ প্রচলিত আছে, তম্মধ্যে যেগুলি অনেকে বিশ্বাস করেন, নিম্নে তাহার কয়েকটি প্রকাশ করিলাম।

রামপ্রসাদ স্বহস্তে অন্নপাক করিয়া নৃমুণ্ডমালিনী কালীকাদেবীকে উৎসর্গ করিবামাত্র, তিনি শিবারূপ ধারণ করিয়া তাঁহার নিকটে আসিয়া অন্নগ্রহণ করিয়াছিলেন।

এক দিবস রামপ্রসাদ বেড়া বাঁধিতেছিলেন ও আপন মনে শ্যামা-সঙ্গীত গান করিতেছিলেন। বেড়ার অপর পার্শ্বে থাকিয়া তাঁহার কন্যা জগদীশ্বরী তাঁহাকে সাহায্য করিতেছিলেন। জগদীশ্বরী কখন সেই স্থান হইতে চলিয়া গিয়াছিলেন, রামপ্রসাদ তাহা জানিতেন না; তিনি পূর্বের ন্যায় বেড়া বাঁধিতেছিলেন। জগদীশ্বরী

ফিরিয়া আসিয়া বেড়া বাঁধা অনেক হইয়াছে দেখিয়া, কে দড়ি ফিরাইয়া দিতেছিল, জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন রামপ্রসাদ বলিলেন, 'কেন মা! তুমিই ত দড়ি ফিরাইয়া দিতেছিলে?' পিতার কথা শুনিয়া জগদীশ্বরী বলিলেন, 'না, আমি বাড়ি গিয়াছিলাম। তখন রামপ্রসাদ বুঝিলেন যে, স্বয়ং দেবী তাঁহার কন্যারূপে দড়ি ফিরাইয়া দিতেছিলেন।'

এক দিবস রামপ্রসাদ গঙ্গাস্নান করিয়া বাটীতে আসিয়া শুনিলেন যে, একজন স্ত্রীলোক বহুদূর হইতে তাঁহার গান শুনিতে আসিয়াছেন। তিনি চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া আছেন। রামপ্রসাদ চণ্ডীমণ্ডপে গিয়া দেখিলেন, তথায় তিনি নাই, কেবল দুইটি বালিকা খেলা করিতেছে। রামপ্রসাদ উহাদিগকে স্ত্রীলোকটির কথা জিজ্ঞাসা করিলে, তাহারা বলিল, 'হাঁ, একটি মেয়েমানুষ আসিয়াছিল, সে তোমায় কাশীতে গিয়া গান শুনাইতে বলিয়া গিয়াছে।' রামপ্রসাদ বুঝিতে পারিলেন যে, কাশী হইতে স্বয়ং অন্নপূর্ণা তাঁহার গান শুনিতে আসিয়াছিলেন। রামপ্রসাদ তখনই আর্দ্র বস্ত্রে মাতাকে সঙ্গে লইয়া 'মন চলরে বারাণসী' ইত্যাদি গান করিতে করিতে কাশী-যাত্রা করিলেন। তিনি ত্রিবেণীর নিকটস্থ কোন গ্রামে সে রাত্রি অবস্থান করিলেন। সেই রাত্রিতে অন্নপূর্ণা তাঁহাকে স্বপ্নে এই জানাইলেন যে, 'রামপ্রসাদ! তোমায় আর এখানে আসিতে হইবে না, তুমি ঐ স্থানে থাকিয়াই আমায় গান শুনাও।' রামপ্রসাদ তাহাই করিলেন।

কালী-কীর্তন, কৃষ্ণকীর্তন ও বিদ্যাসুন্দর এই তিনখানি কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ প্রণয়ণ করেন। ঐ তিনখানি পুস্তকের মধ্যে কালী-কীর্তনই সর্বোৎকৃষ্ট। কালী-কীর্তন পাঠ করিলে ভাবজ্ঞজনের মনে যার-পর-নাই ভক্তিরসের সঞ্চার হয়।

প্রচীন লোকেরা বলেন, শ্যামাপ্রতিমার বিসর্জনের দিনে রামপ্রসাদ আপন পরিজন ও বন্ধুবান্ধবকে ডাকাইয়া, 'আজ মায়ের বিসর্জনের সহিত আমারও বিসর্জন হইবে', এই কথা বলিয়া নূতন কয়েকটি কালী-গুণগান রচনা করিয়া গান করিতে করিতে প্রতিমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। তিনি গঙ্গাতীরে গমন করিয়া, জলে নামিয়া 'দক্ষিণা হয়েছে' গানের এই কথাটি বলিবামাত্র তাঁহার ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ হইয়া জীবনান্ত হইয়া যায়।

কত বৎসর বয়সের সময়ে যে রামপ্রসাদের জীবনান্ত হয়, তাহা ঠিক জানিবার উপায় নাই, তবে অনুমান দ্বাবা স্থির করা যাইতে পারে যে, তিনি ৬০।৬৫ বৎসর বয়সের কমে দেহত্যাগ করেন নাই।

—ঃ০ঃ-

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস

হুগলী জেলার অন্তর্গত জাহানাবাদ (বর্তমান নাম আরামবাগ) মহকুমায় কামারপুকুর গ্রামে ১২৪১ সালের ১০ই ফাল্গুন বুধবার শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন। মাতাপিতার স্নেহ ও যত্নে রামকৃষ্ণ সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া অষ্টম মাসে পদার্পণ করিলে, স্নেহময়ী জননী অন্নপ্রাশন দিয়া আদর করিয়া, পুত্রের নাম গদাধর রাখেন। কিন্তু ঐ নাম পরিবারস্থ অন্যান্য ব্যক্তিদিগের মনোনীত না হওয়ায়, উঁহারা ঐ নামের পরিবর্তে 'রামকৃষ্ণ' নাম রাখিয়া দেন। পঞ্চম বৎসর উত্তীর্ণ হইলে রামকৃষ্ণের হাতে-খড়ি হয় ও বিদ্যাভ্যাসের জন্য তাঁহাকে গ্রাম্য পাঠশালায় ভর্তি করিয়া দেওয়া হয়। লেখাপড়ায় রামকৃষ্ণের তাদৃশ যত্ন ছিল না ; তিনি পাঠে অবহেলা করিয়া অধিকাংশ সময়ই খেলা করিয়া বেড়াইতেন। গান-বাজনায় ইঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। গ্রামের মধ্যে বা গ্রামের বাহিরে যাত্রা, পাঁচালী, হাফ্ আখড়াই, কবি বা অন্য কোনোরূপ সঙ্গীত-চর্চা হইলে, বালক রামকৃষ্ণ তথায় গিয়া মনঃসংযোগের সহিত তাহা শ্রবণ করিতেন। ইঁহার কোন বাল্যসহচর ইঁহাকে বলিয়াছিল, 'ভাই! তোমার গলা বড় মিষ্টি, তুমি যদি একটা গান বল, শুনি।' সেইদিন হইতে রামকৃষ্ণ নিজে সঙ্গীত-সাধনা করিতে অভ্যাস করেন এবং কাহারও সাহায্য না লইয়া সঙ্গীত-বিদ্যায় সুনিপুণ হইয়া উঠেন।

রামকৃষ্ণের পিতার নাম ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় দশকর্মান্বিত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত এবং যজনযাজন করিয়া অতি কায়ক্লেশে সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতেন। ইঁহার তিন পুত্র ও দুই কন্যা। জ্যেষ্ঠ রামকুমার, মধ্যম রামেশ্বর এবং কনিষ্ঠ রামকৃষ্ণ। রামকুমার সাংসারিক কষ্ট লাঘব করিবার জন্য কলিকাতায় আসিয়া ঝামাপুকুর নামক স্থানে একটী চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন এবং বিদায়-আদায় প্রাপ্তির জন্য ছাতুবাবুর দলে নাম লিখাইয়া রাখেন।

গ্রাম্য বিদ্যালয়ে থাকিয়া, রামকৃষ্ণের লেখাপড়ার সুবিধা হইল না দেখিয়া, রামকুমার শাস্ত্রাভ্যাসের জন্য ইঁহাকে আপন চতুষ্পাঠীতে আনয়ন করেন। ঐ সময়ে ইঁহার বয়স চৌদ্দ বৎসর হইয়াছিল। এখানে আসিয়াও লেখাপড়ার প্রতি ইঁহার অনুরাগ জন্মে নাই। অতি সামান্য রকম যাহা শিখিয়াছিলেন, তাহা নিজের চেষ্টায় নহে, দাদামহাশয়ের ভয়ে। যদিও ইঁহার বিদ্যাভ্যাসে তাদৃশ আস্থা ছিল না, কিন্তু মেধাশক্তি ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ইঁহার যথেষ্ট ছিল। কথকদিগের মুখে কথকতা শুনিয়া রামায়ণ, মহাভারত ও অন্যান্য শাস্ত্রাদিতে সুপণ্ডিত হইয়াছিলেন। ইঁহার উপদেশগুলিই তাহার জাজ্বল্য প্রমাণ।

পরমহংসদেবের বয়স যখন ১৮ বৎসর, সেই সময়ে রামকুমার কলিকাতায় প্রায় তিন ক্রোশ উত্তরে দক্ষিণেশ্বর নামক স্থানের কালীবাড়ীতে পূজক-ব্রাহ্মণরূপে নিযুক্ত হন। মাহবার-বংশীয়া রাণী রাসমণি ১২৫৯ সালে ঐ স্থানে ভাগীরথী-তীরোপরি এক মনোহর উদ্যান-মধ্যে মহাশক্তি কালী প্রতিমা স্থাপন করেন ও বহু ব্যয়ে মন্দিরাদি নির্মাণ করাইয়া দেন। রামকুমার রাসমণি-প্রতিষ্ঠিত কালীদেবীর পূজায় ব্রতী হইলে, ঝামাপুকুরস্থ

টোল উঠাইয়া দিয়া কনিষ্ঠ সহোদর রামকৃষ্ণকে লইয়া তথায় বাস করিতে থাকেন। ঐ সময়ে হুগলী জেলার অন্তর্গত জয়রামবাটী-নিবাসী শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী সারদাসুন্দরী দেবীর সহিত রামকৃষ্ণের পরিণয় কার্য সম্পন্ন হয়। রামকুমার দক্ষিণেশ্বরে প্রায় দুই-তিন বৎসর কাল মায়ের পূজার্চনাদি করিয়া মানবলীলা সম্বরণ করেন। রাণী রাসমণি ও তাঁহার জামাতা মথুরবাবু রামকুমারকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন। তাঁহার মৃত্যুতে মথুরবাবু অতিশয় দুঃখিত হইয়া তাঁহার পরিবারবর্গের ভরণপোষণের জন্য রামকৃষ্ণকে ঐ পদে অভিষিক্ত করেন। মহাশক্তির পূজা সম্বন্ধে রামকৃষ্ণের কিছুই জানা ছিল না; সুতরাং তিনি শাস্ত্রীয় মন্ত্রাদি অভ্যাস করিয়া নবোৎসাহে ও অকপট ভক্তিতে মায়ের পূজা করিতে থাকেন।

যৌবনকাল অতি ভীষণকাল। ঐ সময় জীবমাত্রেরই কামক্রোধাদি রিপুসকল প্রবল হইয়া থাকে। রামকৃষ্ণের হৃদয়রাজ্যে যে সময়ে রিপুগণ রাজত্ব করিতে আসিত, সেই সময়ে ইনি কৃপাণহস্তা, লোলজিহ্বা, মুণ্ডমালা-বিভূষিতা, করালবদনা কালীর শরণ লইতেন এবং রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত বা অপরাপর সাধকদিগের রচিত শ্যামা-বিষয়ক গান গাইয়া রিপুগণকে দমন করিতেন। কয়েক বৎসর কাল এইরূপ ভাবে অতিবাহিত করিবার পর ইঁহার যোগশিক্ষা করিবার ইচ্ছা জন্মে। নির্জন স্থান ব্যতীত যোগাভ্যাসের সুবিধা হয় না বলিয়া, ইনি উক্ত কালীমন্দির সংলগ্ন সুবৃহৎ উদ্যানের উত্তর পার্শ্বে একটি ক্ষুদ্র কুটীর মধ্যে আপন বাসস্থান নির্দিষ্ট করেন এবং উহার সন্নিকটে বহু শাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট অতি পুরাতন পঞ্চবটী বৃক্ষের তলদেশে আসন প্রস্তুত করিয়া যোগ-সাধনায় প্রবৃত্ত হন। যোগ-সাধনার পূর্বে ইনি একজন সাধকের* নিকট সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করেন। সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণের পর ইনি কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ ও আপনার অহংকার নাশ করিবার জন্য অশেষবিধ চেষ্টা করেন। কেহ কেহ বলেন, রামকৃষ্ণ এক হস্তে টাকা এবং অপর হস্তে মৃত্তিকা লইয়া ভাগীরথী তীরে বসিয়া, এই বলিয়া উভয়ের তুলনা করিতেন যে 'টাকা! তুমি রূপার চাকতিবিশেষ ও জড়পদার্থ, তোমার দ্বারা ঘরবাড়ী, গাড়ীজুড়ি প্রভৃতি পাওয়া যায়; কিন্তু সচ্চিদানন্দ পাওয়া যায় না।' আর মাটিকে সম্বোধন করিয়া বলিতেন, 'মাটি তুমিও জড়পদার্থ, তোমা হইতে নানাবিধ শস্য উৎপন্ন হইয়া বিক্রয়ের দ্বারা ঘরবাড়ী, গাড়ীজুড়ি প্রভৃতি করিতে পারা যায়; তাহা হইলে টাকা! তোমাতে আর মাটীতে তফাৎ কি? তোমার দ্বারা সচ্চিদানন্দ পাওয়া যায় না, আর মাটীর দ্বারাও সচ্চিদানন্দ পাওয়া যায় না, অতএব তুমি আর মাটী একই পদার্থ। যদি তোমরা একই পদার্থ হইলে, তবে তোমাদের যত্ন করিয়া তুলিয়া রাখি কেন?' এইরূপ বিচার করিয়া তিনি টাকার মায়া পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

কামিনী সম্বন্ধেও এইরূপ বিচার করিয়া ইনি কাম রিপুকে জয় করিয়াছিলেন। স্ত্রীলোক দেখিয়া—বিশেষ সুন্দরী স্ত্রীর জন্য লোকে উন্মত্ত হয় কেন? স্ত্রীলোক কি কি উপাদানে গঠিত? কতকগুলি অস্থি, পঞ্জর, রক্ত ও মাংস ব্যতীত আর কিছুই নহে। ঐ সকলের উপর বিবিধ বর্ণের চর্মের আবরণ দেওয়া মাত্র। মন! তুমি কি ঐ কামিনীর প্রতি আসক্ত হইতে চাও? অনেকে সুন্দরীদিগের মুখ-চুম্বন করিয়া আপনাকে

---

* কেহ কেহ বলেন, তোতাপুরি নামক একজন সাধুর নিকট সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

কৃত-কৃতার্থ মনে করে ; কিন্তু ঐ মুখ কি, তাহা একবার এই মাংস ও চর্মবিহীন নরমুণ্ডের প্রতি লক্ষ্য কর দেখি, ইহাতে তোমার ওরূপ প্রবৃত্তি হয় কি না ? স্ত্রীলোকের স্তনদ্বয় মাংসপিণ্ড বই আর কিছুই নহে। একস্থানে কতকটা মাংস রাখিয়া তাহাতে হস্তার্পণ কর দেখি, তুমি কেমন তাহাতে সুখানুভব কর ? জননেন্দ্রিয় সম্বন্ধেও ঐরূপ, উহা ক্লেদ ও মূত্রে পরিপূর্ণ। লোকে মল-মূত্র দেখিলে কতই ঘৃণা করিয়া থাকে ; কিন্তু তাহাদের বহির্গমনের পথের জন্য লালায়িত। সে পথ স্পর্শ করিতে ঘৃণার পরিবর্তে আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকে। লোকে তখন একবারও মল-মূত্রের কথা ভাবিয়া দেখে না। মন ! তুমি কখনই ঘৃণিত পদার্থে লোভ করিও না।

রামকৃষ্ণের সেই সময়ের অবস্থা দেখিয়া রাসমণির জামাতা মথুরবাবু ইঁহাকে কয়েকবার পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি কয়েকটি নবযৌবনসম্পন্না, স্বরূপা বারাঙ্গনা আপনার বাগান-বাটীতে আনাইয়া যাহাতে রামকৃষ্ণের চিত্ত-চাঞ্চল্য ঘটে সেইমত কার্য করিতে বলিয়া রামকৃষ্ণকে তথায় আনয়ন করেন ; কিন্তু রামকৃষ্ণের মন কিছুতেই বিচলিত হয় নাই। লোকলজ্জাব ভয়ে রামকৃষ্ণ এই কার্যে প্রবৃত্ত হইতেছেন না—গোপনে কার্য করিতে বোধহয় ইচ্ছা আছে, এইরূপ ভাবিয়া মথুরবাবু ইঁহাকে লইয়া তীর্থদর্শনে বহির্গত হন। মথুরবাবু কাশী, গয়া, বৃন্দাবন প্রভৃতি কয়েকটি তীর্থস্থান বেড়াইয়া যখন দেখিলেন, বামকৃষ্ণের সঙ্কল্প অতি দৃঢ় তখন কলিকাতায় ফিরিযা আসেন।

এই সময়ে রামকৃষ্ণ কয়েকজন শিষ্য প্রাপ্ত হন। শিষ্যগণ তাঁহার মুখে নানাবিধ ধর্মোপদেশ শ্রবণ করিয়া সংসারের ভীষণ জ্বালা সকল ভুলিয়া অপার আনন্দ অনুভব করেন। রামকৃষ্ণ রীতিমত পাঠ্যাভ্যাস করেন নাই, তন্ন তন্ন করিয়া শাস্ত্রালোচনা করেন নাই, ভাষাজ্ঞান সম্বন্ধে ইনি একেবারে অজ্ঞ ছিলেন ; কিন্তু ইঁহার উপদেশ যিনিই শুনিয়াছেন, তিনিই মুগ্ধ হইয়াছেন ; ইঁহার এই অসাধারণ ক্ষমতা ছিল বলিয়াই, লোকে ইঁহাকে ভক্তির চক্ষে দেখিয়াছিল। ইঁহার অমৃততুল্য উপদেশাবলী ক্রমে যতই প্রচার হইতে লাগিল, ততই শিষ্যসংখ্যাও বর্ধিত হইতে লাগিল। নব ব্রাহ্মধর্ম প্রবর্তক কেশবচন্দ্র সেনও ইঁহার উপদেশাবলী পরম সাদরে গ্রহণ করিয়া গিয়াছেন। নাট্য-বিনোদ গিরিশচন্দ্র ঘোষের পূর্ব-চরিত্রের বিষয় বোধহয় অনেকেই অবগত আছেন। তিনি সংসারে পাপ বলিয়া একটা কিছু আছে, তাহা বিশ্বাস করিতেন না ; এখন সেই গিরিশবাবুকে দেখিলে আশ্চর্য হইতে হয়। এরূপ কত পাপী যে তাঁহার উপদেশে উদ্ধার হইয়া গিয়াছে, তাহা বলা যায না।

১২৯৩ সালের ৩১শে শ্রাবণ রবিবার ৫২ বৎসর বয়সে ভক্তকুলচূড়ামণি রামকৃষ্ণ পরমহংসের আত্মা নশ্বরদেহ পরিত্যাগ করিয়া কৈবল্যধামে গমন করে। মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্বে ইঁহার গলনালির মধ্যে একটি স্ফোটক উৎপন্ন হয়। ঐ স্ফোটক ক্রমে বর্ধিত হইতে থাকায় বিষম যন্ত্রণা অনুভব করেন ; কিন্তু সে যন্ত্রণার বিন্দুমাত্র নিজমুখে ব্যক্ত করিতেন না। তরল বস্তু ব্যতীত অন্য কোন দ্রব্যই তিনি আহার করিতে পারিতেন না ; ক্রমে এরূপ হইয়া উঠিল যে তরল বস্তুও গলাধঃকরণ করা দুষ্কর হইতে লাগিল। আহার করিতে না পারায় শরীর ক্রমে জীর্ণ-শীর্ণ হইয়া আসিতে লাগিল। শিষ্য-মণ্ডলী গুরুর এইরূপ সঙ্কটাপন্ন অবস্থা দেখিয়া চিকিৎসার জন্য ইঁহাকে বাগবাজারে আনয়ন করেন ও পরে সেখান হইতে বলরাম বাবুর বাটী ও তথা হইতে কাশীপুরের একটি সুরম্য উদ্যান-বাটীতে স্থানান্তরিত করেন। এই স্থানেই ইঁহার জীবনান্ত হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় যুবক পরমহংসের নিকট জ্ঞান ও শান্তিলাভের জন্য প্রায়ই যাতায়াত করিতেন। পরমহংসদেবও তাহাদিগকে যথেষ্ট ভাল বাসিতেন। যুবকবৃন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের জ্ঞানগর্ভ উপদেশপূর্ণ বাক্যাবলী শ্রবণ করিয়া সংসার-সুখে জলাঞ্জলি দিয়া সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবিষ্ট হন। তাঁহার দেহত্যাগের পর, প্রায় ১০।১২ বৎসর ব্যাপিয়া সেই সাধুগণ সাধন ভজন ও দেশপর্যটনে ব্যাপৃত থাকেন। তাঁহারা পরমহংসদেবের প্রিয়শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ দ্বারা রীতিমত সংঘবদ্ধ হইতে জনসমাজে ধর্মপ্রচার করিতে প্রবৃত্ত হন। ঐ সন্ন্যাসী-সংঘের নাম 'রামকৃষ্ণ মিশন'। রামকৃষ্ণ মিশন ভারতবর্ষের তিনটি 'মঠ' স্থাপনা করিয়াছেন। একটি বেলুড়ে, একটি মায়াবতীতে ও একটি মান্দ্রাজে।

কলিকাতার নিকটবর্তী ভাগীরথীর পশ্চিমকূলে হাবড়া জেলার অন্তর্গত বেলুড় নামে একটী গ্রাম আছে। সেই গ্রামে, জাহ্নবী-তটের উপরেই, স্বামী বিবেকানন্দ সন ১৩০৪ সালে একটি মঠ স্থাপন করেন। ঐ মঠে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের অস্থি, পাদুকা, হস্তাক্ষর প্রভৃতি নানাবিধ স্মৃতি-চিহ্ন অতি যত্নে ও ভক্তিসহকারে রক্ষিত আছে। প্রতি বৎসর শিবরাত্রির পর, পরমহংসদেবের জন্মতিথি উপলক্ষে, উক্ত বেলুড় মঠে মহোৎসব হইয়া থাকে।

ঐ মঠে নিয়মানুসারে প্রত্যহ পূজা-পাঠাদি হইয়া থাকে। কতিপয় ছাত্র এবং ব্রহ্মচারী মঠে বাস করিয়া ব্রহ্মচর্য-পালন, চরিত্র গঠন এবং বিদ্যাভ্যাস করেন ; ইহাদিগকে ঐ সকল কার্যে যথেষ্ট সাহায্য করা হয়। দেশ-দেশান্তর হইতে মধ্যে মধ্যে সাধু-সন্ন্যাসিগণ আসিয়া তথায় দু-দশ দিনের জন্য আশ্রয়গ্রহণ করেন। সকল সম্প্রদায়েই আগন্তুক ধর্ম-জিজ্ঞাসুদিগের প্রশ্ন, যথাসাধ্য মীমাংসা করিয়া দেওয়া হয়।

কুমায়ুন জেলার অন্তর্গত মায়াবতী নামক স্থানে 'মায়াবতী', অদ্বৈতাশ্রম' মঠ স্থাপিত আছে। বেলুড় মঠানুযায়ী সকল কার্যই এই স্থানে হইয়া থাকে এবং তথায় যাহাতে বাঙ্গালিগণ যাইয়া উপনিবেশ করিতে পারেন, তাহার চেষ্টা করা হয়।

মান্দ্রাজ মঠ—মান্দ্রাজ সহরে সমুদ্রতীরে কাসল্ কার্ণন (Castle kernon নামক সুপ্রসিদ্ধ প্রাসাদে অবস্থিত। ঐ স্থানেও বেলুড় মঠের প্রণালী অনুযায়ী সমস্ত কার্য হইয়া থাকে।

পরমহংসদেবের কয়েকটি উপদেশ

এক ডুবে রত্ন না পাইলে রত্নাকরকে রত্নহীন মনে করিও না ; ধৈর্যধারণপূর্বক সাধনায় প্রবৃত্ত থাক, যথাসময়ে ঈশ্বরের কৃপা তোমার উপরে অবতীর্ণ হইবেই হইবে।

এক ব্যক্তি পুষ্করিণী খনন করিতে গিয়া দুই হাত মাটি কাটিয়াছে, এমন সময়ে অপর এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল, ভাই তুমি বৃথা পরিশ্রম করিতেছ কেন ? ইহার নিম্নে জল পাইবে না—কেবলই বালি বাহির হইবে। সে তৎক্ষণাৎ সে স্থান ত্যাগ করিয়া অপর এক স্থানে মাটি কাটিতে লাগিল। তথায় আর এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল, ভাই এখানে পূর্বে পুকুর ছিল, বৃথা কষ্ট করিতেছ কেন ? কিঞ্চিৎ দক্ষিণদিকে অগ্রসর হইয়া কাটিলে সুন্দর জল বাহির হওয়া সম্ভব, সে তৎক্ষণাৎ তাহাই করিল। তথায় অপর একজন আসিয়া আবার তাহাকে নিষেধ করিল। এইরূপে সে যত স্থান মনোনীত করিয়াছিল একে একে সে সকল স্থানই ত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। তাহার

পুকুর কাটা আর হইল না। ধর্মপথেও অনেকে এইরূপে নানা বিঘ্নে পড়িয়া সর্বস্ব হারাইয়াছেন। আজ যাহা বিশ্বাস করিলেন; বিপদে, পরীক্ষায় পড়িয়া কল্য তাহা ত্যাগ করিলেন এবং অবশেষে হয় একেবারে নাস্তিক হইয়া পড়িলেন, নতুবা স্থিরসিদ্ধান্ত করিলেন, এ জীবনে ধর্মলাভ অসম্ভব।

এক ব্যক্তি সমস্ত দিবস ইক্ষুক্ষেত্রে জল সেচন করিয়া অবশেষে দেখিল যে, একবিন্দু জলও ক্ষেত্রে প্রবেশ করে নাই, দূরে কতকগুলি গর্ত ছিল, তাহা দ্বারা সমুদয় জল বাহির হইয়া গিয়াছে। সেইরূপ যিনি বিষয় আকাঙ্ক্ষা, পার্থিব মান-সম্ভ্রম, সুখ-স্বচ্ছন্দতার প্রতি আসক্তি রাখিয়া উপাসনা করিতেছেন, আজীবন উপাসনা করিয়া অবশেষে তিনিও দেখিতে পাইবেন যে, ঐ সকল আসক্তিরূপ ছিদ্র দিয়া তাঁহার সমুদয় উপাসনা বাহির হইয়া গিয়াছে; তিনি যে মানুষ, সেই মানুষই পড়িয়া আছেন—একবিন্দুও উন্নতি করিতে পারেন নাই।

এ সংসার ঈশ্বরের রঙ্গভূমি। লীলাময় হরি নানাভাবে এখানে সর্বদা লীলা প্রকাশ করিতেছেন। মাতা যেমন সন্তানের হস্তে লাল চুষি দিয়া ভুলাইয়া রাখেন, ঈশ্বর সেইরূপ নানা পদার্থ দিয়া আমাদিগকে ভুলাইয়া রাখিয়াছেন। সন্তান চুষি ফেলিয়া দিয়া মা বলিয়া চীৎকার করিলে, মাতা তৎক্ষণাৎ যেমন তাহার নিকট উপস্থিত হন, আমরাও যদি পার্থিব মমতাবিহীন হইয়া ব্যাকুল অন্তরে ঈশ্বরের জন্য ক্রন্দন করিতে পারি, তবে তিনিও তৎক্ষণাৎ আমাদের নিকটে উপস্থিত হন।

প্রশ্ন হইল, গেরুয়াবসন পরিধানের আবশ্যকতা কি? বলিলেন, গেরুয়া-বসনের সহিত পবিত্র ভাবের সম্বন্ধ আছে। যেমন চটিজুতা ও ছিন্নবসন পরিধানপূর্বক রাস্তায় বেড়াইলে সহজে মনে দীনভাবেব উদয় হয় এবং পেণ্টুলেন ও বুটজুতা পায়ে দিলে সহজে মনে অহঙ্কারের উদয় হয়; সেইরূপ গেরুয়া-বসন পরিধান করিলে সহজে মনে সাধনার উপযোগী ভাব উপস্থিত হয়।

তর্ক করিও না। তুমি তোমার মতের উপর যেমন নির্ভর কর, অপরকে তাঁহার মতের উপব সেইরূপ নির্ভর করিতে দাও; বৃথা তর্কে কিছু ফল হইবে না—ঈশ্বরের কৃপা হইলে সকলেই আপন আপন ভুল বুঝিতে পারিবে।

অপরকে বধ করিতে হইলে বিবিধ অস্ত্রেব আবশ্যাক হয়; কিন্তু আত্মহত্যা সামান্য একটি নরুণের দ্বারা সাধিত হইতে পারে। লোক শিক্ষা দিতে হইলে অনেক শাস্ত্রপাঠ আবশ্যাক হয় বটে; কিন্তু আপনার ধর্মলাভ সামান্য জ্ঞান দ্বারা হইতে পারে।

নষ্টা স্ত্রীলোক, মাতাপিতা প্রভৃতি সমুদয় পরিজন মধ্যে বাস করিয়া এবং নানাবিধ গৃহকার্যে সমস্ত দিন ব্যস্ত থাকিয়াও তাহার মন যেমন উপপতির প্রতি আকৃষ্ট থাকে; হে সংসারী মানব! তুমিও সেইরূপ মাতাপিতা প্রভৃতির মধ্যে থাকিয়া সমুদয় কার্যে ব্যস্ত থাক; কিন্তু তোমার মনকে সেই শ্রীহরির প্রতি আকৃষ্ট রাখিবার চেষ্টা করিও।

ধনীদিগের গৃহে দাসীগণ প্রভুর সন্তানসন্ততিদিগকে মাতার ন্যায় লালনপালন করিয়া থাকে; কিন্তু মনে মনে তাহারা নিশ্চয় জানে যে, ঐ সন্তানসন্ততিদিগের উপরে তাহাদের কোন অধিকার নাই। হে মানব! তুমিও তোমার সন্তানসন্ততিদিগকে যত্নের সহিত পালন করিও, কিন্তু মনে নিশ্চয় ধারণা করিতে চেষ্টা করিও যে, ঐ সকল কিছুই তোমার নহে।

মই, বাঁশ, সিঁড়ি, দঁড়ি প্রভৃতি নানা উপায় দ্বারা যেমন অট্টালিকার ছাদে উঠা যায়,

সেইরূপ ঈশ্বরের রাজ্যে যাইবারও নানাবিধ উপায় আছে। প্রত্যেক ধর্মই এক একটি উপায় দেখাইয়া দিতেছে।

প্রশ্ন হইল, সংসার ও ঈশ্বর উভয় কার্য একত্রে কিরূপে সম্ভবে? বলিলেন, একটি স্ত্রীলোক এক হস্তে ঢেঁকীতে চিঁড়া দিতেছে, অপর হস্তে সন্তানকে বক্ষে ধরিয়া দুগ্ধপান করাইতেছে। মুখে হয় ত পথের কোন লোকের সঙ্গে চিঁড়ার হিসাব করিতেছে। এইরূপে সে অনেক কাজ করিতেছে বটে; কিন্তু তাহার মনে মনে দৃষ্টি, যেন হস্তে ঢেঁকীটি পড়িয়া না যায়। সংসারে থাকিয়া সকল কার্য কর; কিন্তু দৃষ্টি রাখিও, যেন তাঁহার পথ হইতে দূরে না পড়িয়া যাও।

স্প্রীং-এর গদীর উপরে বসিলেই কুঞ্চিত হয় এবং উঠিলেই আবার সে স্বাভাবিক অবস্থায় পরিণত হয়। সংসারী মানবের মনেও সেইরূপ ধর্ম-কথা যখন শুনে, তখন ধর্মভাব প্রবল হয়; কিন্তু সংসারে প্রবেশ করিলে মনের আর সে ভাব থাকে না।

সকল জল নারায়ণ বটে, কিন্তু সকল জল পান করিবার যোগ্য নহে। সকল স্থানে ঈশ্বর বর্তমান আছেন সত্য; কিন্তু সকল স্থানে সমান ফল পাওয়া যায় না।

ব্যাঘ্রের মধ্যে ঈশ্বর আছেন সত্য; কিন্তু ব্যাঘ্রের সম্মুখে যাওয়া উচিত নয়। কু-লোকের মধ্যে ঈশ্বর আছেন সত্য; কিন্তু কু-লোকের সঙ্গ করা উচিত নহে।

হাড়গিলা অতি ঊর্ধে উড়িয়া বেড়ায় কিন্তু তাহার মন যেমন শ্মশান, ভাগাড় প্রভৃতির প্রতি আকৃষ্ট হইয়া থাকে; সেইরূপ নাস্তিক জ্ঞানীও অতি উচ্চ উচ্চ শাস্ত্রসকল অধ্যয়ন করেন, কিন্তু তাঁহার মন অসার পৃথিবীর ধনমানাদির প্রতি আকৃষ্ট হইয়া থাকে।

অল্পবয়স্ক বালককে যেমন রমণ-সুখ বুঝান অসম্ভব, সেইরূপ বিষয়াসক্ত, মায়ামুগ্ধ সংসারী মানবকে ধর্মের স্বর্গীয় সুখ বুঝান অসম্ভব।

সকল পিষ্টকের এথেল এক তণ্ডুল-চূর্ণে নির্মিত; কিন্তু পুরপ্রভেদে পিষ্টক ভাল মন্দ হইয়া থাকে। সকল মনুষ্য এক আধারে নির্মিত বটে; কিন্তু আত্মার পবিত্রতা অনুসারে মানুষ ভাল মন্দ রূপে পরিগণিত হয়।

জল ও দুগ্ধ একত্র রাখিলে উভয় মিশ্রিত হইয়া যায়, দুগ্ধের ভিন্নতা আর থাকে না। ধর্মপিপাসু নবীন সাধক, সংসারে সকল প্রকার লোকের সহিত মিশিলে আপনার ধর্মভাব হারাইয়া ফেলে, তাহার পূর্বের বিশ্বাস, উৎসাহ কোথায় চলিয়া যায়, সে কিছুই জানিতে পারে না।

জল ও দুগ্ধ, মিশ্রিত হইয়া যায় বটে, কিন্তু দুগ্ধকে মাখনে পরিণত করিতে পারিলে, আর জলের সহিত মিশ্রিত হইবার সম্ভাবনা থাকে না। সচ্চিদানন্দ হরিকে একবার হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে, শতসহস্র বদ্ধ জীবের মধ্যে বাস করিলেও, আর তাহার বিশ্বাস ক্ষীণ হইবে না।

—:০:—

ভক্তবীর বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ঝুলন পূর্ণিমার দিনে নদীয়া জেলার অন্তর্গত উস্থৎপুর নামক ক্ষুদ্র গ্রামে ভক্তবীর বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিত্রালয় শান্তিপুর; ইনি ঠাকুর আনন্দকিশোর গোস্বামীর ঔরসজাত সন্তান এবং তাঁহার ভ্রাতা গোপীনাথ গোস্বামীর দত্তক-পুত্র ছিলেন। ইনি বাল্যকালে গ্রাম্য বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাস করিয়া, পরে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে আসিয়া ভর্তি হন। ঐ কলেজে নিয়মিতরূপ পাঠাভ্যাস করিয়া কাব্যশ্রেণী পর্যন্ত উন্নীত হন। কাব্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে, উপাধিপ্রাপ্ত হইতে পারিতেন, কিন্তু তিনি উপাধির প্রয়াসী ছিলেন না। ঐ সময়ে ইঁহার কোন বন্ধু ডাক্তার অভাবে রোগের যন্ত্রণায় কাতর হইয়া পড়ায়, ইনি মনের আবেগে সংস্কৃত কলেজ পরিত্যাগ করিয়া মেডিকেল কলেজে আসিয়া প্রবেশ করেন।

বাল্যকাল হইতেই ইনি অতিশয় ধার্মিক ছিলেন। যে কোন স্থানে হউক না কেন, ধর্মসংক্রান্ত কোনরূপ চর্চা হইলেই ইনি তথায় গমন করিতেন। এখনকার ন্যায় পূর্বে ব্রাহ্মধর্মকে কেহ নিন্দা করিত না; কারণ পূর্বে ব্রাহ্মগণ সাধকসম্প্রদায়মাত্র ছিলেন। নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনাই তাঁহাদিগের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। রাজা রামমোহন রায় এই সাধকসম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা ও শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ইহার পোষণকর্তা। এই সম্প্রদায়ের সমাজ-মন্দিরের নাম 'আদি ব্রাহ্মসমাজ।' আদি ব্রাহ্মসমাজে বেদ ও উপনিষদাদির পাঠ ও ব্যাখ্যা শুনিতে অনেকেই গমন করিতেন। গোঁসাইজীও ব্রাহ্মধর্মের আস্বাদন গ্রহণ করিবার জন্য নিয়মিতরূপে তথায় গমন করিতেন। ক্রমে মেডিকেল কলেজের পাঠ সাঙ্গ করিয়া ঢাকায় গিয়া চিকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভ করেন। বিনা ভিজিটে দীনদুঃখীদিগকে চিকিৎসা করাই ইঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য।

যে সময়ে ইনি ঢাকায় ছিলেন, সেই সময় মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন বিলাত হইতে প্রত্যাগত হইয়া ব্রাহ্মধর্মের স্বতন্ত্র আকার দিয়া ব্রাহ্মসমাজ গঠিত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ব্রাহ্মমাত্রেরই যাহাতে পরস্পর পরস্পরের সহিত সৌহার্দ্য জন্মে, তাহার জন্য তিনি ভারত-আশ্রম স্থাপিত করেন। এই আশ্রমে ভিন্ন ভিন্ন ব্রাহ্ম-পরিবারেরা একান্নবর্তী হিন্দু পরিবারের ন্যায় বাস করিতেন। যে স্থানে এখন সিটি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ঐ স্থানের পূর্বের অট্টালিকায় তখন ভারত-আশ্রম ছিল। কেশবচন্দ্র নূতন আকারে ব্রাহ্মধর্মের সৃষ্টি করিতেছেন শুনিয়া, গোঁসাইজী ঢাকা ছাড়িয়া সপরিবারে ভারত-আশ্রমে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

এদিকে কেশব-প্রচারিত নবধর্মের আবির্ভাবে 'আদি ব্রাহ্মসমাজে' হুলস্থূল উপস্থিত হইল। কেশবের তীব্র আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া অনেকেই আদি ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ করিয়া, কেশবের দলে আসিয়া মিলিতে লাগিল—অনেকে নূতন ধর্মে দীক্ষিত হইবার জন্য লালায়িত হইয়া পড়িল। কেশবের বাটী সর্বদা লোকে লোকারণ্য। কেশববাবু জন-কোলাহল আর সহ্য করিতে না পারিয়া নির্জনে থাকিবার জন্য বেলঘরিয়ার নিকটস্থ একটি উদ্যান-মধ্যে বাস করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহাতেও তিনি নিষ্কৃতি পাইলেন না।

অচিরে নির্জন স্থান ব্রাহ্ম নরনারীতে পূর্ণ হইতে লাগিল। ঐ সময়ে ব্রাহ্ম নরনারীরা তাঁহাকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া মানিত। এই হিড়িকে পড়িয়া গোঁসাইজীর শ্বাশুড়ী ও স্ত্রী একদিন ভারত-আশ্রম হইতে কেশব-কাননে গিয়াছিলেন। যে সময়ে ইঁহারা শকটে আরোহণ করিয়াছেন, সেই সময়ে গোঁসাইজী সংবাদ পাইয়া তথায় উপস্থিত হন ও কেশব-কাননে যাইতে নিষেধ করেন। তখন ব্রাহ্মেরা কেশবের নামে এতই উন্মত্ত যে, গোঁসাইজীর বারণ শুনিয়া ইঁহার শ্বাশুড়ী ঠাকুরাণী বলিয়া উঠিলেন, 'আমি গাড়ী হইতে নামিব না ; আমি তোমায় ত্যাগ করিতে পারি, তবু গুরু পরিত্যাগ করিতে পারিব না।' মায়ের কথা শুনিয়া তাঁহার স্ত্রীও বলিলেন, 'আমি স্বামী পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছি, তবু গুরু পরিত্যাগ করিতে পারিব না।' ইহাতেই বুঝিয়া লউন, সে সময়ে কেশববাবুর কিরূপ প্রভাব ছিল।

কেশববাবুর ব্রাহ্মধর্ম প্রচারিত হওয়ায় ব্রাহ্মসমাজ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। কেশববাবুর প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজ ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ* নামে খ্যাত হয়। এই ব্রাহ্ম-ধর্মমন্দিরে প্রথম উপাসনার দিনে অনেক ব্রাহ্মণ আপনাদিগের উপবীত পরিত্যাগ করিয়া কেশব-প্রচারিত নবধর্মের দীক্ষা গ্রহণ করেন। গোঁসাইজীও সেই সময়ে আপন উপবীত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

ইংরাজী ১৮৭১ সালে কেশববাবুর লোকপ্রিয়তা চরমসীমায় উঠিয়া ধীরে ধীরে নামিতে আরম্ভ করে। কুচবিহারেব মহারাজার সহিত কেশববাবুর কন্যার বিবাহ হইয়াছিল বলিয়া ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মদলের মধ্যে মহা গোলযোগ বাধিয়া উঠে এবং ঐ গোলযোগের ফলে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ দুইভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। কেশববাবুর দল ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ নামে আখ্যাত রহিল এবং তাঁহার বিরোধিগণ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ** নাম ধারণ করিল। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, শিবনাথ শাস্ত্রী, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি কয়েকজন ব্যক্তি এই সমাজের নেতা হইয়া সুশৃঙ্খলে কার্য করিতে লাগিলেন। বিজয়কৃষ্ণ ব্রাহ্মধর্মের উন্নতির জন্য প্রচারকের কার্যে নিযুক্ত হইয়া, ঢাকা, নাবায়ণগঞ্জ, বরিশাল প্রভৃতি নানাস্থান পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

যে সময়ে তিনি ঢাকায় সাধারণ ব্রাহ্মদিগের নায়ক হইয়া অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময়ে ঢাকার বারদী নামক স্থানে একজন মহাপুরুষ আসিয়া উপস্থিত হন। তাঁহার অলৌকিক ক্ষমতা দেখিয়া ঢাকাবাসীমাত্রেই স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। গোস্বামী মহাশয়ও তাঁহার যশঃসৌরভ প্রচার করিতে ক্ষান্ত হন নাই। গোঁসাইজী প্রায় প্রত্যহই ধর্মলাভের জন্য তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন। এইরূপে যাতায়াত করায় ইনি উক্ত মহাপুরুষের নিকট পরিচিত হন।

আন্দাজ ১২৯৪ সালে গোঁসাইজী একবার উত্তরাঞ্চলে গিয়া কোন সঙ্কট রোগে মরণাপন্ন হন। ঢাকাতে এই বিষয়ে টেলিগ্রাম আসিলে, গোস্বামী মহাশয়ের কোন প্রিয়শিষ্য বারদীতে গিয়া, মহাপুরুষের চরণপ্রান্তে পতিত হইয়া স্বীয় গুরুর প্রাণভিক্ষা প্রার্থনা করেন ও বলেন, 'আমার আয়ুর দ্বারা তাঁহাকে বাঁচাইয়া দিন।' শিষ্যের

* এই সামাজ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট্ ও আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের সংযোগস্থলের সন্নিকটে আজিও বিদ্যমান আছে।

** এই সমাজ-মন্দির কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের উপর অবস্থিত।

প্রগাঢ় গুরুভক্তি দেখিয়া মহাপুরুষ সন্তুষ্ট হইয়া বলেন, 'তুমি ঢাকাতে ফিরিয়া যাও, আমি বিজয়কৃষ্ণের নিকট যাইব, আগামী পরশ্ব তোমরা সংবাদ পাইবে।' ইহার পরেও মহাপুরুষের দেহ বারদীতেই বিদ্যমান ছিল ; কিন্তু অনেক সময়ে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর শুশ্রূষাকারীরা বারদীর মহাপুরুষকে তাঁহার শিয়রে উপবিষ্ট দেখিত। তাঁহার একজন শিষ্য বলিয়াছিলেন, 'সেই পীড়াতে গোঁসাইজীর এমন অবস্থা হইয়াছিল যে, ডাক্তারেরা তাঁহাকে মৃতজ্ঞানে বাহিরে রাখিতে বলিয়াছিলেন, বাহিরে রাখার পর রোগী পুনর্জীবিত হইয়াছেন।' অনেকেই অনুমান করেন যে, গোস্বামী মহাশয়ের তনুত্যাগ হওয়ার পরক্ষণেই বারদীর মহাপুরুষ ইঁহার আত্মাকে পুনরায় পূর্বদেহে প্রবেশ করাইয়া দিয়াছেন। এ বিষয়, গোঁসাজীর প্রিয়তম শিষ্যদিগের মধ্যে অনেকেই অবগত আছেন।

বারদীর মহাপুরুষের সহিত সাক্ষাৎ হইবার পর হইতেই ইঁহার মনের গতি অন্য পথে ধাবিত হয়। ইনি আপনার আশ্রমের বহির্বাটীতে একটি আম্রবৃক্ষের তলদেশে সাধনার জন্য আসন প্রস্তুত করিয়া দিবারাত্র হরিনাম জপ ও হরিসঙ্কীর্তন করিতেন। কয়েক বৎসর যাবৎ সমভাবে হরিনাম জপ ও হরিনাম সঙ্কীর্তনে কালাতিপাত করিয়া তীর্থ-পর্যটনে বহির্গত হন। হিন্দুতীর্থের অনেক স্থানেই ইনি পরিভ্রমণ করিয়াছেন। গোস্বামী প্রভু যখন বৃন্দাবনে ছিলেন, তখন ইঁহার ভাবানুরাগ দেখিয়া বৈষ্ণবগণ ইঁহার প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হইয়াছিলেন।

নির্জন স্থানে ঈশ্বরোপাসনা করা অতি সহজ ; তথায় চিত্তচাঞ্চল্য ঘটাইবার কেহ থাকে না, এবং দেহস্থ ষড়্‌রিপুকেও উত্তেজিত করিতে কেহ প্রয়াস পায় না, সুতরাং ঈশ্বরের প্রতি মন সহজেই আকৃষ্ট হয় ; কিন্তু এই প্রলোভনময় সংসারাশ্রমের মধ্যে থাকিয়া অথচ নির্লিপ্তভাবে সর্বক্ষণ ঈশ্বরারাধনা করা যে কিরূপ কঠিন কার্য, তাহা সংসারী ব্যক্তিমাত্রেই অবগত আছেন।

সাধুদিগের হৃদয়ে দয়া থাকে—কিন্তু মায়া থাকে না। দয়া ও মায়া দুইটি স্বতন্ত্র বস্তু। দয়া কাহাকে বলে ? অন্যের ক্লেশ অবলোকন করিলে সেই ক্লেশ দূরীকরণের জন্য অন্তঃকরণে যে ইচ্ছা জন্মে, তাহার নাম দয়া। আর মায়া কাহাকে বলে ? অন্যের স্নেহ, যত্ন, ভালবাসা, রূপ গুণ প্রভৃতিতে মুগ্ধ হওয়ার নাম মায়া। সংসারাশ্রমের মধ্যে যে সকল ব্যক্তি বিচরণ করিতেছেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই মায়ায় আবদ্ধ। সাধু বিজয়কৃষ্ণ স্ত্রী পুত্র, কন্যা, আত্মীয়স্বজন প্রভৃতির মধ্যে একত্রে বসবাস করিয়া জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন। কিন্তু মায়া কখনও ইঁহার হৃদয়কে আয়ত্তাধীন করিতে পারে নাই। শ্রীবৃন্দাবনে জীবনসঙ্গিনী সহধর্মিণী ভয়ঙ্কর বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হইলে, ডাক্তার, কবিরাজ, হাকিম প্রভৃতি চিকিৎসকগণ যখন একে একে হতাশ হইতে লাগিলেন, আত্মীয়গণ, শিষ্যমণ্ডলী এক ব্রজবাসীরা অত্যন্ত চিন্তিত, উৎকণ্ঠিত ও ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, তখনও ইঁহার যেরূপ ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছিল, তাঁহার শ্রীবৃন্দাবন-প্রাপ্তির পরক্ষণেও সেই এক ভাব দেখা গিয়াছিল। নিয়মিত পাঠ, হরিনাম জপ, হরিনাম সঙ্কীর্তন প্রভৃতি নিত্যনৈমিত্তিক কার্যের কিছুই ব্যতিক্রম হয় নাই এবং মনেরও কিছুমাত্র চাঞ্চল্য ঘটে নাই। সমগ্র মন প্রাণ ঢালিয়া দিয়া যাঁহাকে ভালবাসিয়াছিলেন, বিবাহ হইতে চিরজীবন যিনি সদাসঙ্গিনী ছিলেন, তাঁহার দৈহিক বিয়োগ ইঁহাকে কিছুমাত্র বিচলিত করিতে পারে নাই।

ই'হার অষ্টাদশবর্ষীয়া কন্যা, কলিকাতায় দুরন্ত জ্বররোগে আক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। কন্যার মুমূর্ষু অবস্থায় যখন সকলেই ব্যস্ত ও চিন্তিত, ভাবী শোকের কৃষ্ণচ্ছায়ায় সকলেরই মুখ বিষণ্ণ; তখন কিন্তু যাঁহার কন্যা, তিনি আসনেই বসিয়া আছেন, নিয়মিতরূপে পাঠ ও হরিনাম জপ করিতেছেন, কোনই ব্যস্ততা বা চিন্তাভাব লক্ষিত হয় নাই। রোগীর প্রাণ-বায়ু বহির্গত হইলে বাড়ীতে যখন কান্নার রোল পড়িল, তখনও তিনি প্রশান্ত-মনে পাঠ করিতেছেন। মৃত্যুর ক্ষণকাল পরে গোঁসাইজী শিষ্যদিগের প্রতি এই আদেশ করেন, 'যে ঘরে শব আছে, সেই ঘরে একটু কীর্তন কর।' কীর্তন আরম্ভ হইলে ইনি সেই ঘরে আসিয়া প্রেমাবেশে নৃত্য করিতে লাগিলেন। ই'হাদের তখন বাহ্য-চৈতন্য কিছু থাকে নাই। কীর্তনান্তে কন্যার শবদেহের মস্তকে আপনার চরণার্পণ করিয়া পুনরায় আপন আসনে আসিযা উপবেশন করিলেন। যে কন্যাকে তিনি কত স্নেহে মানুষ করিয়াছিলেন, তাঁহাকে এই ভাবে বিদায় করিলেন। ইহাতেই বুঝা যাইতেছে যে, তিনি মায়ার বশীভূত ছিলেন না।

আমাদের বাটীর সন্নিকটে হেরিসন্ রোডস্থ ৪৫ নং ভবনে ইনি কয়েক বৎসর কাল অবস্থিতি করিয়াছিলেন। তথায় আমি প্রাযই যাইতাম। প্রত্যহ সন্ধ্যাব সময় সঙ্কীর্তন হইত। ঐ সঙ্কীর্তন শ্রবণ করিতে করিতে ইনি বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইযা প্রেমাবেশে যখন নৃত্য আরম্ভ করিতেন, তখন তত্রস্থ সকল ব্যক্তিরই মনে ভক্তিরসের উদয় হইত। তখনকার তাঁহাব পলকহীন স্থিরনেত্র, ঊর্ধ্ববিন্যস্ত দৃষ্টি এবং মাধুর্যপূর্ণ বদনকান্তি দেখিলে অভক্তেরও হৃদয়ে ভক্তির সঞ্চার হইত। যে সমস্ত গুণে মানবহৃদয় অলঙ্কৃত ও সমুজ্জ্বল হয়, তন্মধ্যে দয়া প্রধান। দয়া প্রকাশ করিবার নানাবিধ উপায় আছে, তন্মধ্যে কায়িক, বাচিক ও আর্থিক এই ত্রিবিধ দযাই প্রধান। কোনো ব্যক্তি কোনোরূপ কষ্টে পতিত হইলে স্বীয় দৈহিক পরিশ্রমে যদি তাহার কষ্ট অন্তর্হিত করা যায়, তাহাব নাম কায়িক। কোনো ব্যক্তির বিপদুদ্ধারের জন্য অন্য কাহারও নিকট যে বাচনিক অনুরোধ করা যায়, তাহার নাম বাচিক এবং অর্থ দান দ্বারা বিপন্ন ব্যক্তির উপকারসম্পাদন কবাকেই আর্থিক দয়া কহে। ভক্তবীর বিজয়কৃষ্ণের হৃদয়ে উক্ত ত্রিবিধ দয়ার কোনটিরই অভাব ছিল না। ইনি কত নিঃসহায় রুগ্ন ব্যক্তির রোগপ্রশমনের জন্য ডাক্তারের নিকট গমন, ঔষধ আনয়ন, তাহার পথ্য প্রস্তুত করণ, সেবা ও শুশ্রূষা-সাধন, তাঁহাদের আত্মীয়সকাশে সংবাদাদি প্রদানের জন্য গমন প্রভৃতি কায়িক পরিশ্রমের দ্বারা অনেকের অনেক উপকার করিয়াছেন। ৪৫ নং ভবনে যখন অবস্থিতি করিতেন, তখন দেখিয়াছি, ইনি দীন, দুঃখী, দরিদ্র, আতুর, অনাথ, কানা, খোঁড়া, অভুক্ত প্রভৃতি ব্যক্তিদিগকে অকাতরে অন্ন বিতরণ করিতেন। লোকে অর্থাভাবে, কোন বিপদে পড়িয়া ই'হাকে জানাইবামাত্রই তাহা অনতিবিলম্বে প্রাপ্ত হইয়াছে।

গোঁসাইজী যখন ব্রাহ্মধর্মের প্রচারকরূপে বরিশালে ছিলেন, তখন ই'হার কোন সুহৃদ্ ব্যক্তি ই'হাকে একখানি উৎকৃষ্ট শীতবস্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন। গোঁসাইজী রাস্তায় এক ব্যক্তিকে শীতে ক্লেশ পাইতে দেখিয়া, আপনার সেই গাত্রবস্ত্রখানি তাহাকে দিয়া আসেন। মোট কথায়, লোকের দুঃখ দেখিলে ইনি তখনই তাহা মোচন করিতে চেষ্টা করিতেন।

গোঁসাইজী ১৩০৪ সালের ২৪শে ফাল্গুন দোলযাত্রার পূর্বদিনে হেরিসন্ রোডস্থ ৪৫ সংখ্যক বাটী হইতে খালের পথ দিয়া শ্রীক্ষেত্র যাত্রা করেন। তথায় দুই বৎসরকাল

ঈশ্বরারাধনা করিয়া ১৩০৬ সালের ২২শে জ্যৈষ্ঠ রাত্রি নয়টা কুড়ি মিনিটের সময় ইনি শ্রীশ্রীপুরুষোত্তম প্রাপ্ত হন। ইঁহার মৃত্যু সম্বন্ধে এরূপ জনশ্রুতি আছে যে, কোন সাধু ইঁহার যশঃ-সৌরভে ঈর্ষান্বিত হইয়া বিষপ্রয়োগ দ্বারা ইঁহার জীবনসংহার করে। মৃত্যুর পর ইঁহার দেহ তত্রত্য নরেন্দ্র-সরোবরের উত্তরদিকস্থ একটি উদ্যান-মধ্যে সমাধিস্থ করা হয়। পুরীযাত্রীমাত্রেই ইহা দেখিতে পাইবেন।

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর কয়েকটি উক্তি

সাধুসঙ্গ ধর্মসাধনের একটি প্রধান অঙ্গ জানিবে।

যতদিন কাম-ক্রোধ থাকিবে, সময়ে সময়ে মনে উদয় হইবে; মনে উদয় হইলেই অপরাধ হয় না। মনে উদয় হইলে যদি নিবারণের চেষ্টা করি, তবে পাপ হয় না। তাহাতে ইচ্ছাপূর্বক আনন্দে যোগ দেওয়াই পাপ। সংগ্রাম করিতে গিয়া পরাস্ত হই, তাহাও অপরাধ নহে। যতদিন ত্রিগুণের অধীন থাকিব, ততদিন গুণ অনুসারে আমাকে বাধ্য হইয়া চলিতে হইবে।

ধর্ম অধর্ম মনের অভিসন্ধি অনুসারে হয়। মনুষ্য-সমাজ যাহা পাপপুণ্য স্থির করিয়াছে, ভগবান্ তাহা দ্বারা বিচার করেন না। তিনি মানুষের হৃদয় দেখিয়া বিচার করিয়া থাকেন।

নামই ঔষধ—প্রতিদিন নিয়মিতরূপে অল্প সময়ের জন্যও সাধন করা করা কর্তব্য। ভাল না লাগিলেও ঔষধ গেলার মতন করিলে ক্রমে রুচি জন্মে। নামে অরুচি হইলে তাহার ঔষধ নামই। যখন পিত্তরোগে মুখ তিক্ত হয়, তখন মিশ্রিও তিক্ত লাগে। ঐ রোগের ঔষধ মিশ্রি। খাইতে খাইতে মিশ্রি মিষ্ট লাগিতে থাকে।

দানের কথা—যে সর্বদা যাচঞা করে, সে ব্যক্তি দানের পাত্র নহে। যে খোসামোদ করে, সে দানের পাত্র নহে। ভয়, স্নেহ, লজ্জা, মান, বংশ-মর্যাদা, প্রত্যুপকার, প্রত্যাশা-জনিত দান প্রকৃত দান নহে। স্বর্গকামনা, পাপমোচন ও পরকালের জন্য সংগ্রহ ইত্যাদি ভাবে দান করিলে, তাহা দান শব্দে বাচ্য নহে। যেমন পিপাসা পাইলে অতি ব্যগ্রতার সহিত লোকে জলপান করে, সেইরূপ প্রকৃত দাতা দানের পাত্র দেখিলে দান করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়েন, দিতে কুণ্ঠিত হন না। দান করিলে আনন্দের সীমা থাকে না।

—ঃ০ঃ—

সাধক কমলাকান্ত

সাধক কমলাকান্ত বর্ধমান জেলার অন্তর্গত অম্বিকা-কালনা গ্রামে অনুমান ১১৭৯ বঙ্গাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা যজন-যাজন করিয়া অতি সামান্যভাবে সংসার-যাত্রা নির্বাহ করিতেন। শৈশবেই কমলাকান্ত পিতৃহীন হন। ইঁহার দুঃখিনী জননী ইঁহার বিদ্যাশিক্ষার জন্য গ্রামস্থ সামান্য পাঠশালায় প্রেরণ করেন। কমলাকান্ত পাঠশালায় আশানুরূপ বিদ্যালাভ করিয়া জনৈক অধ্যাপকের নিকট সংস্কৃত শিক্ষা করেন। এই সময় হইতেই ইঁহার কবিত্বময়ী বচন রচনা-শক্তির দিব্য স্ফূর্তি জন্মে। বিদ্যাশিক্ষা অপেক্ষা সঙ্গীত-চর্চাতেই ইঁহার অধিকতর মনোযোগ ছিল। ইঁনি সরলতা, ন্যায়পরতা, ধর্মপ্রাণতা ও পরোপকারিতাদি গুণনিচয়ে ভূষিত ছিলেন। স্পষ্টবাদিতা ইঁহার চরিত্রের আর একটি প্রধান গুণ ছিল। বর্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ তেজচন্দ্র বাহাদুর ইঁহার গুণগরিমা শ্রবণ করিয়া ১২১৬ বঙ্গাব্দে ইঁহাকে রাজসভার সভাপণ্ডিতপদে নিযুক্ত করেন।

কমলাকান্তকে ধর্মপ্রবণ করিবার জন্য ইঁহার মাতাপিতা বাল্যকালেই ইঁহার হৃদয়ে ধর্ম-বীজ বপন করিয়াছিলেন। ঐ বীজ এতদিন ইঁহার হৃদয়ে নিহিত ছিল, এক্ষণে মহারাজার স্নেহ-বারি নিপতিত হওয়ায় উহা অঙ্কুরিত হইতে লাগিল। কমলাকান্ত সভাপণ্ডিতেব কার্য সমাধা করিয়া অবশিষ্ট সময ভক্তি-মুক্তি-প্রদায়িনী সর্বশক্তিময়ী করালবদনা কালীর সাধনায় প্রবৃত্ত হইতেন এবং শ্যামাগুণানুকীর্তনে সময় অতিবাহিত করিতেন। ইঁহার স্ব-রচিত পদাবলীতেই তাহার জাজ্বল্য প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়।

মহারাজ তেজচন্দ্র বাহাদুর কমলাকান্তের ইষ্ট-নিষ্ঠা ও ধর্মভাব দেখিয়া তাঁহাকে গুরুপদে বরণ করেন এবং ইঁহার বাসের জন্য বর্ধমান সহরের অনতিদূরে কোটালহাট নামক গ্রামে একটি বাটী নির্মাণ করিয়া দেন। কমলাকান্ত রাজপ্রদত্ত বাটীতে সস্ত্রীক আসিয়া বাস করেন। কত বৎসর বয়সের সময় যে ইঁনি দারপরিগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা জানিতে পারা যাই নাই। নূতন বাটীতে আসিয়া কমলাকান্ত মনের উৎসাহে ও আনন্দে সাধন-ভজন করিতে লাগিলেন। মহারাজা ইঁহার জপতপ ও ইষ্টপূজায় প্রগাঢ় ভক্তি দেখিয়া, ইষ্টপূজার জন্য একটি স্বতন্ত্র বাটী নির্মাণ করিয়া দেন এবং পূজাদির ব্যয়-নির্বাহের জন্য মাসিক বৃত্তি নির্ধারিত করিয়া দেন। ইহা ব্যতীত তিনি শ্রীশ্রী৺শ্যামাপূজার দিবস গুরুদেবের বাটীতে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া মহা-সমারোহে পূজাদি সমাপন করাইতেন।

কমলাকান্তের সহধর্মিণী রূপবতী ছিলেন না, কিন্তু গুণবতী ছিলেন। তিনি যেরূপ বুদ্ধিমতী ছিলেন, সেইরূপ বিশুদ্ধ ধর্ম-জ্যোতিঃতে তাঁহার হৃদয় আলোকিত ছিল। তিনি জানিতেন, স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে স্বামীই প্রত্যক্ষ দেবতা ; সেইজন্য প্রতিদিন স্বামীর পদপূজা এবং তাঁহার পাদোদক পান না করিয়া জলগ্রহণ করিতেন না। তিনি স্বামীকে যেরূপ স্নেহ, যত্ন ও ভক্তি করিতেন, স্বামীও তাঁহাকে সেইরূপ

ভালবাসিতেন। কমলাকান্ত বুঝিয়াছিলেন, এই মরুভূমিসদৃশ সংসার-মাঝারে রমণী-হৃদয়ের মত উত্তম পদার্থ আর নাই। তিনি বুঝিয়াছিলেন, রমণী-হৃদয় কোমলতা সরলতা, ধর্মভীরুতা প্রভৃতি নানাবিধ সদ্‌গুণে বিভূষিত। তিনি বুঝিয়াছিলেন রমণীগণ সংসারের দুঃখনিবারণ, সুখবৃদ্ধি এবং মঙ্গলসাধন করিতে সতত যত্নবতী। তিনি বুঝিয়াছিলেন, পুরুষ উগ্র ও কঠোর প্রকৃতির ; স্ত্রী স্নিগ্ধ, প্রেমময় ও কমনীয় ভাবের আধার। নারীজাতি তাহাদের হৃদয়গত স্বাভাবিক কমনীয় ভাব দ্বারা পুরুষের উগ্র ও কঠোর চরিত্র সংযমিত করিতে পারে বলিয়াই তিনি স্ত্রীজাতিকে অতিশয় ভালবাসিতেন।

এরূপ শুনিতে পাওয়া যায় যে, মহারাজ তেজশ্চন্দ্র বাহাদুরের কোনো উচ্চপদস্থ কর্মচারী কমলাকান্তকে স্ত্রীর প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত দেখিয়া তাঁহাকে রহস্যচ্ছলে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'আপনি কামিনী-কাঞ্চন লইয়া কিরূপে সাধন-ভজন করেন, তাহা বলিতে পারি না।' ইহার উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, 'পৃথিবীর সতী নারীগণ সেই আদর্শ-সতী ভগবতীর অংশরূপিণী। শাস্ত্রমতে 'স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু' অর্থাৎ জগতের সমস্ত স্ত্রীই সাধারণতঃ জগদম্বার অংশোদ্ভূতা, বিশেষতঃ সতীগণই সেই মহাশক্তি সতীশ্বরীর শক্ত্যংশরূপিণী সন্দেহ নাই ; অতএব সংসারে সুদুর্লভ বস্তু সতী স্ত্রী কদাচ সাধন-ভজনের বিঘ্নপ্রদা নহেন ; বরং সর্বথা ও সর্বদা সমধিক সহায়স্বরূপিণী। সাধ্বী স্ত্রী সম্বন্ধে স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন—

'নাস্তি ভার্যাসমো বন্ধুর্নাস্তি ভার্যাসমা গতিঃ।
নাস্তি ভার্যাসমো লোকে সহায়ো ধর্মসংগ্রহে ॥

সাধ্বী ভার্যাই প্রকৃত ভার্যা, তিনিই যথার্থ সহধর্মিণী পদবাচ্যা, সুতরাং সাধন ও ভজন-পথের তিনিই উৎকৃষ্ট আনুকূল্যরূপিণী। এরূপ সাধন-সহায়িনী ভার্যাই তন্ত্র-শাস্ত্রে 'শক্তি'-পদবাচ্যা। এইরূপ শুদ্ধ সাধন-সাধিনী পতির প্রিয়ান্তরাঙ্গিণী অর্ধাঙ্গিনী কদাচ 'কামিনী-কাঞ্চন'-এর কামিনী নহেন। কামিনী-কাঞ্চনের কামিনী ইহা হইতে স্বতন্ত্র। কর্মচারী কমলাকান্তের কথায় সন্তুষ্ট হইয়া পরে তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন।

কমলাকান্তের জীবদ্দশাতেই তাঁহার স্ত্রী ইহলোক পরিত্যাগ করেন। জীবমাত্রেরই জীবনের সহিত ইহজগতের সম্বন্ধ। কমলাকান্ত স্ত্রীকে চিতা-শয্যায় শয়ন করাইয়া অগ্নিপ্রদানসময়ে নিম্নলিখিত পদটি রচনা করিয়া গাহিয়াছিলেন ঃ—

'কালি ! সব ঘুচালি লেঠা।
শ্রীনাথের লিখন আছে যেমন, রাখ্‌বি কিনা রাখ্‌বি সেটা ॥
তোমার যারে কৃপা হয়, তার সৃষ্টি ছাড়া রূপের ছটা।
তার কটিতে কোপীন যোটে না, গায়ে ছাই আর মাথায় জটা ॥
শ্মশান পেলে সুখে ভাস, তুচ্ছ বাস মণি কোঠা।
আপনি যেমন ঠাকুর, তেমন ঘুচ্‌ল না তার সিদ্ধি ঘোঁটা ॥
দুঃখে রাখ সুখে রাখ, করব কি আর দিয়ে খোঁটা।
আমি দাগ দিয়ে পরেছি, আর পুঁছতে কি পারি সাধের ফোঁটা ॥
জগৎ জুড়ে নাম দিয়াছ, কমলাকান্ত কালীর বেটা।
এখন মায়ে-পোয়ে কেমন ব্যভার ; ইহার মর্ম জানবে কেটা ॥'

সঙ্গীতের মত মোহিনী শক্তি আর কিছুতেই নাই। গানের শব্দে সাপ ফণা তুলিয়া

ছিল ; কিন্তু নির্বোধ মহাদেবের তাহা অসহ্য হইয়া উঠিল। সে গৃহসংসারের কার্য না করিয়া বৃথা সময় নষ্ট করিতেছে, এই ভাবিয়া মহাদেব পূর্ণচন্দ্রকে হরিহরের বাটীতে যাইতে নিষেধ করিয়া দেয়। খাইবার ক্লেশ, পরিবার ক্লেশ, অথবা অন্য কোন প্রকার ক্লেশ হইলেও সে তাহা সহ্য করিতে পারিত ; কিন্তু ধর্মালোচনার ব্যাঘাতজনিত বর্তমান ক্লেশ তাহার একান্ত অসহ্য হইয়া উঠিল। ক্রমে যে মর্মপীড়ায় ব্যথিত ও কাতর হইয়া মহাদেবের আশ্রয় পরিত্যাগ করাই সর্বতোভাবে শ্রেয়স্কর বলিয়া বোধ করিল। অবশেষে উপায়ান্তর না দেখিয়া মহাদেবের আলয় পরিত্যাগ করিয়া হরিহরের আশ্রয় গ্রহণ করিল।

উভয়ে পরস্পর মিলিত হইয়া সুখে কালাতিপাত করিবার কিছু দিবস পরে, হরিহর পূর্ণচন্দ্রকে গার্হস্থ্যধর্ম অবলম্বন করিতে বলেন। পূর্ণচন্দ্র তাহাতে অমত প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিল, 'গার্হস্থ্যধর্ম পরিগ্রহ করিয়া, সতত সাধনকণ্টক পুত্রকলত্রাদিতে পরিবৃত থাকিয়া ও তাহাদিগের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যতার জন্য আত্মসুখ বিসর্জন ও ন্যায়া-ন্যায় বিচার পরিহারপূর্বক, নানাপ্রকার ঘৃণিত বৃত্তি ও ব্যবসায় অবলম্বন করতঃ নিয়তঃ বিড়ম্বিত হইতে আমার ইচ্ছা নাই। মানবজন্ম পরিগ্রহ করিয়া যে ব্যক্তি ভোগবাসনাকে বিষবৎ পরিত্যাগ করিতে না পারিল, তাহার জীবনধারণ বিড়ম্বনা-মাত্র।'

১৬২৩ শকের চৈত্রমাসে, পূর্ণচন্দ্র হরিহরের আশ্রয় ত্যাগ করিয়া বৈষ্ণবধর্ম-গ্রহণে একাগ্রচিত্ত হইয়া ফুলিয়াগ্রামে আগমন করেন। ফুলিয়াগ্রাম শান্তিপুরের অতি নিকটে ; রাঢ়ী শ্রেণীর কুলীন ব্রাহ্মণদিগের আদিম বাসস্থান : সুবিখ্যাত ফুলিয়ামেল এই গ্রামের নামানুসারেই হইয়াছে। এই স্থানেই শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর প্রিয়শিষ্য হরিদাসের পাট আজিও বিদ্যমান আছে। ১২৬৭ সালে ফুলিয়া ও বেলগড়িয়ায় ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রাদুর্ভাব হওয়ায়, অনেকে অকালে কাল-কবলে পতিত হয়। সেই অবধি ফুলিয়া একেবারে শ্রীভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে। এই গ্রামে বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবের বাস ছিল এবং অধিকাংশ অধিবাসী সতত ধর্মালোচনায় তৎপর থাকিয়া নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপ করিতেন। পূর্ণচন্দ্র এই স্থানে আসিয়া বৈষ্ণবচূড়ামণি বলরাম দাসের নিকটে বৈষ্ণব-ধর্মে দীক্ষিত ও আউলচাঁদ নামে অভিহিত হন।

বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করিয়া তিনি প্রায় দেড় বৎসরকাল ঐ গ্রামে অবস্থিতি করেন। তাঁহার গুরু বলরাম দাসের পূর্বদেশে কতকগুলি শিষ্য ছিল। একদা শিষ্যালয়ে গমনকালে তিনি তাঁহার নূতন শিষ্য আউলচাঁদকে সমভিব্যাহারে লইয়া যান। আউলচাঁদ গুরুর সহিত আর প্রত্যাগমন না করিয়া তীর্থপর্যটনের জন্য গমন করেন।

তীর্থপর্যটনে প্রবৃত্ত হইয়া আউলচাঁদ প্রায় সমস্ত ভারতবর্ষ প্রদক্ষিণ করেন, পরে বজরা* গ্রামে আসিয়া বাস করেন। ঐ সময়ে তিনি প্রত্যহ প্রত্যূষে ভিক্ষায় গমন করিয়া বেলা দ্বিপ্রহরের সময় আশ্রমে ফিরিয়া আসিতেন ও ভিক্ষালব্ধ সামগ্রী হইতে যৎকিঞ্চিৎ রাখিয়া অবশিষ্ট সমস্ত দীন, দুঃখী ও আতুরদিগকে বিতরণ করিতেন। তাঁহার এই সাধুতা ও পরোপকারপ্রিয়তা দর্শন করিয়া সকলেই

বজরা গ্রাম কোথায়, তাহা সঠিক জানা যায় নাই, তবে অনুমান দ্বারা বুঝা যায় যে, উহা কাঁচড়াপাড়ার নিকটবর্তী কোন গ্রাম হইবে।

আশ্চর্যান্বিত হইত। বজবাবাসীরা তাঁহাকে দিন দিন চিনিতে লাগিল। তাঁহার ধর্মতত্ত্ব শুনিয়া দুঃখী দুঃখ ভুলিয়া যাইত, পতিপুত্রহীনা অভাগিনীর অবসন্ন প্রাণে যেন সঞ্জীবনী-সুধা ঢালিয়া দিত, গ্রামবাসীগণ ক্রমে তাঁহার আশ্রমে আসিতে লাগিল। তাঁহার সারগর্ভ কথামালা শ্রবণ করিয়া বিভ্রান্ত মানবের জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে হরিনামের স্রোতে নির্জীব ও নিরানন্দ বজরাগ্রাম জাগিয়া উঠিল। এরূপ জনশ্রুতি আছে যে, আউলচাঁদ দৈবশক্তি-বলে অন্ধের চক্ষু, খঞ্জের পদ এবং দুরারোগ্যব্যাধিগ্রস্তকে অচিরাৎ আরোগ্য করিতে পারিতেন। ঐ সময়ে যে গান বাঁধা হইয়াছিল, এস্থলে তাহার একটা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

'এ ভাবের মানুষ কোথা হ'তে এলো ?
এর নাইকো রোষ, সদাই তোষ, মুখে বলে সত্য বল।
এর সঙ্গে বাইশ জন, সবার একটি মন,
জয়কর্তা বলি, বাহু তুলি, কর্‌লে প্রেমে ঢলাঢল ॥
এ যে হারা দেওয়ায়, মরা বাঁচায়, এর হুকুমে গঙ্গা শুকালো ॥'

এই সময়ে তাঁহার অনেকগুলি শিষ্য হইয়াছিল, তন্মধ্যে হটু ঘোষ, বেচু ঘোষ, রামশরণ পাল, খেলারাম মাল, পাঁচু মুচি, কৃষ্ণদাস, বিষ্ণুদাস, শ্যামচাঁদ, লক্ষ্মীকান্ত প্রভৃতি বাইশ জন ব্যক্তি প্রধান শিষ্য ছিলেন। রামশরণ শূল-ব্যাধি হইতে মুক্ত হওয়ায় ইঁহার শিষ্যত্বপদ গ্রহণ করেন।

রামশরণ সদ্‌গোপ জাতীয় একজন সামান্য গৃহস্থ। চাকদহের সন্নিকটে জগদীশপুর নামক গ্রামে ইঁহার পূর্বপুরুষদিগের বাস ছিল। ইঁহার পিতা নন্দলাল জয়পুর গ্রামের শিশু ঘোষের কন্যা গৌরীর সহিত রামশরণের বিবাহ দেন। গৌরীর গর্ভে রামশরণের দুইটি কন্যা হয়। দুইটি কন্যাই জন্মগ্রহণের পরদিবস মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায়, তিনি স্বেচ্ছায় গোবিন্দপুর গ্রামের গোবিন্দ ঘোষের কন্যা সরস্বতীকে বিবাহ করেন। ইঁহার গর্ভে তাঁহার রামদুলাল নামক একটি পুত্র জন্মে। রামশরণ কোন আত্মীয়ের সাহায্যে নদীয়া জেলার অন্তর্গত ভবনপুরের খাঁ-বংশোদ্ভব রাজাদিগের রায়বাইয়া পদ্মলোচন রায় বাহাদুরের বাটীতে অতিথিসেবার তত্ত্বাবধায়কের পদ লাভ করেন। তিনি এই কার্যে স্বীয় প্রভুকে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট হইতে 'বিশ্বাস' উপাধি লাভ করেন। ইহার পর রায়বাহাদুর রামশরণকে উখরা পরগণায় একটি মহালের নায়েবীপদ দেন। এই মহালে রামশরণ আউলচাঁদের সাক্ষাৎলাভ করেন। রামশরণ শূলব্যাধিগ্রস্ত ছিলেন। সময়ে সময়ে তিনি এই ব্যাধির যন্ত্রণায় মূর্ছিত হইয়া পড়িতেন। একদা তাঁহার কাছারীতে আউলচাঁদ আসিয়া উপস্থিত হন। ঐ সময়ে রামশরণ শূল-বেদনায় মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া অশেষবিধ যন্ত্রণাভোগ করিতেছিলেন। রামশরণের অবস্থা দেখিয়া আউলচাঁদ তাঁহার ভৃত্য ও পরিবারবর্গের নিকটে এরূপ দুর্দশা ও মূর্ছার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। ভৃত্যাদিগের মুখে রামশরণের আমূল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, তিনি আপন কমণ্ডলু হইতে কিছু জল লইয়া তাঁহার চোখে ও মুখে দেন। ইহার অল্পক্ষণ পরেই রামশরণ সকল যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইয়া চৈতন্যলাভ করেন। সেই অবধি রামশরণ ইঁহাকে গুরু বলিয়া ভক্তি করিতেন। এই রামশরণের দ্বারাই আউলচাঁদের মত প্রচারিত হয়।

আউলচাঁদের মৃত্যুঘটনা অতি আশ্চর্যজনক। ১৬৭১ শকের বৈশাখ মাসে

দিবাবসানে বোয়ালিয়া গ্রামে ইনি দেহত্যাগ করেন। এক দিবস বোয়ালিয়া হইতে সংবাদ আসিল যে, তাঁহার প্রিয়শিষ্য কৃষ্ণদাসের অন্তিমকাল উপস্থিত, সে কেবল গুরুদর্শন-আশাতেই বাঁচিয়া আছে। এই সংবাদ প্রাপ্ত হইবামাত্র আউলচাঁদ ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া শিষ্যদিগকে বলিলেন, 'তোমরা জনকতক আমার সঙ্গে এস, আমার আয়ুঃশেষ হইয়া আসিয়াছে। বোয়ালিয়া হইতে আমি আর প্রত্যাগমন করিতে পারিব না।' এই কথা বলিয়া তিনি খেলাত ও কন্থা গাত্রে দিয়া কয়েকজন শিষ্য-সমভিব্যাহারে বোয়ালিয়া গমন করেন। তিনি বোয়ালিয়া পৌঁছিয়াই জ্বরাক্রান্ত হইয়া যে শয্যায় শয়ন করিলেন, তাহা হইতে আর উঠিলেন না। আউলচাঁদ যখন বুঝিলেন, তাঁহার সময় নিকটবর্তী হইয়া আসিয়াছে, তখন তিনি শিষ্যদিগকে বলিলেন, 'আমায় বহিঃপ্রাঙ্গণের তুলসীতলে লইয়া চল, আর তোমরা সকলে উচ্চৈঃস্বরে সুধাময় হরিনাম সংকীর্তন কর।' শিষ্যেরা তাহাই করিল। হরিনাম শুনিতে শুনিতে ও জড়িতকণ্ঠে হরিনাম উচ্চারণ করিতে করিতে ভক্তচূড়ামণি আউলচাঁদের প্রাণবায়ু বহির্গত হইল।

আউলচাঁদ দেহরক্ষা করিলে, শোকাকুল শিষ্যমণ্ডলী তাঁহার মৃতদেহ বহন করিয়া পরারি গ্রামে লইয়া যাইয়া সমাধি দেন এবং তাঁহার গাত্রের কাঁথাখানি বোয়ালিয়া গ্রামে প্রোথিত করা হয়। আবার কেহ বলেন যে, তাহা নহে; জীবিতাবস্থায় প্রভু তাঁহার জীর্ণ কাঁথাখানি রামশরণ পালকে দিয়া গিয়াছিলেন। ঐ কাঁথা আজিও উহাদের গৃহে বর্তমান আছে।

রামশরণ পাল গুরুর উপযুক্ত শিষ্য ছিলেন। প্রভুর সমাধিকার্য শেষ হইলে, তিনি নিজ গ্রামে ঘোষপাড়ায় আসিয়া অন্যান্য শিষ্য ও বৈষ্ণবদিগকে আমন্ত্রণপূর্বক একটি মহোৎসব করেন এবং ঐ সম্প্রদায়ের একমাত্র চালক হন। কিয়দ্দিবস পরে তাঁহার মৃত্যু হইলে, সমগ্র আউলভক্তেরা একত্র ও একমত হইয়া তদীয় বংশধর ঈশ্বরচন্দ্র পালকে সমস্ত ভারার্পণ করেন। ইঁহার লোকান্তরের পর ইঁহার পুত্র হরিদাস পাল ও ভাতৃপুত্র রসিকচন্দ্র পাল মহাশয়েরা সম্প্রদায়ের সকল ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

রামশরণের সহধর্মিণী অতিশয় পতিপ্রাণা ও শুদ্ধাচারিণী ছিলেন। আউলচাঁদ তাঁহাকে মাতৃসম্বোধন করিতেন। তাঁহার ভক্তেরা তাঁহাকে সতী-মা বলিয়া ডাকিত। সতী-মার সতীত্ব গৌরব আজিও বঙ্গদেশের প্রায় সর্বত্র দেদীপ্যমান রহিয়াছে।

আউলচাঁদ নবাগত শিষ্যদিগকে যথাবিধি মন্ত্র প্রদান করিয়া, কায়িক, বাচনিক ও মানসিক দশটি কর্ম করিতে নিষেধ করিতেন, তৎপরে কয়েকটি সদুপদেশ দিতেন।

তিনি বলিতেন,—'একমাত্র পরম চৈতন্যস্বরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করিবে; অথচ অন্যান্য দেবতাদিগকে নিন্দা করিবে না। মন্ত্র—দাতা গুরুকে মনুষ্যজ্ঞান করিবে না এবং তাঁহাকে প্রত্যহ মানসে ও প্রত্যক্ষে প্রদক্ষিণ করিবে। উদয় ও অস্তগমন-সময়ে ধৌতবস্ত্র পরিধান করিবে। কায়মনে অতিথির সেবা-শুশ্রূষা করিবে। নিয়ত আত্মোদ্ধারের অদ্বিতীয় উপায়স্বরূপ হরিনাম ও সৎকর্মে তৎপর রহিবে। মনুষ্যমাত্রকেই আপন সহোদরের ন্যায় দেখিবে। সর্বস্থানে ও সকল সময়ে, সৎকথা ও বৈষ্ণবধর্মের গুণকীর্তন প্রভৃতির আলোচনা করিবে। প্রতিদিন আহারের পূর্বে তুলসীতলস্থ পবিত্র মৃত্তিকা ভক্ষণ করিয়া দেহ শুদ্ধ করিবে এবং সকল জাতীয় নিরামিষ অন্ন ভক্ষণ করিবে। এই সম্প্রদায় সম্বন্ধীয় কোনো কথা কাহাকেও বলিবে না; ও সত্যতে তৎপর থাকিয়া গুরু সত্য বিপদ মিথ্যা, ইহাই দৃঢ় প্রত্যয় করিবে।'

যে দশটি কর্ম করিতে নিষেধ করিয়াছেন, তাহা এই—

কায়-কর্ম তিনটি—পরস্ত্রীগমন, পরদ্রব্যহরণ ও পরহত্যা বা পরপীড়ন করণ।

মনঃ-কর্ম তিনটি—পরদ্রব্য হরণের ইচ্ছা, পরহত্যাকরণের ইচ্ছা ও পরস্ত্রীগমনের ইচ্ছা।

বাক্য-কর্ম চারিটি—মিথ্যাকথন, কটুকথন, অনর্থক বচন ও প্রলাপ ভাষণ।

এ সম্প্রদায়ী গুরুদিগের নাম মহাশয়, শিষ্যের নাম বরাতি। ইঁহারা শিষ্যকে প্রথমে 'গুরু সত্য' এই মন্ত্র প্রদান করেন। পরে তাঁহাদের ভক্তি প্রগাঢ় হইলে সমস্ত মন্ত্র উপদেশ দেন, যথা—

'কর্তা আউলে মহাপ্রভু, আমি তোমার সুখে চলি ফিরি, তিলার্ধ তোমা ছাড়া নাই, আমি তোমার সঙ্গে আছি, দোহাই মহাপ্রভু।'

আজিও প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমা তিথিতে ঘোষপাড়ায় একটি করিয়া উৎসব হইয়া থাকে।

—:০:—

রঘুনাথ দাস

মহাপ্রভু চৈতন্যদেব যে সময়ে বঙ্গে হরিভক্তি বিলাইতে আরম্ভ করেন, সেই সময়ে হিরণ্য দাস ও গোবর্ধন দাস নামক দুই ব্যক্তি গৌড়ের নবাবের নিকট হইতে সপ্তগ্রাম পত্তনি লইয়াছিলেন। ঐ সময়ে সপ্তগ্রাম বাণিজ্য-প্রধান নগরী ছিল। চতুর্দশ শতাব্দীতে দিল্লীর বাদশাহের প্রতিনিধি হোসেন শাহ বাঙলার তদানীন্তন রাজধানী গৌড় নগরের রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়াছিলেন। সেই সময়ে শ্রীমদ্ রূপ-সনাতন ইঁহার উজীর ছিলেন। উঁহার পত্তনি লইবার সময় শ্রীরূপের নিকট হইতে বিশেষ সহায়তা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহার নিকট আজীবনকাল কৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ ছিলেন; এরূপ কথিত আছে যে, ঐ সময়ে সপ্তগ্রাম হইতে প্রতি বৎসর প্রায় কুড়ি লক্ষ টাকা আদায় হইত। উহার মধ্যে গৌড়ের নবাব বার লক্ষ টাকা মাত্র প্রাপ্ত হইতেন, বাকী আট লক্ষ টাকা উঁহারা লাভ করিতেন। চারি পাঁচ শত বৎসর পূর্বে বাৎসরিক আট লক্ষ টাকা আয়, বর্তমান কালের তুলনায় যে এক কোটী টাকা হইবে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এত টাকার মালিক হইয়াও ইঁহারা সৎস্বভাব, সরল প্রকৃতি ও ধর্মানুরাগী ছিলেন। ইঁহাদের অর্থের অধিকাংশই সৎকার্যে ব্যয় হইত। দোল, দুর্গোৎসব, পূজাপার্বণাদির ত কথাই নাই; ইহা ব্যতীত দেবালয় প্রতিষ্ঠা, অতিথিশালা প্রভৃতি বহুবিধ সৎকার্য অনুষ্ঠিত হইত। ইঁহাদের সভা এখনকার মত তোষামোদকারীদিগের পরিবর্তে, বিষ্ণুভক্ত এবং ভাগবতজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর দ্বারা পূর্ণ থাকিত।

হিরণ্য দাস ও গোবর্ধন দাস দুই সহোদর। হিরণ্য জ্যেষ্ঠ, গোবর্ধন কনিষ্ঠ। কনিষ্ঠ গোবর্ধন দাসের ঔরসে ১৪০৭ বা ১৮ শকে রঘুনাথ জন্মগ্রহণ করেন। পঞ্চম বৎসর বয়সে ইঁহার বিদ্যারম্ভ হয় ও বিদ্যাশিক্ষার জন্য সপ্তম বর্ষ হইতে তিনি গুরুগৃহে গমন করেন।

চাঁদপুর নামক একটি পল্লী সপ্তগ্রামের অন্তর্গত ছিল। ইঁহাদের কুল-পুরোহিত বলরাম আচার্য ঐ পল্লীতে বাস করিতেন। বালক রঘুনাথ ঐ কুল-পুরোহিতের নিকটেই বিদ্যাভ্যাস করিতে যাইতেন। রঘুনাথের বয়স যখন দ্বাদশ বৎসর, সেই সময়ে হরিদাস নামক একজন যবন হিন্দুধর্মের হরিনাম মহামন্ত্র গ্রহণ করায় এবং উহা জপ ও উহাতে উন্মত্ত হওয়ায়, দুর্বৃত্ত জমিদারের অত্যাচারে ও কাজির প্রহারে উৎপীড়িত হইয়া উক্ত বলরাম আচার্যের আশ্রয় গ্রহণ করেন। হরিদাস আচার্য মহাশয়ের আশ্রয় পাইয়া নির্বিঘ্নে হরিনাম সাধনা করিতে লাগিলেন। হরিদাস হরিনাম-রসে মাতোয়ারা হইয়া, ভাবাবেশে উন্মত্তের ন্যায় নৃত্য করিতেন বলিয়া, সকলেই তাঁহাকে পাগল বলিত।

আচার্য মহাশয়ের গৃহে যে সকল বালক অধ্যয়ন করিতে যাইত, তাহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই হরিদাসকে পাগল মনে করিয়া তাঁহার গায়ে ধূলা, কাদা, গোবর প্রভৃতি দিত এবং পাগল পাগল বলিয়া ক্ষেপাইবার চেষ্টা করিত, কিন্তু বালক রঘুনাথ প্রত্যহ ভক্তমুখে পরিত্রাণপদ হরিনাম শ্রবণ করায় তাঁহার হৃদয়ে একটি নূতন ভাবের উদয় হয়। লেখা-পড়ায় রঘুনাথের আর তেমন যত্ন রহিল না, তিনি আচার্য মহাশয়ের অনুপস্থিতিকালে

হরিদাসের নিকটে গিয়া তাঁহার রঙ্গভঙ্গ দেখিতেন ও নামগানে যোগদান করিতেন। গোবর্ধন দাসের সুহৃদবর্গ ও আত্মীয়স্বজনেরা রঘুনাথের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া সকলে বলাবলি করিত, 'এই ভণ্ড মুসলমানটা একটি ভদ্রলোকের একমাত্র বংশের তিলক ছেলেটিকে পাগল করিতেছে।' ক্রমে উহাদিগকে উৎপীড়নে হরিদাস সপ্তগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া শান্তিপুরে আসিয়া বাস করেন।

হরিদাস সপ্তগ্রাম ত্যাগ করিয়া আসিলেন বটে, কিন্তু তাহাতে রঘুনাথের মনোভাব পরিবর্তিত হইল না। তিনি বয়োবৃদ্ধি সহকারে অন্যান্য কার্যের ন্যায় ধর্মালোচনাতেও সময় কাটাইতেন। বাল্যকাল হইতেই সাংসারিক ভোগবিলাসের প্রতি তাঁহার বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছিল। সুন্দর পরিচ্ছদ ও বহুমূল্য অলঙ্কারাদি, সুখসেব্য বস্তু, সুস্বাদু খাদ্য, চাটুকারদিগের তোষামোদ, দাসদাসীদিগের সেবা ইত্যাদি ধনী সন্তানের যাহা কিছু আসক্তির বিষয়, ইনি সে সমস্ত বিষবৎ পরিত্যাগ করিয়া বৈরাগ্যে পরম সুখসম্ভোগ করিতেন।

যে সময়ে চৈতন্যদেব শান্তিপুরে ছিলেন, সেই সময়ে রঘুনাথ তথায় উপস্থিত থাকিয়া সাধুসহবাসে কালযাপন করিতেন এবং মনে মনে বলিতেন, 'হে দয়াময় হরি! আমি কি রূপে এই সংসার কারাগার হইতে মুক্ত হইয়া আজীবনকাল সাধুসহবাসে জীবন কাটাইতে পারিব?' মহাপ্রভু চৈতন্যদেব রঘুনাথের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া শান্তিপুর পরিত্যাগ করিবার সময়ে রঘুনাথকে এই উপদেশ দিয়া যান যে—

'লোকে একেবারে ভবসিন্ধু পার হইতে পারে না। বৈরাগ্য অতি পবিত্র বস্তু, ইহাকে অতি যত্নে রক্ষা করিতে হয়। পরকে দেখাইবার জন্য যে ব্যক্তি বৈরাগ্যভাব ধারণ করে, তাহার সেই বাহ্যভাবে সমস্ত ধর্ম বিনষ্ট হয়। যে সাধক বাহিরে বিষয়ভোগ করিয়া অন্তরে সম্পূর্ণ বৈরাগ্য আচরণ করে, সেই যথার্থ বৈরাগী। বৎস, তুমি এখন গৃহে গমন করিয়া অনাসক্তভাবে বিষয়ভোগ কর, অন্তরে প্রকৃত নিষ্ঠা রক্ষা করিয়া বাহিরে লোকের সহিত রীতিমত লৌকিক ব্যবহার কর। ইহাই ধর্মানুরাগীর প্রকৃত লক্ষণ। তুমি এইমত কার্য করিলে ঈশ্বর তোমাকে উদ্ধারের উপায় করিয়া দিবেন। যে ব্যক্তি তাঁহার শরণাগত হয়, তাহার আর নিজের উদ্ধারের উপায় নিজেকে করিয়া লইতে হয় না। তুমি তাহার চরণে মন সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্তে গৃহে প্রতিগমন কর।'

রঘুনাথ, চৈতন্যদেবের নিকট হইতে গূঢ় স্নেহপূর্ণ উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া আপনাকে সৌভাগ্যবান্ মনে করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার আজ্ঞা-প্রতিপালনে যত্নবান্ হইলেন। ইনি গৃহে আসিয়া বিষয়-কার্যের ভারগ্রহণ করেন। রঘুনাথ পিতা ও পিতৃব্যের পরিশ্রমের কার্য সকলের ভারগ্রহণ করিয়া কিছুকাল পরম সুখে অতিবাহিত করেন। এক দিবস রঘুনাথ শুনিলেন যে, নিত্যানন্দ কলিকাতার চারি ক্রোশ উত্তরে পানিহাটী গ্রামে হরিনাম প্রচার করিয়া বেড়াইতেছেন, ইহা শুনিবামাত্র রঘুনাথ তথায় যাইবার জন্য পিতার মত প্রার্থনা করেন। গোবর্ধন মত দিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার স্ত্রী প্রাণাধিক সন্তানকে ভক্তদলে মিশিতে বারণ করিলেন। সহধর্মিণীর উত্তরে গোবর্ধন দাস বলিলেন, পুত্রের যখন ধর্ম-গত প্রাণ, তখন একাদিক্রমে সাধুসঙ্গ হইতে বঞ্চিত রাখাও উচিত নহে, তাহাতে উদ্বেগ বৃদ্ধি পাইয়া বরং আরও অনিষ্ট ঘটিতে পারে।' গোবর্ধন সহধর্মিণীকে এইরূপ বুঝাইয়া উভয়ে রঘুনাথকে পানিহাটি গ্রামে যাইতে আদেশ করেন। মাতা-পিতার আদেশ পাইয়া রঘুনাথ নিত্যানন্দের সহিত মিলিত হন। রঘুনাথ নিতাই-এর

পদে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলেন, 'প্রভু, আমি অতি নরাধম, আমার মনে চৈতন্যদেবের পাদপদ্মলাভের বাসনা কেন যে উদিত হইয়াছে তাহা বলিতে পারি না। আমি নিজ চেষ্টায় সম্পূর্ণ বিফল হইয়া আপনার শ্রীচরণ ভরসা করিতেছি, আপনার কৃপা ব্যতিরেকে আমার শ্রীচৈতন্যলাভের আশা নাই। আপনি একবার এই অধমের মস্তকে পদার্পণ করিয়া আশীর্বাদ করিলে আমি নিশ্চিন্ত হইতে পারি।'

নিত্যানন্দ রঘুনাথের এই প্রকার কাতর বৈরাগ্যোক্তি শ্রবণ করিয়া ভক্তদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'দেখ দেখ, ইহার বাদসাহের তুল্য ক্ষমতা, কুবেরের তুল্য ধন, ইন্দ্রের তুল্য ঐশ্বর্য। যাহার কিছুমাত্র পাইবার জন্য শত শত লোক ইহ-পরকাল বিস্মৃত হইয়া কতই না ঘৃণিত কার্য করে; আর ইনি এই সকল তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া বিষবৎ পরিত্যাগ করিয়াছেন। সেই অতুল ঐশ্বর্য ইঁহাকে কিছুমাত্র সুখ দিতে পারিতেছে না। রঘুনাথ! আমরা সকলেই আশীর্বাদ করিতেছি, তুমি তোমার চিরবাঞ্ছিত বস্তু শীঘ্রই প্রাপ্ত হও।'

রঘুনাথ ভক্তগণের আশীর্বাদ প্রাপ্ত হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন এবং উৎকট ব্রত অবলম্বন করিয়া নাম-জপের দ্বারা দিনযাপন করিতে লাগিলেন। কয়েক বৎসর-কাল এইরূপে অতিবাহিত হইবার পর একদিন তিনি অর্ধরাত্রে অতুল ঐশ্বর্য, লক্ষ্মীসমা ভার্যা, স্বর্গাদপি গরীয়সী জননীর হৃদয়ে শেল বিদ্ধ করিয়া, আকাশ অপেক্ষাও মহোচ্চ পিতৃদেবকে নিরাশ-সাগরে ডুবাইয়া, আপনার অভিলষিত দ্রব্যলাভের আশায় শ্রীক্ষেত্রাভিমুখে গমন করেন। রঘুনাথ বহু কষ্টে, বহু পরিশ্রমে, অনাহারে ও অনিদ্রায় কয়েক দিবস চলিয়া পুরীধামে উপস্থিত হন। পরে চৈতন্যদেব হইতে একে একে সমস্ত ভক্তবৃন্দকে প্রণাম করিলে সকলেই প্রেমার্দ্রভাবে তাঁহাকে আলিঙ্গন করেন।

রঘুনাথ পথে কি প্রকার কষ্টভোগ করিয়া আসিয়াছিলেন, চৈতন্যদেব তাহা জানিতে পারিয়া আপনার পরিচারক গোবিন্দকে ডাকিয়া বলিলেন, 'দেখ, রঘুনাথ পথে অত্যন্ত কষ্ট পাইয়াছে, অনেক উপবাস করিয়াছে, তুমি কিছুদিন ইহার প্রতি দৃষ্টি রাখিও।' সেই সঙ্গে রঘুনাথকে বলিলেন, 'তুমি সমুদ্রে স্নান করিয়া এইখানে আসিয়া ভোজন করিও।' রঘুনাথ স্নান ও দেবদর্শনাদিক্রিয়া সমাপন করিয়া গোবিন্দের নিকট আসিলে গোবিন্দ গুরুর ভোজনাবশিষ্ট পাত্র তাঁহাকে প্রদান করিলেন। ভক্ত বৈষ্ণব-দিগের নিকট প্রসাদান্ন অপেক্ষা অমূল্য বস্তু আর নাই, যে রঘুনাথ গৌরাঙ্গের দর্শন-লালসায় মৃতপ্রায় হইয়াছিলেন, আজ তাঁহার প্রসাদান্ন ভোজনের অধিকারী হইলেন।

রঘুনাথ ক্রমান্বয়ে পাঁচ দিন গুরুর প্রসাদ ভোজন করিবার পর মনে মনে এইরূপ ভাবিলেন যে, 'মহাপ্রসাদ আহারের জন্য নয়, আত্মার পরিত্রাণার্থ গ্রহণ করা উচিত। তবে আমি কি করিতেছি! দেহের পুষ্টি হেতু এই পবিত্র বস্তুর অপব্যবহার করিলে নিশ্চয় আমি অধিকতর অপরাধী হইব; অতএব এরূপ করা আমার পক্ষে কোন মতেই উচিত নয়।' এইরূপ যুক্তি স্থির করিয়া, ষষ্ঠ দিবসে সমুদ্রে স্নানান্তে গুরু-দেবকে প্রণাম করিয়া জগন্নাথ দর্শনে গমন করিলেন। তথায় তিনি সমস্ত দিবস মন্দিরের দ্বারে দাঁড়াইয়া নামসাধন করিয়া সন্ধ্যার পর কুটীরে প্রত্যাগমন সময়ে দোকান হইতে ভিক্ষা করিয়া ভোজন করিতে লাগিলেন। এদিকে গোবিন্দ, রঘুনাথ আর প্রসাদ পাইতে আসেন নাই দেখিয়া তাঁহার তত্ত্ব লইল এবং যথাযথ সমস্ত গৌরাঙ্গকে

নিবেদন করিল। গোবিন্দের মুখে ঐ সকল কথা শ্রবণ করিয়া চৈতন্যদেবের আর আহ্লাদের সীমা রহিল না। একজন অতুল ঐশ্বর্যের অধিপতি সমস্ত দিবস দেব-মন্দিরের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান থাকিয়া নামসাধনা করিতেছেন, নিজের আহারের জন্য কোন চেষ্টা নাই, সামান্য ভিক্ষান্নে আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতেছেন, ইহা অপেক্ষা অতুলনীয় বৈরাগ্যের দৃষ্টান্ত আর কোথায় ?

কয়েকদিবস পরে রঘুনাথ, মন্দির দ্বারে ভিক্ষার্থ দণ্ডায়মান থাকা উচিত নহে, ইহা বিবেচনা করিয়া ঐ রীতি পরিত্যাগ করিলেন এবং যথাকালে অন্নসত্রে যাইয়া ভিক্ষান্ন ভোজন করিয়া দেহরক্ষা করিতে লাগিলেন। তিনি এইরূপ কিছুদিন অতিবাহিত করিয়া বুঝিলেন, ভিক্ষা করিয়া ভোজন করাও তাঁহার অন্যায়, অগত্যা তাহাও পরিত্যাগ করিয়া প্রসাদান্ন-বিক্রেতাদের পরিত্যক্ত অন্নভোজনে প্রবৃত্ত হইলেন। অবিক্রীত অন্ন পচিয়া যাইলে যখন তাহারা পয়ঃপ্রণালী-মধ্যে ফেলিয়া দিত, রঘুনাথ সেই অন্ন ধৌত করিয়া ভোজন করিতেন। রঘুনাথের কোন কার্যই গৌরাঙ্গের অগোচর থাকিত না। যে দিন তিনি শুনিলেন, রঘুনাথ নব প্রসাদ ভোজনের আয়োজন করিতেছেন, সে দিন তিনি আর কিছুতেই আপন কুটীরে স্থির থাকিতে পারিলেন না। প্রেমের ভরে দৌড়িয়া আসিয়া দেখেন, রঘুনাথ গদগদচিত্তে উক্ত অন্ন ভোজন করিতেছেন। গৌরাঙ্গ রঘুনাথকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'রঘু ! তুমি এমন বস্তু খাও, আর আমাকে দাও না ?' এই কথা বলিয়া তিনি রঘুনাথের উচ্ছিষ্ট পাত্র হইতে এক গ্রাস তুলিয়া আপন মুখে অর্পণ করিলেন। দ্বিতীয় গ্রাস লইবামাত্র রঘুনাথ সঙ্কুচিত হইয়া বলিলেন, 'প্রভু ! করেন কি, এ আহার কি আপনার যোগ্য ?'

চৈতন্যদেবের তিরোধানের পর রঘুনাথ বৃন্দাবনে গমন করিয়া রাধাকুণ্ডে বাস করিতে লাগিলেন। তথায় তিনি যোগবলে দেহ পরিত্যাগ করেন। রঘুনাথ দাসের কয়েকখানি ক্ষুদ্র-কলেবরের গ্রন্থ বৈষ্ণবসমাজে অতি আদরের সহিত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উপদেশামৃত, মনঃশিক্ষা, শ্রীচৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষ, বিলাপ-কুসুমাঞ্জলি ও শ্রীপ্রেমাম্বুজমকরন্দাখ্যস্তবরাজ বিশেষ প্রসিদ্ধ।

—:০:—

উদ্ধারণ ঠাকুর

১৪০৩ শকে সপ্তগ্রামে শ্রীকর দত্তের ঔরসে, ভদ্রাবতীর গর্ভে শ্রীমন্দত্ত উদ্ধারণ ঠাকুর জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীকর দত্ত একজন প্রসিদ্ধ বণিক ছিলেন। ব্যবসায়-বাণিজ্য দ্বারা তিনি অনেক অর্থ উপার্জন করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর উদ্ধারণ পিতার বিষয়-সম্পত্তি দেখিতে মনোযোগ করেন। ইনি হুসেন সার নিকট হইতে নিজ নামে একটি জমিদারী খরিদ করিয়া আপন নামানুসারে তাহার নাম উদ্ধারণপুর রাখিয়াছিলেন। ঐ উদ্ধারণপুর কাটোয়ার সন্নিকটে আজিও বিদ্যমান আছে।

উদ্ধারণ দত্ত পরম ভক্ত ছিলেন। যে সময়ে নিত্যানন্দ ধর্মপ্রচারার্থ সপ্তগ্রামে আসিয়াছিলেন, সেই সময়ে তিনি ইঁহার গৃহে কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন। নিত্যানন্দের ধর্মোপদেশে উদ্ধারণের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হয় ও মনমধ্যে বৈরাগ্য জন্মে। ইহার পর ইনি আপনার অতুল বিষয়-বৈভব পরিত্যাগ করিয়া নীলাচলে গমন করেন; তৎপরে শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া বাস করেন। তথায় ৫৭ বৎসর বয়সে অর্থাৎ ১৪৬০ শকে মাঘ মাসের কৃষ্ণা ত্রয়োদশী তিথিতে সমাধিস্থ হন। বংশীবট-সন্নিধানে ইঁহার সমাধি-মন্দির আজিও বিদ্যমান আছে।

এরূপ জনশ্রুতি আছে যে, এক দিবস একজন শাঁখাবিক্রেতা শাঁখাবিক্রয়ের জন্য সরস্বতী নদীর নিকট দিয়া সপ্তগ্রামে যাইতেছিল। পথিমধ্যে একটি পরমা সুন্দরী বালিকা আসিয়া উহার নিকট হইতে আপনার মনোমত একজোড়া শাঁখা লইয়া উদ্ধারণের বাটী দেখাইয়া দেয়, এবং তাঁহার নিকট হইতে শাঁখার মূল্য লইতে বলেন। শাঁখারী বালিকার কথা শুনিয়া প্রথমে উহা দিতে অস্বীকার করে, পরে তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিয়া এইমাত্র বলে যে, 'যদি শাঁখা বিক্রয়ের কথা বিশ্বাস না করেন?' তাহাতে বালিকা এই উত্তর করেন যে, 'তুমি তাঁহাকে বলিও, যদি আপনার কাছে মূল্য না থাকে, তাহা হইলে পূর্ব-ঘরের পশ্চিমদিকের কুলিঙ্গায় আপনার মেয়ের পাঁচটি স্বর্ণমুদ্রা আছে, তাহাই আমাকে দিতে বলিয়াছে। ইহাতেও যদি তিনি তোমাকে মূল্য না দেন, তাহা হইলে তুমি এখানে আসিয়া তোমার শাঁখা ফেরত লইয়া যাইও।' শাঁখারী বালিকার কথা শুনিয়া, আর কোনরূপ দ্বিরুক্তি না করিয়া উদ্ধারণের বাটীতে আসে এবং পথিমধ্যে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তৎসমস্ত ব্যক্ত করে।

শাঁখারীর কথা শুনিয়া উদ্ধারণ বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে বলেন, বাপু হে! আমার ত কন্যা নাই, তবে যদি অন্য কাহারও মেয়ে শাঁখা লইয়া আমার নাম করিয়া থাকে, বলিতে পারি না। ভাল, অগ্রে উপরকার ঘরের কুলিঙ্গা দেখিয়া আসি, পরে যাহা ভাল হয়, করা যাইবে।' এই কথা বলিয়া, উদ্ধারণ শাঁখারীর কথামত পূর্ব-ঘরের পশ্চিমদিকের কুলিঙ্গা অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। ফলতঃ সত্যসত্যই তথায় পাঁচটি স্বর্ণমুদ্রা দেখিতে পাইলেন। ইহাতে উদ্ধারণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, 'এ মেয়ে কে, অগ্রে দেখিতে হইবে।' পরে তিনি শাঁখারীর কাছে আসিয়া বলিলেন, 'বাপু হে! যদি তুমি আমায় সেই মেয়েকে দেখাইতে পার, তাহা হইলে এই

পাঁচটি মুদ্রা তোমারই প্রাপ্য।' শাঁখারী উদ্ধারণের কথায় সম্মত হইয়া তাঁহাকে সেই স্থানে লইয়া গেল; কিন্তু বালিকাকে দেখিতে পাইল না। উভয়ে অনেক অনুসন্ধান করিল; কিন্তু সেরূপ বালিকা আর তাঁহাদের নয়নপথে পতিত হইল না। তখন উদ্ধারণ বুঝিলেন যে, সে বালিকা সামান্য বালিকা হইবে না, তিনি অনাদ্যা—পরমারাধ্যা—শিবসাধ্যা—মহাবিদ্যা—শক্তিস্বরূপিণী জগজ্জননী ভিন্ন আর কেহই নহেন। তখন দত্তমহাশয় শাঁখারীকে বলিলেন, 'ভাই! তুমি সামান্য ব্যক্তি নও; কিন্তু তুমি মাকে দেখিয়াও চিনিতে পারিলে না।' শাঁখারী উদ্ধারণের মুখে উহা শ্রবণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল, 'মা গো! তুমি কি পূর্বকথা ভুলে গেলে মা! তুমি যে বলেছিলে মা, এখানে এলেই আমার দেখা পাবে, সে কথা কি মনে নাই মা! মা গো, আমি যে দত্তমহাশয়ের কাছে মিথ্যাবাদী হলেম। মা গো মিথ্যাপবাদ মোচনের জন্য একবার শাঁখা দু-গাছা দেখা মা!' ত্রিলোকতারিণী মা, শাঁখারীর মিথ্যাপবাদ মোচনের জন্য সেই পুণ্যতোয়া সরস্বতীর মধ্য হইতে শঙ্খ-পরিহিত হস্ত দুইখানি তুলিয়া দেখান।

—:০:—

বিশুদ্ধানন্দ স্বামী

ইংরাজী ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণাবর্তের কল্যাণীগ্রামে স্বামী বিশুদ্ধানন্দ জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম সঙ্গমলাল ও মাতার নাম যমুনা দেবী। সঙ্গমলাল জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। আর্যাবর্তের বৌড়ি গ্রামে ইঁহার পৈতৃক বাসভবন ছিল। অল্প বয়সে ইঁহার পিতৃবিয়োগ হওয়ায়, ইনি ঐ স্থান পরিত্যাগ করিয়া, দক্ষিণাবর্তের কল্যাণীগ্রামে, সবসুখরাম নামক জনৈক ব্রাহ্মণের আশ্রয়ে আসিয়া বাস করেন। সবসুখরাম দক্ষিণাবর্তে নিজামের অধীন মোহন শাহ নামক নবাবের সেনানায়ক ও মুন-সুবাদারের নিকট কার্য করিতেন। যমুনা দেবী নামে ইঁহার এক ভগিনী ছিলেন। ঐ সময়ে যমুনা দেবী অবিবাহিতাবস্থায় থাকায়, সবসুখরাম, সঙ্গমলালের চরিত্র, ব্যবহার ও করণীয় ঘর, এই কয়েকটি বিশেষরূপে অবগত হইয়া, আপন ভগিনী যমুনা দেবীকে উঁহার করে সমর্পণ করিতে মনস্থ করেন; কিন্তু সহসা অপরিচিতের সহিত কুলকর্ম করা উচিত নহে, সেইজন্য তিনি নানাবিধ গুপ্ত অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। বহু অনুসন্ধানের পর যখন তিনি বুঝিলেন যে, সঙ্গমলালই যমুনার উপযুক্ত পাত্র, তখন তিনি আপন ভগিনীকে সঙ্গমলালের হস্তে সমর্পণ করিয়া শুভপরিণয়কার্য সম্পন্ন করেন। এই পরিণয়ের ফল স্বামী বিশুদ্ধানন্দ।

যমুনাদেবীর বিবাহের পর, দুই বৎসরের মধ্যে ক্রমান্বয়ে দুইটি সন্তান জন্মিয়াছিল। কিন্তু শিশু দুইটি, জাত হওয়ার অল্প দিবসের মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। স্বামীজী যমুনা দেবীর তৃতীয় গর্ভজাত সন্তান। ইঁহার বয়ঃক্রম এক বৎসর হইলে, পিতা হোম, যাগ ও পূজার্চনাদি করিয়া পুত্রের নাম বংশীধর রাখেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ঐ শিশুর মৃগীরোগ জন্মে। যমুনা দেবী পুত্রকে মৃগীরোগাক্রান্ত দেখিয়া তিনি উহার জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়া সদাই বিষাদিত হইয়া থাকিতেন।

এইরূপে কিছুদিন গত হইলে পর, কল্যাণীতে এক ক্ষত্রিয়া রমণী সহমৃতা হন। ঐ দেশে এরূপ প্রবাদ আছে যে, সতী স্ত্রীর অন্তিম আশীর্বাদ প্রায় ব্যর্থ হয় না। সেইজন্য সহস্র-নরনারী আপন আপন পুত্রকন্যাদিগকে কক্ষে লইয়া সতীসাধ্বী রমণীর আশীর্বাদ পাইবার প্রত্যাশায় সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হন। এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছিল। যমুনা দেবী অন্যান্য পুরস্ত্রীগণের সহিত বংশীধরকে তথায় লইয়া গিয়াছিলেন। সতী বংশীধরকে দেখিয়া যমুনাকে বলিয়াছিলেন, ‘ভগিনী! তুমি অতি ভাগ্যবতী; তোমার পুত্র একজন যোগী পুরুষ হইবে, অকালমৃত্যু ইঁহাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না।’ সতীর আশীর্বাদের পর বংশীধরের মৃগীরোগ কিছুদিনের জন্য অন্তর্হিত হইয়াছিল; কিন্তু পুনরায় উহা প্রকাশ পায়।

বংশীধরের বয়স যখন চারি বৎসর, সেই সময়ে ঐ বালক তাঁহার মাতাকে বলিয়াছিলেন, ‘মা! আমার বই কই?’ বালক বারংবার ঐরূপ বলিতে থাকায়, যমুনা দেবী একখানি পুস্তক লইয়া বংশীকে দেন; কিন্তু বালক ‘এ বই আমার নয়,’ বলিয়া উহা ফেলিয়া দেন ও ক্রন্দন করিতে থাকেন। সবসুখরাম বংশীকে অন্যান্য প্রলোভন

দেখাইয়া সান্ত্বনা করেন এবং সস্নেহে জিজ্ঞাসা করেন, 'বংশী! তুমি বই কি করবে?' মাতুলের কথায় বংশী বলিয়াছিলেন, 'বই পাইলেই আমার রোগ যাইবে। সে বই পর্ণকুটীরের মধ্যে আছে।' বালকের মুখে এই অদ্ভুত কথা শুনিয়া তিনি সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করেন, 'কাহার পর্ণকুটীরে?' বংশী আর কোন উত্তর দিতে পারিলেন না।

কল্যাণীর ১০।১১ ক্রোশ উত্তরে ঔরাৎ নামক গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে কীর্ণা নামক নদীর সঙ্গমস্থানে স্নান করিবার জন্য বহুসংখ্যক যাত্রী সমাগত হইত। ঐ নদী-সঙ্গমের সন্নিকটে একটি ক্ষুদ্র পর্ণকুটীরে একজন যোগী বাস করিতেন। সবসুখরাম ও তাঁহার পরিবারবর্গ স্নানার্থী হইয়া তথায় আসিলে, বালক ঐ পর্ণকুটীর দেখাইয়া দেন ও বলেন, 'আমার বই ঐ কুটীরে আছে।' বালকের কথায় সকলে আশ্চর্যান্বিত হইয়া তৎক্ষণাৎ কুটীরের নিকট আসেন ও যোগীকে বলেন, 'প্রভো! এই বালক কি বলে, শুনুন।' বালক ক্ষণকাল যোগীর মুখের দিকে অনিমেষ নয়নে চাহিয়া বলিল, 'আমার পুস্তক এই কুটীর মধ্যে আছে।' যোগী কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তখনই সবসুখরামকে পুস্তক অনুসন্ধান করিতে বলেন। সবসুখরাম বহু অনুসন্ধান করিয়া অবশেষে চালের বাতা হইতে একখানি অতি জীর্ণ হস্তলিখিত পুঁথি বাহির করিয়া লইয়া আসেন। বংশী ঐ পুঁথি পাইয়া অতিশয় আহ্লাদিত হন।

ঐ কুটীরমধ্যস্থ যোগী, এই ব্যাপারে বিস্মিত হইয়া বলিয়াছিলেন, 'মহাশয়! ইনিই আমার গুরু। আমার স্বর্গীয় গুরুদেব পীড়ায় শয্যাগত হইলে তিনি ঐ ব্যাধির যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইবার জন্য আমাকে এই পুস্তকখানি অনুসন্ধান করিয়া দিতে বলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, তিনি এই পুস্তক পাইলেই রোগ হইতে আরোগ্য লাভ করিবেন; কিন্তু আমি বহু অনুসন্ধান করিয়াও, পুস্তক না পাওয়ায় তিনি অন্তিম দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত দেহরক্ষা করেন। এক্ষণে ইঁহার কার্যকলাপে ও জন্মান্তরীয় স্মৃতি দ্বারা এই বালককে আমার গুরু বলিয়া বোধ হইতেছে। কালে ইনি যে একজন যোগী হইবেন, তাহার সন্দেহ নাই।' আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ঐ পুস্তক-প্রাপ্তির পর হইতেই বালকের আর কোনরূপ রোগ দেখা যায় নাই।

স্বামীজী পাঁচবৎসর বয়সে বাটীর নিকটে ভট্টজী নামে গুরুগৃহে পাঠাভ্যাস করেন। ফার্সী শিক্ষার জন্য ইঁহার অন্য একজন মৌলবী শিক্ষক ছিলেন। বিদ্যাভ্যাসকালীন স্বামীজী যাহা শুনিতেন, তাহা আর কখনও ভুলিতেন না। ইঁহার অসাধারণ স্মৃতিশক্তি দেখিয়া ভট্টজী স্বামীজীকে শ্রুতিধর বলিয়া ডাকিতেন। স্বামীজীর বয়স যখন সাত বৎসর, সেই সময়ে ইঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। পিতৃবিয়োগের অল্পদিন পরেই মাতাও ইহলীলা সংবরণ করেন। ১৩ বৎসর বয়সে ইনি ফার্সী ও মারহাট্টি ভাষা উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়া শাস্ত্রালোচনায় প্রবৃত্ত হন। ১৬ বৎসর বয়সে ইনি অশ্বারোহণ ও অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করেন। ঐ সময়ে নবাব কোন ব্যবসায়ীর নিকট হইতে একটি বহুমূল্য ঘোড়া উপঢৌকন প্রাপ্ত হন। ঘোড়াটি অত্যন্ত দুর্দান্ত ছিল। অশ্বরক্ষক স্বয়ং উহাকে শাসন করিতে না পারায় স্বামীজীর সাহায্য প্রার্থনা করেন। স্বামীজী অশ্বের প্রকৃতি সংযম করিয়া দিলেন বটে, কিন্তু অতিরিক্ত প্রহার ও অতিরিক্ত পরিশ্রমের জন্য অশ্বটি পঞ্চত্ব-প্রাপ্ত হয়। নবাব অশ্বের মৃত্যুর কথা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হন এবং স্বামীজীই উহার মৃত্যুর কারণ স্থির করিয়া উঁহাকে কারাগৃহে নিক্ষেপ করেন। কিছুদিন কারাগৃহে থাকিবার পর স্বামীজীর হৃদয়ে আশ্চর্য পরিবর্তন ঘটে। তিনি সংসারের অসারতা

মর্মে মর্মে অনুভব করায়, বৈরাগ্য আসিয়া তাঁহার হৃদয় অধিকার করে। কারামুক্ত হইয়া ইঁনি কিছুদিন মাতুলালয়ে নিয়মিত পানভোজন ও প্রফুল্ল ভাব ধারণ করিয়াছিলেন। একদিন ইঁনি তাঁহার মাতুল মহাশয়ের নামে একখানি পত্র লিখিয়া তাঁহাতে সংসারের নশ্বরতা বুঝাইয়া দিযা ও তাঁহার অনুসন্ধানে বিরত হইতে অনুরোধ করিয়া গৃহ পরিত্যাগ করেন। স্বামীজী কল্যাণী পরিত্যাগ করিযা নাসিক-ক্ষেত্রে আসেন। তথায় একজন নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণের নিকট ব্রহ্মচর্য গ্রহণ করিয়া বেদাধ্যয়নে নিযুক্ত হন। এই সময়ে স্বামীজীর বয়স ১৭ বৎসরমাত্র হইয়াছিল। ইঁনি তথায় কয়েক বৎসরকাল অবস্থিতি করিয়া নাসিকা পরিত্যাগ করেন ও ক্রমাগত হাঁটিযা ওঁকারনাথে আসিয়া উপস্থিত হন। এই স্থান হইতে তিনি উজ্জয়িনী নগরে মহাকালেশ্বরের মন্দিরে আসিয়া শিবপঞ্চাক্ষর মন্ত্র জপ করেন। কথিত আছে, এখানে শিবপঞ্চাক্ষর মন্ত্র জপ করিলে মনস্কামনা সিদ্ধ হয়। ঐ মন্ত্রসাধন সময়ে ইঁহাকে তিন-চারি দিন অনাহারে থাকিতে হইয়াছিল। তার পর একজন ভুট্টাওয়ালী অযাচিতভাবে ইঁহাকে প্রত্যহ দুই মুঠা করিয়া ছোলা দিয়া যাইত। ঐ যৎসামান্য ছোলা খাইয়া ইঁনি দিন কাটাইতেন। মহাকালেশ্বরের মন্দিরে ব্রত উদ্‌যাপন করিয়া স্বামীজী গোয়ালিয়রে আসেন। ঐ সময়ে সিন্ধিয়া রাজ্যে বিষম বিপ্লব উপস্থিত হওয়ায়, সন্দেহে পড়িয়া স্বামীজী সৈন্যদিগের হস্তে ধৃত ও কারারুদ্ধ হন। পরে তিনি বিচারফলে নিষ্কৃতি লাভ করিযা বিঠুর যাত্রা করেন। বিঠুরে কয়েক বৎসরকাল অতিবাহিত করিয়া স্বামীজী হরিদ্বারে আসেন ও তথা হইতে কন্‌খলে গমন করেন। কন্‌খলে কিছুদিন অতিবাহিত করিয়া স্বামীজী বদরিকাশ্রমে আসেন। ঐ স্থানের বিষ্ণুপ্রয়াগের এক নিভৃত গুহায় একজন মহাত্মা যোগী অবস্থান করিতেন। স্বামীজী কয়েক বৎসর কাল ঐ যোগীর নিকট থাকিয়া ও তাঁহার পরিচর্যা করিয়া যাবতীয় যোগরহস্য শিক্ষা করেন। এই সময়ে ইঁহার যোগসাধন-স্পৃহা অত্যন্ত বলবতী হয়। ঐ ইচ্ছার বশবর্তী হইয়া ইঁনি হৃষীকেশে আগমন করেন। তথায় গোবিন্দ স্বামী নামক একজন যোগী ছিলেন। স্বামীজী তাঁহার নিকটে থাকিযা, ১৫ বৎসরকাল কঠোর পরিশ্রমের সহিত যোগাভ্যাস করেন। পরে ইঁনি কাশীধামে আসেন। ঐ সময়ে গৌড়স্বামী নামক একজন অসাধারণ শাস্ত্রজ্ঞানী মহাপুরুষ কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাটে থাকিতেন। স্বামীজী ইঁহার নিকটে সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষিত হইয়া বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতী নামগ্রহণ করেন।

গৌড়স্বামী স্বামীজীকে দীক্ষিত করিবার পূর্বে ইঁহার আরও তিনজন শিষ্য ছিলেন। ঐ সকল শিষ্যের মধ্যে স্বামী বিশ্বরূপজীই সর্বপ্রধান ও প্রিয়তম শিষ্য। এক দিবস কোন একটি বিষয় লইয়া স্বামী বিশ্বরূপজীর সহিত বিশুদ্ধানন্দের তর্ক উপস্থিত হয়। যদিও ঐ তর্কে স্বামী বিশ্বরূপজী পরাস্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু বিশুদ্ধানন্দ স্বামী কয়েক মুহূর্তের জন্য তাঁহার শান্তভাব হারাইয়া উগ্রমূর্তি ধারণ করিয়াছিলেন। স্বামীজীর হঠাৎ এইরূপ পরিবর্তন দেখিয়া গৌড়স্বামী আন্তরিক কিছু দুঃখিত হইয়াছিলেন। গুরুজীর দুঃখভাব বুঝিতে পারিয়া স্বামীজী অতিশয় লজ্জিত হন এবং সেই অবধি ইঁনি স্বামী বিশ্বরূপজীকে স্বীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও গুরুর ন্যায় সম্মান করিতেন।

১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে গৌড়স্বামী দেহরক্ষা করেন। ঐ সময়ে গুরুদেব শিষ্যদিগকে আপনার কাছে ডাকাইয়া বিবিধ উপদেশ দেন এবং স্বামী বিশুদ্ধানন্দকে স্বীয় আসনের প্রতিনিধি নির্দেশ করেন ; গুরুদেবের দেহান্তে স্বামী বিশুদ্ধানন্দ গুরুদেবের প্রতিষ্ঠিত

গদিতে স্বামী বিশ্বরূপজীকে উপবেশন করিতে বলেন ; কিন্তু বিশ্বরূপজী ইঁহাকে এই বলিয়া বুঝান যে, 'বিশুদ্ধানন্দ ! তুমি গুরুদেবের অন্তিম কথা স্মরণ কর। যদিও আমি তোমাপেক্ষা বয়সে জ্যেষ্ঠ, তথাপি তুমি জ্ঞানবৃদ্ধ। আর যদি তুমি গুরুদেবের অবর্তমানে আমাকেই গুরু বলিয়া স্বীকার কর, তাহা হইলে আমি তোমায় বলিতেছি, তুমি এই গদি গ্রহণ কর।' স্বামীজী অগত্যা গদি গ্রহণ করিয়াছিলেন ; কিন্তু সকল সময়েই ইনি বিশ্বরূপজীকে গুরুর ন্যায় শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন এবং তাঁহার আদেশ পালন করিতেন।

স্বামীজী ঐ গদির গৌরব সম্পূর্ণরূপে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। ইঁহার ন্যায় তৎকালে আর কেহই দর্শন, বেদান্তাদি সমুদয় শাস্ত্রের বিহিত মীমাংসা করিতে পারিতেন কিনা সন্দেহ। ফ্রান্স, জার্মাণী প্রভৃতি সুদূর প্রদেশের দার্শনিকগণ উৎসুক হইয়া ইঁহার মীমাংসা শ্রবণ করিবার জন্য ইঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন।

ইংরাজী ১৮৯৮ সালে ৯৩ বৎসর বয়সে স্বামীজী যোগাসনে বসিয়া দেহত্যাগ করেন।

—:০:—

বৌদ্ধসাধক দীপঙ্কর

বিক্রমপুরের বৌদ্ধ নরপতি গোবিন্দপালের রাজত্বকালে ৯৮০ খ্রীষ্টাব্দে বিক্রমপুরস্থ বজ্রযোগিনী গ্রামে ব্রাহ্মণকুলে ধর্মবীর দীপঙ্কর জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার নাম আদিনাথ ছিল। দীপঙ্করের বাল্যজীবনে তাঁহার ভবিষ্য-গৌরবের নিদর্শন দেখা গিয়াছিল। তিনি শৈশবে গুরুগৃহে পাঠাভ্যাস সমাপ্ত করিয়া কিছুদিনের জন্য সংসারধর্মে মনোনিবেশ করেন। পরে তাঁহার উর্বর হৃদয়ক্ষেত্রে ধর্মের বীজ অংকুরিত হওয়ায় তিনি সংসারধর্ম পরিত্যাগ করিয়া ধর্মচর্চায় প্রবৃত্ত হন। তাঁহার চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের গুণে তিনি অতি অল্পকালের মধ্যেই হিন্দু ও বৌদ্ধশাস্ত্রে বিশেষরূপে পারদর্শিতা লাভ করেন। দীপঙ্কর ধর্মজ্ঞানে সুপণ্ডিত হইয়া যোগসাধনার জন্য মহাত্মা ধর্মরক্ষিতের নিকটে বোধিসত্ত্বের কঠোব ব্রতে দীক্ষিত হন।

ঐ সময়ে সুবর্ণদ্বীপ বা ব্রহ্মদেশ প্রাচ্যজগতে বৌদ্ধধর্মের শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছিল, সুতরাং তিনি তথায় যাইতে মনস্থ করিলেন। তিনি কতকগুলি ব্যবসায়ীব সহিত পোতারোহণ করিয়া ব্রহ্মদেশে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে বহুকষ্ট ও বহুবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া, এক বৎসর একমাস পরে ব্রহ্মদেশে উপস্থিত হন। সে সময়ে চন্দ্রকীর্তি নামক এক ব্যক্তি তথাকাব প্রধানতম যাজক ছিলেন। দীপঙ্কর ঐ যাজকের নিকট যোগশিক্ষা করিয়া দ্বাদশ বৎসবকাল তথায় অবস্থিত করেন ও সিদ্ধ হন।

দীপঙ্কর সিদ্ধিলাভ করিয়া পূর্বের ন্যায় বণিকদিগেব সহিত স্বদেশে প্রত্যাগত হন। দীপঙ্কর স্বদেশে ফিরিয়া আসিলে মগধেব বৌদ্ধেরা তাঁহাকে তথাকাব ধর্মপালরূপে মনোনীত করেন। ক্রমে ক্রমে দীপঙ্করের যশোবিভা ভারতের চারিদিকে বিকীর্ণ হইতে লাগিল। রাজা ন্যায়পাল তাঁহার পাণ্ডিত্যে ও ধর্মসাধনে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে আপন রাজধানী বিক্রমশীলার প্রধান যাজকপদে নিযুক্ত কবিতে চাহিলেন; কিন্তু দীপঙ্কর তাঁহার কথায় সম্মত হইলেন না।

ঐ সময়ে তিব্বতে হ্লালামাও নামে একজন নরপতি রাজত্ব কবিতেন। থোলিং নগবে তাঁহার প্রধান বাজধানী ছিল। তিনি বৌদ্ধধর্মের উন্নতিসাধনের জন্য স্বরাজ্য হইতে কয়েকজন বৌদ্ধশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিকে বৌদ্ধধর্ম বিশেষরূপে শিক্ষার জন্য মগধে পাঠাইয়া দেন। তাঁহারা ভারতেব নানাস্থানে বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা করিয়া অবশেষে মগধে আসেন। তথায় তাঁহারা দীপঙ্করের যশোগৌবব শুনিয়া তাঁহাকে আপনাদের দেশে লইয়া যাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন। এরূপ জনশ্রুতি আছে যে, হ্লালামাও দীপঙ্করকে আপনার রাজধানীতে লইয়া যাইবাব জন্য প্রভুত স্বর্ণমুদ্রা ও একশত পরিচারককে বিক্রমশীলায় পাঠাইয়া দেন, কিন্তু দীপঙ্কর তথায় যাইতে অসম্মত হওয়ায পরিচারকগণ ভগ্নমনোরথ হইযা দেশে ফিরিয়া যান।

ইহার কিয়দ্দিন পরে হ্লালামাও মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রেরা বহু অনুনয় ও বিনয় করিয়া দীপঙ্করকে তিব্বতে লইয়া যান। তথায় তিনি ১৫ বৎসরকাল বৌদ্ধধর্ম প্রচার করিয়া ১০৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ৭৩ বৎসর বয়সে লামানগরীর নিকটবর্তী জৈয়ঙ্গনগরে দেহত্যাগ করেন।

শতাব্দীর পর শতাব্দী অনন্ত কালসাগরে মিশিয়া গিযাছে, কিন্তু আজিও চীন ও তিব্বতদেশীয় লামাগণ তাঁহার উদ্দেশে প্রণাম করিয়া থাকেন।

—:o:—

বিবেকানন্দ স্বামী

মহানগরী কলিকাতার সিমুলিয়া নামক স্থানে ১২৬৯ বঙ্গাব্দের ২৯শে পৌষ, সোমবার প্রাতে ৬টা ৩৩ মিনিট ৩৩ সেকেণ্ডের সময়, সূর্যোদয়ের ৬ মিনিট পূর্বে স্বামী বিবেকানন্দ জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম বিশ্বনাথ দত্ত। তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের অ্যাটর্নী ছিলেন। বিশ্বনাথের তিন পুত্র—জ্যেষ্ঠ নরেন্দ্র, মধ্যম মহেন্দ্র এবং কনিষ্ঠ ভূপেন্দ্র।* বিশ্বনাথ দত্ত মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র নরেন্দ্রই স্বামী বিবেকানন্দ।

নরেন্দ্র শিশুকাল হইতে যৌবনের প্রারম্ভ পর্যন্ত অতিশয় আমোদপ্রিয় ছিলেন। তিনি তাস খেলিতে, রসিকতা করিতে, তামাক ফুঁকিতে ও গান-বাজনা করিতে অত্যন্ত নিপুণ ছিলেন। কিন্তু তিনি ঐ আমোদের মধ্যে কখনও কোন অপ্রিয় ও কদর্য অভিনয় করিতেন না। বাল্যকাল হইতে তাঁহার স্মরণশক্তি, বুদ্ধি ও সরল হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যাইত। কুটিলতা, কপটতা, স্বার্থপরতা ও হিংসা কাহাকে বলে, তাহা তিনি জানিতেন না। বন্ধুবান্ধব, পাড়া-প্রতিবাসী বা অপরিচিত ব্যক্তিদিগের যে কোন বিষয়েরই অভাব হউক না কেন, নরেন্দ্র তাহা জানিতে পারিলে তৎক্ষণাৎ পূরণ করিবার চেষ্টা করিতেন।

যদিও নরেন্দ্র আমোদ-প্রমোদ ও পরোপকারে সময় অতিবাহিত করিতেন, কিন্তু নিজের কার্য করিতে কখনও ভুলিতেন না। তিনি ২০ বৎসর বয়সে জেনারেল এসেমব্লী নামক বিদ্যালয় হইতে এফ-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বি-এ পাঠ করিতে থাকেন। ঐ সময়ে তাঁহার ধর্ম-পিপাসা অত্যন্ত প্রবল হয়। ধর্ম কাহাকে বলে এবং কোন্ ধর্ম সত্য, ইহা জানিবার জন্য তাঁহার চিত্ত একবারে অস্থির হইয়া পড়ে। হেষ্টিসাহেব একজন খ্রীষ্টান-মিশনরী। তিনি জেনারেল এসেমব্লী কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। নরেন্দ্র অধিকাংশ সময়ই তাঁহার সহিত ধর্মসম্বন্ধীয় কথোপকথন করিতেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার পিপাসা মিটিত না। তিনি চতুর্দিকে ধর্মের নামে প্রতারণা দেখিয়া একজন ঘোর সংশয়বাদী হইয়া পড়েন। মনের সন্দেহ দূর করিবার জন্য সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের দলভুক্ত হন। হিন্দুধর্ম, ব্রাহ্মধর্ম, খ্রীষ্টানধর্ম, মুসলমানধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম পর্যালোচনা করিয়া কোন্ ধর্ম যথার্থ সত্য, তাহা বুঝিতে না পারিয়া, যে সময়ে তিনি ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন, সেই সময়ে (অর্থাৎ ১২৯০ বঙ্গাব্দে) তিনি রামকৃষ্ণদেবের সঙ্গলাভ করেন। নরেন্দ্রের কোন বন্ধু রামকৃষ্ণের শিষ্য ছিলেন। তিনিই নরেন্দ্রকে দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ীতে পরমহংসদেবের নিকট লইয়া যান এবং পরিচয় দিয়া বলেন, 'এই ছোকরা নাস্তিক হইবার উপক্রম করিতেছে।'

পরমহংসদেব শ্যামাবিষয়ক ও দেহতত্ত্বসম্বন্ধীয় গীত শ্রবণ করিতে ভালবাসিতেন। তাঁহাদের কিয়ৎক্ষণ কথোপকথনের পর নরেন্দ্রের বন্ধু গুরুর অনুমতি লইয়া নরেন্দ্রকে একখানি গান করিতে বলেন। নরেন্দ্রের কণ্ঠস্বর সুমার্জিত ও সুমধুর ছিল। তিনি

---

* ভূপেন্দ্র সুবিখ্যাত 'যুগান্তর' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।

বন্ধুর অনুরোধে সাক্ষাতের প্রথম দিবসে পরমহংসদেবের সমক্ষে যে দুইখানি গান করিয়াছিলেন, তাহা এই—

১ম গান

মন চল নিজ নিকেতনে।
সংসার-বিদেশে বিদেশীর বেশে মিছে ভ্রম অকারণে॥
বিষয় পঞ্চক আর ভূতগণ, সব তোর পর কেউ নয় আপন,
পর-প্রেমে কেন হইয়ে মগন, ভুলিছ আপন জনে॥
সত্যপথে মন কর আরোহণ, প্রেমের আলো জ্বালি চল অনুক্ষণ
সঙ্গেতে সম্বল রাখ পুণ্য-ধন, গোপনে অতি যতনে ;—
লোভ মোহ আদি পথে দস্যুগণ, পথিকের করে সর্বস্ব লুণ্ঠন,
পরম যতনে রাখ রে প্রহরী শমদম দুই জনে॥
সাধুসঙ্গ নামে আছে পান্থধাম, শ্রান্ত হ'লে তথা করিও বিশ্রাম,
পথভ্রান্ত হ'লে সুধাইও পথ সে পান্থনিবাসী জনে ;
যদি দেখ পথে ভয়েরি আকার, প্রাণপণে দিও দোহাই রাজার,
সে পথে রাজার প্রবল প্রতাপ, শমন ডরে যাঁর শাসনে॥

২য় গান

যাবে কি হে দিন আমার বিফলে চলিয়ে।
আছি নাথ দিবানিশি আশাপথ নিরখিয়ে॥
তুমি ত্রিভুবন নাথ, আমি ভিখারী অনাথ,
কেমনে বলিব তোমায় এস হে মন-হৃদয়ে॥
হৃদয়-কুটীর দ্বার, খুলে রাখি অনিবার,
কৃপা ক'রে একবার এসে কি জুড়াবে হিয়ে॥

নরেন্দ্রের সুকণ্ঠ নিঃসৃত গীত শ্রবণে পরমহংসদেব মোহিত হইলেন এবং নরেন্দ্রকে পুনরায় আসিতে বলেন। পরমহংসদেবের কথামত নরেন্দ্র প্রায়ই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন এবং ধর্মসম্বন্ধীয় যে সকল প্রশ্ন তাঁহার মনোমধ্যে উদয় হইত, তাহা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেন। পরমহংসদেব নরেন্দ্রের প্রশ্নের উত্তরে যাহা যাহা বলিতেন, নরেন্দ্র কূট তর্কের দ্বারা সেই সকল যুক্তি ছিন্ন করিবার চেষ্টা করিতেন। নরেন্দ্র প্রথম প্রথম তাঁহার অনেক কথাই মানিতেন না। পরমহংসদেব নরেন্দ্রের এইরূপ আচরণে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, 'নারায়ণ! (পরমহংসদেব নরেন্দ্রকে নারায়ণ বলিতেন) তুই যদি আমার কথা না মানিস্, তবে এখানে আসিস্ কেন? ইহার উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, 'আমি আপনাকে দেখতে আসি, আপনার কথা শুনতে আসি না।'

নরেন্দ্র পরমহংসদেবের নিকট যাতায়াত করিতে থাকায়, তাঁহার মনে যে ঘোরতর সংশয় জন্মিয়াছিল, তাহা ক্রমে অন্তর্হিত হইয়া জ্ঞানের উদয় হইতে লাগিল। ঐ সময়ে তিনি বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আইন পড়িতে আরম্ভ করেন। ১২৯১ বঙ্গাব্দে নরেন্দ্রের পিতৃবিয়োগ হয়। পিতৃবিয়োগের কিয়দ্দিবস পরে হঠাৎ তাঁহার মনে বৈলক্ষণ্য

ঘটে। তিনি পরমহংসদেবের নিকট গমন করিয়া বলেন, 'আমি যোগশিক্ষা করব, আমি সমাধিস্থ হয়ে থাকব, আপনি আমায় শিক্ষা দিন।' নরেন্দ্রের কথায় শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, 'তার জন্যে আর চিন্তা কি : সাংখ্য, পাতঞ্জল, বেদ, উপনিষদ, পুরাণ প্রভৃতি ধর্ম-গ্রন্থসকল পাঠ কর্, তুই সব শিখতে পারবি। তুই যে রকম চালাক ছেলে দেখছি, তোর দ্বারা ধর্মসমাজের অনেক উপকার হবে।' নরেন্দ্র রামকৃষ্ণদেবের উপদেশানুসারে উক্ত ধর্মগ্রন্থসকল পাঠ করিতে লাগিলেন এবং নির্জনে বসিয়া যোগশিক্ষা করিতে লাগিলেন।

নরেন্দ্রের মাতা নরেন্দ্রের চিত্ত-চাঞ্চল্য এবং উদাস ভাব দেখিয়া তাঁহাকে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ করিতে চাহিলেন, কিন্তু নরেন্দ্র কিছুতেই সম্মত হইলেন না। এরূপ শুনিতে পাওয়া যায় যে, পরমহংসদেব নরেন্দ্রের বিবাহের কথা শ্রবণ করিয়া, লোলজিহ্বা করালবদনা কালীর চরণ ধরিয়া কাঁদিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন, 'মা, ও সব ঘুরিয়ে দে মা! নরেন্দ্র যেন ডোবে না।'

পরমহংসদেবের কৃপায় নরেন্দ্র মহাজ্ঞানী এবং সন্ন্যাসী হন। যে নরেন জগতে কোন্ ধর্ম যথার্থ সত্য, তাহা জানিবার জন্য খ্রীষ্টান মিশনারীদিগের সহিত মিশিয়াছিলেন, মুসলমান মৌলবীদিগের সহিত মিশিয়াছিলেন, ব্রাহ্ম আচার্যদিগের সহিত মিশিয়াছিলেন এবং বৌদ্ধ লামাদের সহিতও মিশিয়াছিলেন, কিন্তু কোন ধর্ম-যাজকেরাই তাঁহাকে ধর্মের জ্যোতিঃ দেখাইতে পারেন নাই, সেই নরেন্দ্র হিন্দুধর্মের জ্যোতিঃ দর্শন করিয়া, সংসারের সমুদয় সুখাভিলাষ বিসর্জন দিয়া যৌবনের সুখ-সম্ভোগ-লালসা ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হন। ১২৯৩ বঙ্গাব্দে পরমহংসদেব দেহত্যাগ করিলে নরেন্দ্র গুরুর উপদেশানুসারে বিবেকানন্দ স্বামী নাম গ্রহণ করেন। এক্ষণে তিনি সেই নামেই বিখ্যাত।

পরমহংসদেবের দেহত্যাগের পর বিবেকানন্দ স্বামী হিমালয় প্রদেশস্থ মায়াবতীতে গিয়া যোগসাধনা করেন। প্রায় দুই বৎসরকাল তথায় যোগাভ্যাস করিয়া সাধুসঙ্গমেচ্ছায় তিব্বত ও হিমালয় প্রদেশের নানা স্থান ভ্রমণ করিতে বহির্গত হন। ১২৯৮ বঙ্গাব্দে রাজপুতনার আবু নামক পাহাড়ে তাঁহার অবস্থান কালে, স্বামীজীর কোন ভক্ত, খেতড়ির মহারাজের সচিব মুন্সি জগমোহন লালজী নামক এক ব্যক্তির সহিত তাঁহাকে দর্শন করিতে আসেন। জগমোহন স্বামীজীর বিদ্যাবুদ্ধি এবং পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়া আপনার প্রভুকে সকল বিষয় অবগত করান। খেতড়ির মহারাজ, জগমোহনের নিকট স্বামীজীর কথা শ্রবণ করিয়া, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে মনস্থ করেন। 'খেতড়ির মহারাজ আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করেন', লালজী স্বামীজীর নিকট এই কথা প্রস্তাব করিলে, স্বামীজী মহারাজের সম্মান রক্ষার জন্য স্বয়ং যাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। মহারাজও তাঁহাকে যথাবিহিত অভিবাদন করেন।

স্বামীজী কিরূপ জ্ঞানী, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য খেতড়ির মহারাজ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'Swamiji what is life—স্বামীজী জীবনটা কি?' স্বামীজী ইহার উত্তরে বলেন, 'Life is tendency of unfolding and development of a being under circumstances tending to press it down অর্থাৎ কোন পুরুষ যেন নিজ স্বরূপ প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতেছেন, আর কতকগুলি শক্তি যেন উহাকে দাবাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছে। এই প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিসমূহকে পরাস্ত করিয়া নিজ

শক্তি প্রকাশের অবিরত চেষ্টার নামই জীবন।'

মহারাজ স্বামীজীকে একটি একটি করিয়া যে কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, স্বামীজী সরলভাবে তাহার সবগুলিরই উত্তর প্রদান করিলেন। স্বামীজীর প্রশ্নোত্তরে মহারাজ তাঁহার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব এবং বিজ্ঞতার পরিচয় পাইয়া অত্যন্ত প্রীত হন এবং তাঁহাকে প্রায় দুইমাসকাল খেতড়িতে রাখিয়া তাঁহাব সেবা-শুশ্রূষা করেন।

খেতড়ির মহারাজ নিঃসন্তান ছিলেন, সেইজন্য তিনি প্রায়ই ম্রিয়মাণ থাকিতেন। স্বামীজীর উপর তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ও বিশ্বাস হওয়ায় তিনি এইরূপ চিন্তা করেন যে, 'স্বামীজী আশীর্বাদ করিলে নিশ্চয়ই আমার সন্তান হইবে।' অতএব আমার মনোবেদনা তাঁহাকে একবার জানাইতে হইবে।' যে সময়ে স্বামীজী মহারাজের নিকট হইতে বিদায় লইয়া খেতড়ি পরিত্যাগ করেন, সেই সময়ে মহারাজ তাঁহাকে বলেন, 'স্বামীজী! আপনি আশীর্বাদ করুন, যেন আমার একটি পুত্রসন্তান জন্মে।' স্বামীজীও সেইমত আশীর্বাদ করেন। এই ঘটনার প্রায় দুইবৎসর পরে ১৩০০ বঙ্গাব্দে মহারাজের একটি পুত্র হয়।

স্বামীজীর আশীর্বাদে পুত্র জন্মিয়াছে, অতএব স্বামীজী স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া পুত্রের জন্মোৎসব-ক্রিয়া সম্পন্ন করেন, ইহাই মহারাজের একান্ত ইচ্ছা। তাঁহার ইচ্ছা পূরণ করিবার জন্য জগমোহন লাল স্বামীজীর উদ্দেশ্যে গমন করিলেন। জগমোহন জানিতেন, স্বামীজী মান্দ্রাজে অবস্থান করিতেছেন, কিন্তু মান্দ্রাজের কোন্ স্থানে আছেন, তাহা জানিতেন না। যাহা হউক, তিনি মান্দ্রাজে উপস্থিত হইয়া বহু অনুসন্ধানের পর জানিতে পারিলেন যে, স্বামীজী শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ভট্টাচার্য (Assistant Accoutant General) মহাশয়ের বাটীতে আছেন। জগমোহন সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া স্বামীজীর নিকট সাক্ষাৎ করেন এবং খেতড়ির মহারাজের বাসনা অবগত করান। ঐ সময়ে (১৮৯৩ বঙ্গাব্দে) আমেরিকার অন্তর্গত চিকাগো সহরের মহামেলায় একটি ধর্মসভা গঠিত হইতেছিল। ঐ সভায় কেবল হিন্দুধর্মসম্প্রদায় ব্যতীত পৃথিবীর যাবতীয় ধর্মসম্প্রদায় নিমন্ত্রিত হন। ধর্মসভার উদ্দেশ্য বোধ হয় সকল ধর্মের সহিত তুলনা করিয়া খ্রীষ্টধর্মের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করা। ধর্মসভার সভাপতি ছিলেন রেভারেণ্ড ডাক্তার ব্যারো সাহেব। বোধ হয়, ব্যারো সাহেব মনে করিয়াছিলেন, হিন্দুগণ পৌত্তলিক, অসভ্য, মূর্খ এবং নানা প্রকার কুসংস্কারে পরিপূর্ণ, সুতরাং উহাদিগকে আর নিমন্ত্রণ করিব কি? কতিপয় ভারত-সন্তান, হিন্দুধর্মের এ অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া বিবেকানন্দ স্বামীকে সেই ধর্মসভায় প্রেরণ করিতে মনস্থ করেন এবং তাহার আয়োজন উদ্যোগ করিতে থাকেন।

স্বামীজী জগমোহনের নিকট খেতড়ির মহারাজের অভিপ্রায় অবগত হইয়া তাঁহাকে বলেন, 'আমি আমেরিকায় যাইবার আয়োজন লইয়া ব্যস্ত, সুতরাং মহারাজের অনুরোধ এক্ষণে কিরূপে রক্ষা করি।' স্বামীজীর কথায় জগমোহন বলেন, 'মহারাজ আপনার সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।' স্বামীজী অগত্যা সম্মত হন ও মান্দ্রাজের বন্ধুদিগের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া খেতড়ির রাজপ্রাসাদে গমন করেন। স্বামীজী রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হইলে, মহারাজ তাঁহাকে সর্বসমক্ষে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন ও উপযুক্ত আসনে বসাইয়া তাঁহার সহিত নানা বিষয়ের কথোপকথন করিতে লাগিলেন। আমেরিকায় যাইয়া চিকাগো ধর্ম-মহাসমিতিতে উপস্থিত হইয়া

সনাতন ধর্মের গূঢ়তত্ত্বসকল বুঝাইতে মনস্থ করিয়াছেন, তাহার জন্য মহারাজ তাঁহাকে বহু ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন।

স্বামীজী খেতড়িতে কয়েক দিবস আমোদ-প্রমোদে কালযাপন করিয়া আমেরিকায় যাইবার জন্য উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। খেতড়ির মহারাজ স্বয়ং জয়পুর পর্যন্ত আসিয়া একখানি প্রথম শ্রেণীর গাড়ী রিজার্ভ করিয়া তাহাতে স্বামীজীকে উঠাইয়া দিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন এবং জগমোহনকে বোম্বাই পর্যন্ত যাইয়া স্বামীজীর সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিতে আজ্ঞা দিলেন।

যে সময়ে স্বামীজী, জগমোহন ও স্বামীজীর একজন ভক্ত রেল-কর্মচারী তাঁহাদের রিজার্ভ গাড়ীর মধ্যে বসিয়া কথোপকথন করিতেছিলেন, সেই সময়ে একজন শ্বেতাঙ্গ টিকিট কালেক্টর আসিয়া সেই ভদ্রলোককে গাড়ী হইতে চলিয়া যাইতে আদেশ করিলেন। ভদ্রলোকটি তথাপি অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। সাহেবের আদেশ উপেক্ষিত হইল দেখিয়া সাহেব একটু গরম হইয়া, রেল-আইনের দোহাই দিয়া পুনরায় তাঁহাকে গাড়ী হইতে নামিয়া যাইতে বলিলেন। তিনি রেলওয়ের কর্মচারী, তাঁহারও আইন জানা ছিল। তিনি বলিলেন, 'এমন কোন আইন নাই যাহার দ্বারা তিনি চলিয়া যাইতে বাধ্য ; সুতরাং দুইজনে বচসা আরম্ভ হইল। স্বামীজী তাঁহার ভক্তটিকে পুনঃ পুনঃ ঝগড়া করিতে নিষেধ করিলেও তিনি ক্রমে গরম হইয়া উঠিতেছেন দেখিয়া, স্বামীজী তাঁহাকে নিবারণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন, এমন সময় হঠাৎ স্বামীজীকে 'তুম কাহে বাত করতে হো ?' বলিয়া ধমক দিলেন। গৈরিক-বসনধারী সামান্য সন্ন্যাসী ভাবিয়া সাহেব বোধ হয় ধমকাইয়াছিলেন। রেলে কত সাধু যাতায়াত করেন, সাহেবদের গুঁতাগাঁতা খাইয়াও নিঃশব্দে চলিয়া যান, কাজেই গৌরাঙ্গ ইঁহাকেও তদ্রূপ একজন ভাবিয়াছিলেন। সাহেব এবার যে সিংহের সঙ্গে লাগিয়াছেন, তাহা তিনি জানিতেন না। স্বামীজী চক্ষু আরক্ত করিয়া বলিলেন, 'What do you mean by তুম ? Can you not behave properly ? You are attending 1st and 2nd class passengers and you do not know manners ? Can't you say আপ and speak like a gentleman ?' সাহেব উত্তর করিল, 'I am sorry I don't know the language well. I only wanted this man.' স্বামীজী এইবার আরও বিরক্ত হইয়া বলিলেন, 'You brute, you said you didn't know the vernacular, and now you don't know English your own language even ! Can't you say 'this gentleman.' You beast ? Give me your name and number I am bent on reporting your behaviour to the authorities.'

একটা মহা গোলমাল পড়িয়া গেল, অনেক লোক জড় হইয়া গিয়াছে। স্বামীজীর ধমকানিতে গৌরাঙ্গজী কেঁচোপ্রায়, আর কোন উত্তর দেয় না, পাশ কাটাইবার চেষ্টা। স্বামীজী পুনরায় বলিলেন, 'I give the last alternative, either give me your name and number, or be the worst coward before the public.' সাহেবজী, তখন বেগতিক দেখিয়া সরিয়া পড়িলেন ; গাড়ীও ছাড়িয়া গেল। বোম্বাই নগরে আসিয়া জগমোহন সমস্ত জিনিষপত্রের বন্দোবস্ত করিয়া স্বামীজীকে জাহাজে উঠাইয়া দিতে গেলেন। স্বামীজী আপনার নির্দিষ্ট ফার্ষ্ট ক্লাস কেবিনে যাইয়া বসিলেন। যথাসময়ে ঘণ্টাধ্বনি হইল। যাঁহারা বন্ধুগণকে বিদায় দিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা এবং

জগমোহন জাহাজ হইতে নামিয়া আসিলেন। জাহাজখানিও ধীরে ধীরে সাগর-বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া চলিতে আরম্ভ করিল।

স্বামী বিবেকানন্দ চিকাগোর ধর্মসভায় হিন্দুসম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হইয়া গমন করিলেন বটে, কিন্তু তিনি উক্ত সভা হইতে আমন্ত্রিত হন নাই, অথবা আমেরিকার কোন ভদ্রলোকের সহিত তাঁহার পরিচয় পত্রও ছিল না যে, আমেরিকায় পৌঁছাইয়া তাঁহার বাটীতে অবস্থান করিবেন। তিনি আমেরিকায় যাইয়া কোথায় আহার করিবেন, কোথায় শয়ন করিবেন, কি উপায়েই বা ধর্মসভায় প্রবেশ করিবেন, তাহার কিছুই স্থিরতা নাই, অথচ তিনি আমেরিকা যাত্রা করিলেন।

জাহাজখানি যথাসময়ে জাপান হইয়া আমেরিকার বন্দরে আসিয়া উপস্থিত হইল, অন্যান্য যাত্রীদিগের ন্যায় স্বামীজীও জাহাজ হইতে অবতরণ করিয়া চিকাগো সহরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পরিধানে গৈরিক বসন, গাত্রে গৈরিক আলখাল্লা ও গৈরিক উত্তরীয় এবং শিরে গৈরিক শিরস্ত্রাণ দর্শন করিয়া সহরবাসিগণ অবাক হইয়া গেলেন। তিনি কে এবং তাঁহার কার্য কি ইহা জানিবার জন্য অনেকেই তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। স্বামীজী আপনার উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য সকলের নিকটেই যথাযথ বর্ণন করিতে লাগিলেন। উহাদের মধ্যে দুই চারিজন মান্যগণ্য ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য দেখিয়া এবং তাঁহার গুণে ও মধুর বচনে আকৃষ্ট হইয়া, তাঁহাকে তাঁহাদের বাটীতে অবস্থানের জন্য উপরোধ করেন এবং স্বামীজীকে ধর্মসভায় নিমন্ত্রণ করিবার জন্য সভার প্রধান সভাপতি ব্যারো সাহেবকে অনুরোধ করেন। ব্যারো সাহেব প্রথমে নানাকারণে স্বামীজীকে নিমন্ত্রণ করিতে স্বীকার করেন নাই। পরে আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ দুই-চারিজন পণ্ডিতের বিশেষ অনুরোধে তিনি তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিতে বাধ্য হন।

দিবসের পর দিবস গত হইয়া ক্রমে মহাসমিতির অধিবেশনের দিবস আসিয়া উপস্থিত হইল। ইংলণ্ডের ও আমেরিকার প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণ, খ্যাতনামা ধার্মিক ধর্মযাজকগণ, স্ব স্ব ধর্মের মত ও মহিমা উক্ত সভায় প্রচার করিলেন। বাঙলাদেশের ব্রাহ্ম-সমাজের সুপ্রসিদ্ধ প্রচারক স্বর্গীয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় সেই মহাসমিতিতে নিমন্ত্রিত হইয়া তথায় গমন করিয়াছিলেন, তিনিও সেই মহাসভায় ব্রাহ্মধর্মের বক্তৃতা করিলেন।

ব্রাহ্মধর্মের বক্তৃতা শেষ হইলে, স্বামী বিবেকানন্দ দণ্ডায়মান হইলেন। একজন অপরিচিত, অজ্ঞাতনামা যুবক সন্ন্যাসী হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে দণ্ডায়মান হইলেন দেখিয়া, সেই মহাসমিতির বিজাতীয় যুবক ধর্মপ্রচারকগণ, বিজাতীয় বৃদ্ধ ধর্মযাজকগণ সবিস্ময়ে ও সোৎসুকচিত্তে তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অন্যের কথা দূরে থাকুক, স্বয়ং প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় পর্যন্তও এই দৃশ্য দেখিয়া অবাক হইয়া গেলেন।

স্বামীজী ধীরে ধীরে বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। এদেশে সাকার পূজা হয়। খ্রীষ্টান মিশনারীরা আমেরিকা ও ইউরোপে এদেশবাসীদিগকে অসভ্য জাতি বলিয়া বর্ণনা করেন। তাঁহারা বলেন যে, ভারতবাসীরা পুতুল পূজা করেন ও তাঁহাদের অবস্থা বড় শোচনীয়।

স্বামী বিবেকানন্দ এই সাকার পূজার অর্থ প্রথমেই বুঝাইবার উদ্দেশ্যে বলিলেন, 'ভারতবর্ষে পুতুল পূজা হয় না।'

'At the very outset I may tell you there is no polytheism in India at every temple, if one stands by and in listens he will find the worshippers applying all the attributes of *God* to these *Images*.

Lecture on Hinduism

'Why does a Christian go to Church? Why is the cross holy? Why is thy face turned towards the sky in prayer? Why are there so many images in the Catholic Church? Why are there so many images *in the minds* of Protestants when they pray? My brethren, we can no more think about *anything* without a material image than we can live without breathing. Omnipresence to almost the whole world means nothing. Has God superficial area? If not, then when we repeat the word we think of the extended earth; that is all.'

***Lecture* on *Hinduism* (*Chicago*).**

তাঁহার বক্তৃতা-শক্তি, শাস্ত্রজ্ঞান, অকাট্য যুক্তি এবং তর্কের প্রণালী দেখিয়া, বিদ্বন্মণ্ডলী ও সাধুসমাজ স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। সভায় ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল। সমস্ত আমেরিকায় এই বক্তৃতা লইয়া আন্দোলন উপস্থিত হইল। সে আন্দোলন ও প্রশংসাধ্বনি আটলান্টিক মহাসমুদ্র পার হইয়া দেশ বিদেশে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। সকলে একবাক্যে স্বীকার করিলেন, স্বামীজী সত্য সত্যই মহা জ্ঞানী পুরুষ।

স্বামী বিবেকানন্দ কেবল মহাজ্ঞানী পুরুষ নহেন—তিনি সাধু পুরুষ। শুধু পাণ্ডিত্যের জন্য ইংলণ্ড ও আমেরিকাবাসিগণ সন্তানের ন্যায় তাঁহার সেবা করেন নাই। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন, ইঁহার মধ্যে এমন কিছু পদার্থ জন্মিয়াছে, যাহা দ্বারা ইনি দেবতুল্য হইতে সক্ষম হইয়াছেন। লোকে সম্মান, ঐশ্বর্য, ইন্দ্রিয়-সুখ, পাণ্ডিত্য প্রভৃতি লইয়া রহিয়াছে; কিন্তু ইহার লক্ষ্য কেবলমাত্র ঈশ্বরের দিকে। আমেরিকায় ইনি যেরূপ প্রলোভনে পড়িয়াছিলেন, তাহাতে কয়জন যুবক তাঁহাদের চিত্ত স্থির রাখিতে পারিতেন? একে তাঁহার জগদ্ব্যাপী প্রতিষ্ঠা, তাহাতে পরমাসুন্দরী উচ্চবংশীয়া সুশিক্ষিতা যুবতী মহিলাগণ সর্বদা আসিয়া আলাপ ও সেবা করিতেন, এমন কি, অনেকে তাঁহাকে বিবাহ করিতেও চাহিয়াছিলেন। একজন অতি ধনাঢ্যের কন্যা (heiress) সত্য সত্য এক দিন আসিয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, 'স্বামিন্! আমার সর্বস্ব ও আমাকে, আপনাতে সমর্পণ করিলাম।' এরূপ প্রলোভন কয়জন সহ্য করিতে পারেন?

ইংরাজী ১৮৯৪, ৫ই এপ্রিলের 'বোসটন ইভিনিং ট্রান্সক্রীপ্ট' নামক সংবাদ পত্র, স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে বলিতেছেন,—He is really a great man, noble, simple, sincere and learned beyond comparison with most of our scholars. *** A professor at Harward wrote to the people in charge of the religious Congress to get him invited to Chicago, saying—'He is more learned than all of us together.'

কিছুদিন পরে ঐ সংবাদ-পত্র পুনরায় লিখিতেছেন—There is a room at the

left of the entrance to the Art palace. To this the speakers of the Congress of Religions all repair. '*** The most striking figure one meets in this anti-room is Swami Vivekananda the Hindu monk. *** মহাবোধি সোসাইটীর সেক্রেটারী—এইচ ধর্মপাল—বৌদ্ধধর্ম-সম্প্রদায় হইতে নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছিলেন। তিনি ইণ্ডিয়ান্ মিরারে লিখিতেছেন;—'The success of the Religious parliament was, to a great extent, due to Swami Vivekananda.'

'দি নিউইয়র্ক হেরল্ড' নামক সংবাদপত্র বলিতেছেন—

'Vivekananda was undoubtedly the greatest figure in the parliament of Religions. After hearing him we feel how foolish is to send missionaries to his learned nation.'

চিকাগো-সভার প্রধান সভাপতি—রেভারেণ্ড ডাক্তার ব্যারো সাহেব—অবশেষে অগত্যা এইরূপ লিখিতেছেন,—'India the mother of Religions, was represented by Swami Vivekananda, the orange monk, who exercised a wonderful influence over his auditors.'

স্বামীজীর যশঃসৌরভ চতুর্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িলে, আমেরিকার নানাস্থান হইতে তাঁহাকে বক্তৃতা করিবার জন্য নিমন্ত্রণ হইতে লাগিল। তিনি প্রায় দুই বৎসরকাল আমেরিকার নানা স্থানে হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া, ধর্মের সার্বভৌমিকতা বুঝাইয়া দিয়া, 'হিন্দুধর্মই আদি ও যথার্থ সত্য', ইহা তদ্দেশীয় ব্যক্তিদিগের অন্তরে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত করিয়া দিয়া, তদ্দেশবাসী কত নরনারীকে ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করাইয়া, বেদান্ত শিক্ষা দিয়া, পাশ্চাত্য প্রদেশে তাঁহাদিগকে প্রচারিকার কার্যে নিযুক্ত করিয়া, ১৩০২ বঙ্গাব্দে আমেরিকা হইতে ইংলণ্ডে গমন করেন।

স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকায় গমন করিয়া প্রথম বৎসরেই তদ্দেশবাসী ম্যাডাম লুইস (Madam Louise) এবং মিস্টার স্যাণ্ডেসবার্গকে (Mr Sandsburg) ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করাইয়া বেদান্ত শিক্ষা দেন। এক্ষণে তাঁহারা স্বামী অভয়ানন্দ ও স্বামী কৃপানন্দ নাম ধারণ করিয়া সমগ্র আমেরিকার ও ইউরোপের মধ্যে বেদান্ত প্রচার করিতেছেন।

যে সময়ে স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকায় ছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার গুরুভাই ও শিষ্য-সেবকগণ পত্রের দ্বারা তাঁহার সংবাদ লইতেন। তিনিও সেই সকল পত্রের উত্তর প্রদান করিতেন। তিনি যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার একখানি মাত্র এই স্থানে প্রকাশ করিলাম।

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়।

২৮শে ডিসেম্বর, ১৮৩৯।
George W. Hale
541, Dearborn Avenue, Chicago.

কল্যাণাস্পদেষু,

বাবাজি, তোমার পত্র কাল পাইয়াছি। তোমরা যে আমাকে মনে রাখিয়াছ, ইহাতে আমার পরমানন্দ। ভারতবর্ষের খবরের কাগজে চিকাগো বৃত্তান্ত হাজির, বড় আশ্চর্যের

বিষয়; কারণ, আমি যাহা করি, গোপন করিবার যথোচিত চেষ্টা করি। এদেশে আশ্চর্যের বিষয় অনেক। বিশেষ, এদেশে দারিদ্র্য নাই বলিলেই হয় ও এদেশের স্ত্রীদের মত স্ত্রী কোথাও দেখি নাই। সকল কার্য এরাই করে। স্কুল, কলেজ মেয়েতে ভরা। আমাদের পোড়া দেশের মেয়েছেলের পথ চল্‌বার যো নাই। আর এদের কত দয়া! যতদিন এখানে এসেছি, এদের মেয়েরা বাড়ীতে স্থান দিতেছে, খেতে দিচ্ছে,—লেক্‌চার দেবার সব বন্দোবস্ত করে, সঙ্গে করে বাজারে নিয়ে যায়, কি না করে, বলিতে পারি না। শত শত জন্ম এদের সেবা করিলেও এদের ঋণ-মুক্ত হব না!

বাবাজি, শাক্ত শব্দের অর্থ জান? শাক্ত মানে মদ ভাঙ নয়, শাক্ত মানে যিনি ঈশ্বরকে সমস্ত জগতে বিরাজিত মহাশক্তি বলে জানেন এবং সমগ্র স্ত্রী-জাতিতে সেই মহাশক্তির বিকাশ দেখেন,—এরা তাই দেখে। মনু মহারাজ বলিয়াছেন যে, 'যত্র নার্যস্তু নন্দন্তে তত্র দেবতাঃ' যেখানে স্ত্রীলোকেরা সুখী, সেই পরিবারের উপর ঈশ্বরের মহাকৃপা। এরা তাই করে। আর এরা তাই এত সুখী, বিদ্বান্‌, স্বাধীন ও উদ্যোগী। আর আমরা স্ত্রীলোককে নীচ, অধম অতি হেয়, অপবিত্র বলি। তার ফল, আমরা পশু, দাস, উদ্যমহীন, মহাদরিদ্র।

এদেশের ধনের কথা কি বলিব? পৃথিবীতে এদের মত ধনীজাতি আর নাই। ইংরেজেরা ধনী বটে, কিন্তু অনেক দরিদ্রও আছে। এদেশে দরিদ্র নাই বলিলেও হয়। একটা চাকর রাখতে গেলে, রোজ ৬ টাকা খাওয়া-পরা বাবদে দিতে হয়। ইংলণ্ডে এক টাকা রোজ। একটা কুলী ছ-টাকা রোজের কম খাটে না, কিন্তু খরচও তেমনি। চারি আনার কম একটা খারাপ চুরুট মেলে না। ২৪ টাকায় একজোড়া মজবুত জুতো। যেমন রোজগার তেমনি খরচ। কিন্তু এরা যেমন রোজগার করিতে, তেমনি খরচ করিতে। আর এদের মেয়েরা কি পবিত্র। ২৬ বৎসর ৩০ বৎসরের কমে কারুর বিবাহ হয় না। আর আকাশের পক্ষীর ন্যায় স্বাধীন। হাট-বাজার, দোকান-পাট, রোজগার, সব কাজ করে, অথচ কি পবিত্র! যাদের পয়সা আছে, তারা দিন-রাত গরীবদের উপকারে ব্যস্ত। আর আমরা কি করি? আমার মেয়ের ১১ বৎসরে বে না হলে খারাপ হয়ে যাবে। আমরা কি মানুষ বাবাজি? মনু বলেছেন, 'কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষনীয়াতিযত্নতঃ,—' ছেলেদের যেমন ৩০ বৎসর পর্যন্ত ব্রহ্মচর্য করে বিদ্যাশিক্ষা করতে হবে, তেমনি মেয়েদেরও করতে হবে। কিন্তু আমরা কি করছি? তোমাদের মেয়েদের উন্নত করতে পার? তবে আশা আছে, নতুবা পশু-জন্ম ঘুচবে না।

দ্বিতীয় দরিদ্র লোক! যদি কারুর আমাদের দেশে নীচ-কুলে জন্ম হয় তার আর আশা-ভরসা নাই, সে গেল। কেন হে বাপু? কি অত্যাচার! এদেশের সকলের আশা আছে, ভরসা আছে, Opportunities আছে। আজ যে গরীব, কাল সে ধনী হবে, বিদ্বান হবে, জগন্মান্য হবে। আর সকলে দরিদ্রের সহায়তা করিতে ব্যস্ত। গড়ে ভারতবাসীর মাসিক আয় ২ টাকা। সকলে চেঁচাচ্ছেন আমরা বড় গরীব, কিন্তু ভারতের দরিদ্রের সহায়তা করিবার কয়টা সভা আছে? ক-জন লোকের লক্ষ লক্ষ অনাথের জন্য প্রাণ কাঁদে? হে ভগবন্‌, আমরা কি মানুষ! ঐ যে পশুবৎ হাড়ি, ডোম তোমার বাড়ীর চারিদিকে, তাদের উন্নতির জন্য তোমরা কি করেছ তাদের মুখে একগ্রাস অন্ন দেবার জন্য কি করেছ, বলতে পার? তোমরা তাদের ছোঁও না, দূরে দূরে কর, আমরা কি মানুষ? ঐ যে তোমাদের হাজার হাজার সাধু ব্রাহ্মণ ফিরছেন, তাঁরা এই

অধঃপতিত দরিদ্র পদদলিত গরীবদের জন্য কি করছেন! খালি বলছেন, ছুঁয়োনা আমায় ছুঁয়োনা। এমন সনাতন ধর্মকে কি করে ফেলেছে! এখন ধর্ম কোথায়? খালি ছুৎমার্গ—আমায় ছুঁয়োনা—ছুঁয়োনা।

আমি এদেশে এসেছি, দেশ দেখতে নয়, তামাসা দেখতে নয়, নাম করতে নয়, এই দরিদ্রের জন্য উপায় দেখতে। সে উপায় কি, পরে জানতে পারবে, যদি ভগবান সহায় হন।

এদের অনেক দোষও আছে। ফল কথা, এই ধর্মবিষয়ে এরা আমাদের চেয়ে অনেক নীচে, আর সামাজিক সম্বন্ধে এরা অনেক উচ্চ এদের সামাজিক ভাব আমরা গ্রহণ করিব, আর এদের আমাদের ধর্ম শিক্ষা দিব। কবে দেশে যাব, জানি না, প্রভুর ইচ্ছা বলবান। তোমরা সকলে আমার আশীর্বাদ জানিবে।

ইতি—বিবেকানন্দ

স্বামী বিবেকানন্দ ইংলণ্ডে কয়েক মাস অবস্থান করিয়া হিন্দুধর্ম প্রচার করিতে থাকেন। তাঁহার বক্তৃতার মোহিনী শক্তিতে আমেরিকার ন্যায় এই স্থানেও এতদ্দেশবাসী বহুসংখ্যক নরনারী তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ঐ সকল শিষ্যদের মধ্যে সিস্টার নিবেদিতাই সর্বপ্রধানা ছিলেন। ইংলণ্ডের প্রধান প্রধান সভায় এবং সম্প্রদায়ে ব্রহ্মচারিণী নিবেদিতা অতি সাদরে ও সাগ্রহে আহূত হইতেন। তথায় তিনি ভারতের সমাজচিত্র এবং গার্হস্থ্য ও পারিবারিক চিত্র আশ্চর্য ক্ষমতার সহিত অঙ্কিত করিয়া সকল নরনারীর সমক্ষে দেখাইতেন, যে ভারতের গৌরব কত উজ্বল, কত মহিমান্বিত এবং কত অনুকরণীয়। ৺রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় শ্রীমতী নিবেদিতার সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, 'তাঁহার বিদ্যা-বুদ্ধি ও বলিবার-কহিবার ক্ষমতা আলোকসামান্য।'

স্বামী বিবেকানন্দ কয়েকজন ইউরোপীয়ান শিষ্যের সহিত ১৩০৩ বঙ্গাব্দে (ইংরাজী ১৮৯৬ সালের ডিসেম্বর মাসের ১৬ই তারিখে) ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষে আগমন করেন। ভারতে আসিবার সময় সিংহলবাসীদিগের অনুরোধে তিনি সিংহল দ্বীপস্থ কলম্বো নামক স্থানে আহূত হন। সিংহল কোথায় এবং ইহার নামোৎপত্তিই বা কিরূপে হইল, পাঠক-পাঠিকার অবগতির জন্য তাহার যৎকিঞ্চিৎ এই স্থানে লিপিবদ্ধ করিলাম।

দশাননের স্বর্ণলঙ্কাপুরী এক্ষণে সিংহল নামে পরিচিত। কিরূপে এই নামের উৎপত্তি হইল, সিংহলে তাহার এক কিংবদন্তী আছে। মগধের রাজকুমার বিজয়বাহু লঙ্কারাজ্য জয় করিয়া তথায় রাজত্ব বিস্তার করেন, লঙ্কায় তখন যক্ষপুরী ছিল, বিজয়বাহু যক্ষপুরীতে রাজধানী না করিয়া যেখানে তরণী হইতে অবতীর্ণ হন, সেই স্থানে (সমুদ্র উপকূলস্থ এক কাননে) তাম্রকর্ণী নামে নূতন রাজধানী সংস্থাপিত করিয়াছিলেন, তদনুসারে সমস্ত লঙ্কার নাম তাম্রকর্ণী হইয়াছিল। বিজয়বাহুর পিতা সিংহবাহু স্বহস্তে সিংহ-বধ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদের বংশের উপাধি সিংহল হইয়াছিল; সুতরাং বিজয়বাহু-বিজিত রাজ্য, সিংহল নামে অভিহিত হয়। কেহ কেহ বলেন, বিজয়বাহু বাঙালী ছিলেন, কারণ তাঁহার পিতামহী এক বঙ্গ রাজকন্যা এবং সিংহবাহুও বঙ্গের কতকদূর অধিকার করিয়া রাজা নাম লইয়াছিলেন। বর্তমান সিংহভুম তাঁহার রাজধানী ছিল। মগধরাজ অজাতশত্রুর রাজত্বকালে, অষ্টাদশ বর্ষে, খ্রীষ্ট-জন্মের পাঁচ শত ত্রিচত্বারিংশৎ বৎসর পূর্বে, আমাদিগের শকাব্দা আরম্ভের ৬২২ বৎসর পূর্বে, বিজয়বাহু

লঙ্কা বিজয় করিয়াছিলেন। সেই বৎসর শাক্যমুনি নির্বাণপ্রাপ্ত হন। বিজয়বাহু শৈব ছিলেন। তাঁহার রাজধানীতে চারিটি শিবালয় আছে। বিজয়ের লঙ্কায় অবতরণ সময় হইতে সিংহল অব্দ আরম্ভ। সিংহলের ইংরাজী নাম সিলোন।

সিলোনের চতুর্দিক সমুদ্র-পরিবেষ্টিত। ইহার দৈর্ঘ্য উত্তর-দক্ষিণে ২৬৬ মাইল, প্রশস্ততা পূর্ব-পশ্চিমে ১৪৪ মাইল। পরিধি প্রায় পঁচিশ হাজার বর্গমাইল। ১৫০৫ খ্রীষ্টাব্দে পোর্টুগিজেরা এই দ্বীপে কুঠি স্থাপন করেন, কিন্তু পর শতাব্দীতেই ওলন্দাজেরা তাঁহাদিগকে অধিকারচ্যুত করিয়া আপনাদিগের অধিকার বিস্তার করেন। ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশেরা ওলন্দাজী কুঠি অধিকার করিয়া মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির সহিত সংযুক্ত করিয়া লন। ছয় বৎসব পরে ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে সিংহলরাজ্য মান্দ্রাজ হইতে পৃথক হইয়া স্বতন্ত্র উপনিবেশ হয়। এই সময় হইতেই সিংহলরাজ্য ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের শাসনাধিকার হইতে বিচ্যুত হয়। উহা বৃটিশাধিকৃত ঔপনিবেশিক শাসন-প্রণালীর অন্তর্গত। সিংহলকে যখন ভারত সাম্রাজ্য হইতে পৃথক করিয়া ঔপনিবেশিক শাসনাধীন করা হয়, তখন ভারতবর্ষের ভূতপূর্ব গবর্ণর জেনারেল মার্কুইস্ অব্ ওয়েলেস্লী তদ্বিষয়ে তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন।

লঙ্কার সমুদ্রসন্নিহিত ভূভাগ বহুদূর পর্যন্ত সমতলক্ষেত্র; ভূমি উর্বরা, সর্ব ঋতুতেই নানাবিধ শস্য ও বৃক্ষলতায় সমলঙ্কৃত; মধ্যভাগ সুনাদিনী স্রোতস্বতী ও মনোহর পর্বতমালায় পরিশোভিত। পাশ্চাত্য ভ্রমণকারীরা লঙ্কাকে প্রাচ্যতরঙ্গের নন্দনকানন (Garden of Eden) বলিয়া সম্মান করিয়াছেন। বাস্তবিক ও গৌরব অযথাস্থানে প্রদত্ত হয় নাই। সিংহল দ্বীপ বিবিধ মহামূল্য মণিরত্নের আকর; সিংহলের সুবিস্তৃত সুদৃশ্য দারুচিনির উদ্যান জগদ্বিখ্যাত;—প্রাকৃতিক শোভা জগতে অতুলনীয়। স্থানে স্থানে অগণিত সুন্দর প্রাচীন অট্টালিকা ও কীর্তিস্তম্ভের ধ্বংসাবশেষ এখনো দেখিতে পাওয়া যায়। বর্তমান রাজধানী কলম্বো নগরে ইংরেজদিগের মহাবিস্তৃত বন্দর হইয়াছে, বাণিজ্যেরও বহুল বিস্তার। কলম্বো বিষুবরেখা হইতে সাত অংশ উত্তর; এখানে সৌরকর অতিশয় প্রখর, কিন্তু সমুদ্রসমুত্থিত সুশীতল সমীরণ সর্বদা প্রবাহিত হইয়া সেই তীব্র রবিতেজকে স্নিগ্ধতাগুণে শীতলস্পর্শ করিয়া থাকে। সিংহলে চিরবসন্ত বিরাজমান; পৌষ-মাঘ মাসের রাত্রে সামান্য একখানা স্থূল-বস্ত্রে দেহাবরণ করিলেই শীত নিবারণ হয়।

সিংহলের মহামূল্য রত্নসকল বিশ্ববিখ্যাত। সিংহলে যখন দেশীয় রাজা ছিলেন, তখন তাঁহারা মণিরত্ন আহরণ-স্বত্বটী আপনাদেরই একচেটে করিয়া রাখিতেন। ইংরেজেরা যখন মোরাবাক্, করালী, নুবারা, এলিয়া, রাক্বাণী এবং রত্নপুরীর রত্নক্ষেত্র অধিকার করেন, সে সময় পর্যন্ত ঐ রীতি প্রচলিত ছিল। রাক্বাণী ও রত্নপুরী প্রদেশে নীলকান্তমণি ও বিড়ালাক্ষ-মণি বহুল পরিমাণে সমুৎপন্ন হয়। সিংহলের পদ্মরাগ মণি জগতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। নদীর স্তরে এবং অয়স্কান্তের আকর-মৃত্তিকায় ইহা উৎপন্ন হইয়া থাকে। সিংহলের মরকতমণিও পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়। কান্দির নিকটবর্তী মহাবিলঙ্গা প্রদেশেই ইহার প্রধান আকর।

সিংহলের মুক্তা ভুবনবিখ্যাত। পূর্বে প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে সিংহলের উত্তর-পশ্চিমে আরিপো নামক জনপদের নিকট সমুদ্র হইতে মুক্তাফলদ কম্বুরী উত্তোলন করা হইত। ইহাতে গভর্ণমেন্টের প্রায় চৌদ্দ লক্ষ টাকা লাভ থাকিত। বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র

মাসের ২০শে তারিখে (ইং ১৯০২ সালের জুলাই মাসের ৪ঠা তারিখে) রাত্রি ৯।।০ টার সময় ভাগীরথী-তীরস্থ বেলুড় মঠে তিনি নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া মহাসমাধির সাধনোচিত ধামে গমন করেন।

স্বামী বিবেকানন্দ কামিনীকাঞ্চনত্যাগী। তিনি নির্জনে গুরুর কৃপায় অনেক দিন সাধনা করিয়াছিলেন। তিনি যথার্থ কর্মযোগের অধিকারী। তবে তিনি সন্ন্যাসী, মনে করিলেই ঋষিদের মত অথবা তাঁহার গুরুদেব পরমহংসদেবের মত কেবল জ্ঞানভক্তি লইয়া থাকিতে পারিতেন ; কিন্তু তাঁহাব জীবন কেবল ত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখাইবার জন্য হয় নাই। সংসারীরা যে সকল বস্তু গ্রহণ করে, অনাসক্ত হইয়া তাহাদের কিরূপ ব্যবহার করিতে হয, স্বামীজী তাহাও দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি অর্থ ও মান, এ সকলকে সন্ন্যাসীর ন্যায় কাক-বিষ্ঠা জ্ঞান করিতেন বটে, অর্থাৎ নিজে ভোগ করিতেন না, কিন্তু তাহাদিগকে পরার্থে কিরূপ ব্যবহার করিতে হয, তাহা নিজে কাজ করিয়া দেখাইয়া গিযাছেন। যে অর্থ বিলাত ও আমেরিকার বন্ধুবর্গের নিকট হইতে তিনি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সে সমস্ত অর্থ জীবের মঙ্গল কল্পে ব্যয় করিয়াছেন। স্থানে স্থানে,—যথা,—কলিকাতার নিকটস্থ বেলুড়ে, আলমোড়ার নিকটস্থ মায়াবতীতে, ৺কাশীধামে ও মান্দ্রাজে মঠ স্থাপন করিয়াছেন। দুর্ভিক্ষপীড়িতদিগের নানা স্থানে—দিনাজপুর, বৈদ্যনাথ, কিষেণগড়, দক্ষিণেশ্বর ও অন্যান্য স্থানে—সেবা করিয়াছেন। দুর্ভিক্ষের সময় পিতৃমাতৃহীন অনাথ বালক-বালিকাগণকে অনাথাশ্রম করিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন। রাজপুতনার অন্তর্গত কিষেণগড় নামক স্থানে অনাথাশ্রম স্থাপন করিয়াছিলেন। এ আশ্রমে ইংরাজ Commissioner নিজে আসিয়া অনেক উৎসাহ প্রদান ও সহায়তা করিয়াছিলেন। মুর্শিদাবাদের নিকট 'ভাবদা' গ্রামে এখনও অনাথাশ্রম চলিতেছে। স্বামীজী হরিদ্বারের নিকটস্থ কণখলে পীড়িত সাধুদিগের জন্য সেবাশ্রম স্থাপন করিয়াছেন। প্লেগের সময় প্লেগব্যাধি আক্রান্ত রোগীদিগকে অনেক অর্থব্যয় করিয়া সেবা-শুশ্রূষা করাইয়াছেন। দরিদ্র কাঙালের জন্য একাকী বসিয়া কাঁদিতেন। আর বন্ধুদের সমক্ষে বলিতেন, 'হায়! এদের এত কষ্ট যে ঈশ্বরকে চিন্তা করিবার অবসর পর্যন্ত নাই !'

সমগ্র ইংলণ্ড ও আমেরিকা-মুগ্ধকারী স্বামী বিবেকানন্দের অতি সরল, মধুর ও ওর্জস্বিনী ইংরাজী ভাষায় প্রণীত 'রাজযোগ', 'ভক্তিযোগ' ও 'কর্মযোগ' নামক তিনখানি উপাদেয় পুস্তক আছে।

—:০:—

মহাত্মা পওহারী বাবা

জন্ম ও শৈশবকাল

জৌনপুর জেলার অন্তর্গত প্রেমাপুর গ্রামে অযোধ্যানাথ তেওয়ারী নামক একজন শুদ্ধাচারী বৈষ্ণব বাস করিতেন। তিনি রামানুজীয়* 'বড়গল' শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। ইঁহারা দুই সহোর। জ্যেষ্ঠের নাম লছমীনারায়ণ। লছমীনারায়ণ সংসার ত্যাগ করিয়া, গাজীপুর নগরের প্রান্তবর্তী কুর্থা নামক গ্রামে ভাগীরথীর তীরে একটি ক্ষুদ্র বনের মধ্যে একখানি কুটীর বাঁধিয়া তাহাতে সাধন-ভজন ও যোগাভ্যাস করিতেন; গঙ্গা এখন যেমন কুর্থা গ্রাম হইতে দূরে চলিয়া গিয়াছেন, ৬০ বৎসর পূর্বে তেমন ছিলেন না। তখন পুণ্যতোয়া ভাগীরথী সেই বনভূমির প্রান্তদেশ ধৌত করিয়া প্রবাহিত হইতেন।

অযোধ্যানাথের তিন পুত্র। জ্যেষ্ঠ গঙ্গারাম, মধ্যম হরভজন এবং কনিষ্ঠ বলরাম। শৈশবাবস্থায় কঠিন বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইয়া হরভজন দাসের দক্ষিণ চক্ষু নষ্ট হইয়া যায়। সেই এক চক্ষুহীন বালকের মাতাপিতা তাহাকে আদর করিয়া শুক্রাচার্য বলিয়া ডাকিতেন। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত প্রেমাপুর গ্রামে হরভজনের জন্ম হয়। হরভজনের বয়স যখন দশ বৎসর, সেই সময়ে সাধু লছমীনারায়ণ পীড়িত হইয়া অতিশয় দুর্বল হইয়া পড়েন এবং তাঁহার পদদ্বয় ফুলিয়া উঠে। কতকগুলি মূর্খ লোকের পরামর্শে সাধু লছমীনারায়ণ তাঁহার পদদ্বয় হইতে রক্ত মোক্ষণ করিয়া ফেলেন। শরীরের রক্ত

রামানুজীয় সম্প্রদায় দুইটি দলে বিভক্ত যথা—'বড়গল' ও 'তুইংঘল।' এই দুইটি দল সম্বন্ধে একটি গল্প আছে।—এক সময়ে রামানুজীয় সম্প্রদায়ের দুই জন সাধক পূজার আয়োজনে নিযুক্ত ছিলেন, এমন সময়ে তাঁহাদের ইষ্টদেবতা শ্রীরঙ্গজীর রথ আসিতেছে দেখিতে পাইলেন। একজন শশব্যস্তে তখনই ইষ্টদেবের দর্শনার্থে রথের নিকটে আসিলেন, অপর সাধক পূজার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করিয়া উঠিলেন। তাঁহাদের ইষ্টদেব, যিনি অগ্রে আসিয়াছিলেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমার তিলক অসম্পূর্ণ কেন?' তিনি কহিলেন, 'যখন উপাস্য দেবের দর্শন পাইলাম, তখন উপাসনার প্রয়োজন কি? তাই আমি পূজার ব্যবস্থা অসম্পূর্ণ রাখিয়া উঠিয়া আসিয়াছি।' অন্য সাধককে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, 'উপাসনার দ্বারা উপাস্য দেবতার লাভ হয়, সেই জন্য উপাসনা পূর্ণ না হইলে উঠিতে পারি নাই।' সাধকদ্বয়ের কথা শুনিয়া ইষ্টদেব পূর্বোক্ত ব্যক্তিকে বলিলেন, 'তুমি বড়গল নামে পরিচিত হইবে', এবং শেষোক্তকে বলিলেন, 'তোমায় সকলে তুইংঘল বলিবে।' এই দুই শ্রেণীর বৈষ্ণবের কপালস্থিত তিলক-রেখা দেখিলেই প্রভেদ বুঝিতে পারা যায়। এক শ্রেণীর তিলক কপালে ত্রিশূলাকৃতি রেখাবিশিষ্ট, অপর শ্রেণীর তিলক নাসিকার উপর ব্যাপিয়া কপালে ত্রিশূলাকৃতি অঙ্কিত থাকে।

বহু পরিমাণে নির্গত হওয়ায় তাঁহার চক্ষু তেজোহীন হইয়া যায়। চক্ষের জ্যোতিঃ ক্রমশঃ নষ্ট হইতেছে দেখিয়া 'সুরমা' ব্যবহার করিতে লাগিলেন। ঐ 'সুরমা' এরূপ বিষাক্ত ছিল যে, চক্ষে দিবামাত্রই দারুণ যন্ত্রণা হইত। উহা দুই চারি দিবস ব্যবহার করিবার পর তাঁহার চক্ষু ও সমস্ত মুখ ফুলিয়া ৮।১০ দিবসের মধ্যেই দৃষ্টিশক্তি হীন হইয়া যায়। অযোধ্যানাথ জ্যেষ্ঠের শারীরিক কষ্ট দেখিয়া অত্যন্ত কাতর হইলেন এবং অগ্রজের শুশ্রূষার জন্য আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে তাঁহার নিকট রাখিতে অনুরোধ করিলেন। কনিষ্ঠের কথায় সাধু লছ্মীনারায়ণ বলিলেন, 'গঙ্গারাম তোমার সাংসারিক বিষয়কার্যে সাহায্য করিবে, সে তোমার কাছেই থাকুক, তুমি কনিষ্ঠ* শুক্রাচার্যকে আমার নিকট রাখিয়া দাও।'

অযোধ্যানাথ জ্যেষ্ঠকে অনেক বুঝাইয়া বলিলেন যে, 'শুক্রাচার্য নিতান্ত শিশু, তাহার দ্বারা আপনার উপযুক্ত সেবা হইবে না।' কিন্তু লছ্মীনারায়ণ কিছুতেই শুনিলেন না। পাছে সহোদরেব কষ্ট হয়, এই ভাবিয়া তিনি শুক্রাচার্যকেই পাঠাইতে বলিলেন। জ্যেষ্ঠের অনুমতিক্রমে অযোধ্যানাথ, দশমবর্ষীয় বালক হরভজনকে জননীর স্নেহ-ক্রোড় হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া, কুর্থা গ্রামের নির্জন বনের মধ্যে পিতৃব্যের সেবায় নিযুক্ত করিলেন। মধ্যে একবার ঐ শিশুকে বাটীতে আনিয়া তাঁহার যজ্ঞোপবীত দিয়া আবার তথায় রাখিয়া আসিলেন।

বিদ্যাশিক্ষা

হরভজন পিতৃব্যের আশ্রমে আসিয়া বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ করিলেন। তিনি প্রত্যুষে গঙ্গাস্নান করিয়া অধ্যয়ন করিতেন এবং বেলা দশটা পর্যন্ত অধ্যয়ন করিয়া রন্ধনকার্যে প্রবৃত্ত হইতেন। রন্ধন শেষ হইলে, জ্যেষ্ঠতাত ও তাঁহার একটি শিষ্যের সেবা করিয়া আপনি অন্নগ্রহণ করিতেন। প্রায় এক বৎসর কাল এইরূপে অতিবাহিত করিয়া তিনি গাজীপুরের প্রান্তস্থিত হুসেনপুর গ্রামে শিউবতন পণ্ডিতের কাছে গিয়া প্রতিদিন সংস্কৃত শিক্ষা করিতে লাগিলেন। কিছুদিন তথায় সংস্কৃত এবং জ্যোতিষ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া শঙ্করাগ্রামে নন্দা নামক পণ্ডিতের নিকট 'বালবোধ', 'শীঘ্রবোধ' প্রভৃতি জ্যোতিষ শাস্ত্র শিক্ষা করিতে লাগিলেন। ত্রয়োদশ বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে সংস্কৃত ব্যাকরণ পড়িতে ইচ্ছুক হইয়া গাজীপুর নগরনিবাসী বেচন পণ্ডিতের নিকট 'স্বারস্বত' ও 'চন্দ্রিকা' নামক দুইখানি গ্রন্থ পাঠ করিলেন। ইহার এক বৎসর পরে গোপাল পণ্ডিতের নিকট বেদান্তপঞ্চদশী উত্তমরূপে শিক্ষা করিলেন। অসামান্য স্মরণশক্তিপ্রভাবে তিনি অতি অল্প সময়ের মধ্যেই অসাধারণ পণ্ডিত হইয়া উঠিলেন। এই সময়ে একবার তিনি প্রেমাপুরে গিয়া স্নেহময়ী জননীকে দর্শন করিয়া আসেন।

তীর্থযাত্রা ও সাধনা

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে সাধু লছ্মীনারায়ণ দেহত্যাগ করেন। হরভজন পিতৃব্যের সমাধি এবং অন্যান্য কার্য সমাধা করিয়া ঐ আশ্রমেই অবস্থিত করিতে লাগিলেন। লছ্মীনারায়ণ কতকগুলি দেব-দেবীর মূর্তি পূজা করিতেন। এক্ষণে শুক্রাচার্য সেই সকল দেব-দেবীর পূজা ও শাস্ত্রাদি পাঠ করিয়া দিন অতিবাহিত করিতে

* তখন অযোধ্যানাথের তৃতীয় পুত্র জন্মগ্রহণ করেন নাই।

লাগিলেন ; কিন্তু ইহাতে তাঁহার হৃদয় শান্তিলাভ করিল না। এই সময় হইতে তাঁহাকে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ও চিন্তাকুল দেখা যাইত। তিনি প্রায় রন্ধন করিতেন না, কোন দিন এক পোয়া কি অর্ধসের দুগ্ধ পান করিতেন, কোন দিন বা নিরম্বু উপবাসেই কাটাইয়া দিতেন।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে দেব-দেবীর পূজা ও আশ্রমের ভার পিতৃব্যের মন্ত্রশিষ্যকে সমর্পণ করিয়া হরভজন তীর্থভ্রমণে বাহির হইলেন। তিনি শ্রীক্ষেত্র, সেতুবন্ধরামেশ্বর, চিদাম্বরম্ প্রভৃতি বহুতীর্থ পদব্রজে পর্যটন করিয়া 'গিরনার' পর্বতে গমন করিলেন। তথায় একজন মহাপুরুষের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। সেই সিদ্ধপুরুষ ইঁহাকে যোগাভ্যাস করিতে শিক্ষা দেন। তিনি নানাতীর্থ পর্যটন এবং যোগসাধনা শিক্ষা করিয়া প্রায় তিন বৎসরকাল পরে পিতৃব্যের আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন। তীর্থ হইতে প্রত্যাগত হইয়াই তিনি স্বীয় জ্যেষ্ঠতাতের সমাধি উত্তোলন করিয়া তন্মধ্যস্থ অস্থি গঙ্গার জলে নিক্ষেপ করিলেন এবং সেই সমাধি পুনর্নির্মাণ করাইয়া তাহার উপর কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরের চরণপাদুকা স্থাপন করিলেন। এই সময়ে তাঁহার পিতার পরলোকপ্রাপ্তি হয়।

'গিরনার' পর্বত হইতে প্রত্যাগত হইয়া হরভজন, 'আমি' শব্দ পরিত্যাগ করেন। তিনি আপনাকে 'দাস', প্রত্যেক পুরুষকেই 'বাবা' এবং স্ত্রীলোকদিগকে 'মাইজী' বলিয়া সম্বোধন করিতেন।

তিনি প্রত্যহ প্রাতঃকাল হইতে দশ ঘটিকা পর্যন্ত স্নান ও পূজায় সময় অতিবাহিত করিতেন। সূর্যোদয়ের পূর্বে যখন তিনি স্নান সমাপন করিয়া নদীবক্ষে দাঁড়াইয়া যোড়হস্তে স্তোত্র পাঠ করিতেন, তখন বোধ হইত, দেবগণ যেন এখনই তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইবেন। পূজা সমাপন করিয়া তিনি যোগসাধনায় প্রবৃত্ত হইতেন ও একাদিক্রমে প্রায় চারি-পাঁচ ঘণ্টাকাল যোগসাধনা করিয়া আশ্রম হইতে বাহির হইতেন। এই সময়ে তিনি স্বহস্তে ডাল ও রুটী প্রস্তুত করিয়া আহার করিতেন। আহারের পর তিনি প্রায় চারি ঘণ্টাকাল বিশ্রাম ও অভ্যাগত ব্যক্তিদিগের সহিত কথোপকথন করিতেন। ইহার পর তিনি আবার যোগসাধনায় প্রবৃত্ত হইতেন। এইরূপে কিছুদিন অতিবাহিত করিবার পর তাঁহার মনে এই চিন্তার উদয় হইল যে, স্বহস্তে পাক করিয়া আহার করিতে অধিক সময় নষ্ট হয়, অতএব আহার করা ক্রমে ক্রমে পরিত্যাগ করিতে হইবে। চিন্তা ক্রমে কার্যে পরিণত করিলেন। সেই দিবস হইতে আহারের সময় রন্ধন না করিয়া প্রত্যহ কতকগুলি বিল্বপত্র বাটিয়া দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিতেন। কোন কোন দিন পঞ্চাশটি মরিচ বাটিয়া বস্ত্রখণ্ডে ছাঁকিয়া কিঞ্চিৎ জল মিশ্রিত করিয়া পান করিতেন, কখনো কখনো বা নিরম্বু উপবাস দিতেন। এইরূপে কয়েক বৎসর কাল অতিবাহিত করিয়া প্রয়াগের মাঘ মেলায় ত্রিবেণীতে স্নান করিবার জন্য গমন করেন। প্রয়াগ যাত্রা-কালে প্রেমাপুরে গিয়া জননীর নিকট দুই-একদিন অবস্থিতি করেন এবং গমনকালীন তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যান। প্রয়াগ হইতে প্রত্যাগমন করিয়া আশ্রমস্থ কুটীর সংস্কার ও যোগসাধনের জন্য পূজা-গৃহের নিম্নে একটি গুহা নির্মাণ করেন। গুহা নির্মিত হইলে, তিনি প্রথমে এক দিন, ক্রমে দুই-তিন দিন করিয়া সপ্তাহ অবধি তাহাতে বাস করিতে আরম্ভ করিলেন। গুহায় অবস্থানকালে তিনি এক যোগসাধন ব্যতীত,

পূজার্চনা বা পানাহার কিছুই করিতেন না। এই সময় হইতে লোকে ইঁহাকে পওহারী বাবা* বলিয়া ডাকিত।

পওহারী বাবা সাধারণ সন্ন্যাসীদিগের ন্যায় অঙ্গে ভস্মলেপন করিতেন না; কিংবা মস্তকে জটাভার ধারণ করিতেন না। কেশরাশি সর্বদা পরিষ্কার করিয়া মস্তকের সম্মুখে চূড়ার আকারে নিবদ্ধ করিয়া রাখিতেন। পরিধানে কৌপীন ও তদুপরি মলিদার ঝুল (আলখেল্লা) চরণাবধি আবৃত থাকিত।

কিছুদিন এইরূপ ভাবে থাকিয়া তিনি আর একবার উপদেষ্টার উদ্দেশে গিরনার পর্বতে যাইবার জন্য বাধ্য হইলেন; কিন্তু অযোধ্যায় গিয়া কোন সাধুর নিকট অবগত হইলেন যে, গিরনার পর্বতের সেই সিদ্ধপুরুষ উত্তরাখণ্ডে দেহত্যাগ করিয়াছেন। সাধুর নিকট এই সংবাদ পাইয়া তিনি আর অগ্রসর হইলেন না। অযোধ্যার কোন বৈষ্ণব-সম্প্রদায়স্থ সাধুর নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন।

এই সময় হইতে তিনি আর কুটীরের বাহিরে আসিতেন না, কেবল বৎসরান্তে একদিন মাত্র যে দিন রথের টান হইত, সেই দিন আশ্রম হইতে বাহির হইয়া রথের সহিত কিছুদূর হাঁটিয়া যাইতেন। কিছুকাল পরে আর রথের সময়ও কুটীরের বাহিরে আসিতেন না, কুটীরের দ্বারে আসিয়া রথ দেখিতেন। দূরদূরান্তর হইতে যে সকল নরনারী তাঁহাকে দেখিবার জন্য বা উপদেশ গ্রহণের জন্য আসিতেন, প্রতি একাদশী তিথিতে তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য সময় নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন।

বহুদিন হইতে সূর্যালোকবিহীন ও নির্বাত স্থানে অবস্থান করায় তাঁহার দেহ পুষ্পের ন্যায় কোমল এবং দেহের সুন্দর বর্ণ তুষারের ন্যায় শুভ্র হইয়া গিয়াছিল। কয়েক বৎসরকাল পরে তিনি পুনরায় রেলপথে প্রয়াগের কুম্ভমেলায় ত্রিবেণীতে স্নান করিবার জন্য গমন করিয়াছিলেন। তথায় ত্রিবেণীর তীরে সামান্য পর্ণকুটীরে কয়েকদিন অবস্থান করায় প্রখর সূর্য-কিরণের উত্তাপে ও তীব্র হিম বায়ুস্পর্শে তাঁহার দেহের চর্ম উঠিয়া যাইতে লাগিল এবং কাসির সহিত বুকে সর্দি বসিয়া এমন স্বরভঙ্গ হইয়া গেল যে, তাঁহার কথা কহিবার শক্তি রহিল না। প্রতিদিন জ্বর হইতে লাগিল এবং সেই সঙ্গে কোমল দেহের চর্ম উঠিয়া যাইতে লাগিল। আশ্রম-পার্শ্ব-নিবাসী কতকগুলি পরিচিত দরিদ্র ব্রাহ্মণ তাঁহাকে ঔষধ সেবনের জন্য পীড়াপীড়ি করেন, কিন্তু পওহারী বাবা তাঁহাদের কথা হাসিয়া উড়াইয়া দেন। অবশেষে ব্রাহ্মণদিগের কথা রক্ষা করিবার জন্য তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন, 'আপনারা আমাকে কি ঔষধ দিবেন, লইয়া আসুন।' আরো তিনি বলিলেন, 'আপনারা কি কেবল দাসকে ঔষধ দিবেন, পথ্য দিবেন না?' পওহারী বাবার কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণেরা অতি আনন্দিত হইয়া অর্থসংগ্রহ করিয়া পথ্যের জন্য ক্ষীরের উৎকৃষ্ট দ্রব্যসকল ও ঔষধ আনিয়া দেন। যিনি সামান্য দুগ্ধ ও বিল্বপত্র ব্যতীত আর কিছুই আহার করেন না, তিনি যখন নিজে চাহিয়া খাইতেছেন, তখন কি যাহা কিছু সামান্য খাদ্য দেওয়া যায়? সেই জন্য ব্রাহ্মণেরা অর্থ ভিক্ষা করিয়াও তাঁহাকে উত্তম উত্তম দ্রব্যসকল আনিয়া দেন। পওহারী বাবা ঐ সকল দ্রব্য অতি যত্নপূর্বক একখানি বস্ত্রখণ্ডে বাঁধিয়া লইয়া আপনার ইচ্ছামত স্থানে গমন করেন। পওহারী বাবা ঐ সকল দ্রব্য আহার করেন কি না, তাহা দেখিবার জন্য ঐ ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে দুই-চারি

* পওহারী পবন আহারী অথবা পয় (দুগ্ধ) আহারী শব্দের অপভ্রংশ

জন তাঁহার অলক্ষ্যে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করেন। তাঁহারা দেখেন, পওহারী বাবা এক নির্জন স্থানে উপস্থিত হইয়া সমস্ত মিষ্টান্ন ও ঔষধ গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করিয়া অন্য এক দিকে চলিয়া গেলেন। পওহারী বাবার এই অন্যায় কার্য দেখিয়া তাঁহাদের অত্যন্ত ক্রোধ জন্মে এবং তাঁহারা মনে মনে এই কথা বলেন, 'এমন করিয়া গরীবদিগের পয়সা নষ্ট করিবার কি প্রয়োজন ছিল ?' পরদিন প্রত্যূষে পওহারী বাবা পর্ণকুটীরে আসিবামাত্র সকলেই তাঁহার কার্যের নিন্দা করেন। নিন্দা শুনিয়া পওহারী বাবা যোড়হস্তে অতি বিনীত ভাবে বলেন, 'বাবা সকল, কেন দাসের প্রতি বিমুখ হইয়াছেন, দাস কোন অপরাধ ত করে নাই। আপনারা ঔষধ ও পথ্য যাহা ভোগের জন্য দিয়াছিলেন, দাস তাহা রোগকেই দিয়াছে, দেখুন আর দাসের রোগ নাই।' ব্রাহ্মণগণ দেখিয়া আশ্চর্য হইলেন যে, পওহারী বাবার দেহে আর কোন রোগ নাই ; বিষম স্বরভঙ্গ রোগ, তাহাও সারিয়া গিয়াছে। তিনি প্রয়াগে স্নান করিয়া পদব্রজে প্রেমাপুরে আসিয়া জননীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। এবার আর গৃহে প্রবেশ করিলেন না, নিকটস্থ একটি উদ্যানে এক দিবস থাকিয়া নিজ আশ্রমে চলিয়া আসেন।

সাধুসেবা ও সদাব্রত

পওহারী বাবা কৈশোরাবস্থা হইতে সাধু, সন্ন্যাসী ও অতিথিদিগের সেবায় আপনাকে নিয়োজিত রাখিয়া জীবনের শেষ দশা পর্যন্ত তাহা পালন করিয়াছিলেন। তাঁহার এই আজ্ঞা ছিল, যে কেহ আশ্রমে আসিবে, যেন অভুক্ত না ফিরিয়া যায়। তিনি তাঁহার শিষ্য নন্দকুমারকে এই সদাব্রতের ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। ইহার পনের বৎসর পরে পওহারী বাবার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গঙ্গারাম এই কার্যের ভার গ্রহণ করেন।

লছমীনারায়ণের সময় চাষীরা অগ্রহায়ণ ও চৈত্র মাসে প্রতি লাঙ্গলে পাঁচ সের করিয়া শস্য আশ্রমে পাঠাইয়া দিত এবং গ্রাম্য জমিদারেরাও অর্থসাহায্য করিতেন, কিন্তু সে সময়ে সদাব্রত ছিল না। তিনি বৎসরান্তে ঐ সকল সঞ্চিত অর্থ ও শস্য দীনদুঃখীদিগকে বিতরণ করিতেন। পওহারী বাবাও ঐরূপ শস্য ও অর্থ প্রাপ্ত হইতেন, কিন্তু তিনি সদাব্রতের অনুষ্ঠান করায় ঐ শস্য ও অর্থে সঙ্কুলান হইত না। ঐ সময়ে ভাগীরথীদেবী আশ্রমের পাদদেশ দিয়া প্রবাহিত না হইয়া, পরপারের কূলভঙ্গ করিতেছিলেন, সুতরাং আশ্রমের দিকে চর উৎপন্ন হইতেছিল। যাহার গৃহ গঙ্গার কূলে অবস্থিত, ঐ চর তাহারই প্রাপ্য। পওহারী বাবার কার্যাধ্যক্ষ ঐ চর প্রাপ্ত হইয়া তাহাতে চাষ করিতে লাগিলেন। শস্যও প্রচুর উৎপন্ন হইতে লাগিল। এইরূপে শস্য প্রাপ্ত হইতে থাকায়, সদাব্রতের কার্য নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইতে লাগিল।

পওহারী বাবার সদাব্রত ক্রমে দেশবিখ্যাত হইতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে সাধুসন্ন্যাসী ও রাহীলোকদিগের সমাগমও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বিস্তর লোকসমাগমে পাছে পওহারী বাবার যোগসাধনে ব্যাঘাত ঘটে, সেই জন্য কার্যাধ্যক্ষ আশ্রম হইতে কিছু দূরে কয়েক-খানি পর্ণকুটীর নির্মাণ করাইয়া দেন। একদিবস একজন বিষম উন্মত্ত ব্যক্তি আশ্রমে আসে। সে পওহারী বাবাকে মারিবার জন্য একখণ্ড কাষ্ঠ লইয়া, কটুবাক্য প্রয়োগ করিতে করিতে আশ্রমস্থ গুহার মধ্যে প্রবেশ করিতে উদ্যত হয়। আশ্রমস্থ অন্যান্য ব্যক্তিগণ তাহার এইরূপ ব্যবহার দেখিয়া, আশ্রম হইতে বাহির করিয়া দিবার জন্য তাহাকে টানাটানি করে, পাগলও বিকট চীৎকার করিতে থাকে। পওহারী বাবা সেই

সময়ে হোম করিতেছিলেন। তাঁহার হোম-ক্রিয়া সমাপ্ত হইলে তিনি হোমগৃহ হইতে বাহিরে আসিলেন এবং উন্মাদকে তাঁহার কাছে আসিতে বলিলেন। সে বিষম উন্মাদ, পাছে পওহারী বাবার প্রতি কোনরূপ অত্যাচার করে, এই আশঙ্কায় কয়েকজন তাহার হাত-পা ধরিয়া রহিল। পওহারী বাবা স্থিরদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ উন্মাদের চক্ষের উপর দৃষ্টিস্থাপন করিলেন, পরে বলিলেন, 'উঁহাকে ছাড়িয়া দাও, উনি অতি সাধু ব্যক্তি।' সেই সময় হইতে তাহার উন্মত্ততা একেবারে দূর হইয়া যায়। সে যে পাগল ছিল, ইহা তাহার মনে হয় নাই।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে পওহারী বাবার দীক্ষাগুরুর আশ্রমের একজন সন্ন্যাস-ভেকধারী ব্যক্তি ইঁহার আশ্রমে আসিয়া পওহারী বাবার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলে, 'তুমি না সাধু, তুমি না যোগী, তবে তুমি এখনও মায়া ছাড়িতে পারিতেছ না কেন? তুমি এখনও কেন মায়ায় লিপ্ত রহিয়াছ? তোমার ঠাকুরের গায়ে স্বর্ণালঙ্কার রহিয়াছে, উহা তোমার কি আবশ্যক? উহা আমায় প্রদান কর।' ভেকধারী সন্ন্যাসীর কথা শুনিয়া পওহারী বাবা বলিলেন, 'বাবা! আপনার যদি উহা লইবার ইচ্ছা হইয়া থাকে, আপনি উহা গ্রহণ করুন।' সন্ন্যাসী পুনরায় বলিলেন, 'তুমি এই ধন, রত্ন ও শস্যাদিপূর্ণ আশ্রমের মায়া পরিত্যাগ করিতে পারিতেছ না কেন? আমি বলিতেছি, তুমি এই মুহূর্তে এই স্থান পরিত্যাগ কর।' সন্ন্যাসীর কথা শুনিয়া পওহারী বাবা বলেন, 'বাবা, যদি আমি এখন এই আশ্রম পরিত্যাগ করি, তাহা হইলে তোমার মনোভিলাষ সিদ্ধ হইবে না। কারণ, আশ্রমস্থ ব্যক্তিগণ আমার গমনে বাধা-প্রদান করিবে। অতএব আপনি রাত্রি আগমন পর্যন্ত প্রতীক্ষা করুন।' ক্রমে রাত্রি সমাগত হইলে পওহারী বাবা ঘোর নিশীথ-সময়ে কুটীরের দ্বারে চাবি বন্ধ করিয়া, চাবিটি উক্ত সন্ন্যাসীকে দিয়া আশ্রম পরিত্যাগ করেন। পরদিবস প্রত্যুষে আশ্রমের দ্বারে কুলুপ দেওয়া রহিয়াছে দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইল এবং উক্ত সন্ন্যাসীকে অপরাধী জানিয়া তাহাকে প্রহার করিবার উদ্যোগ করিল। সন্ন্যাসী মনে করিয়াছিল, আশ্রমটি সে নিজে অধিকার করিবে; কিন্তু প্রহার খাইবার ভয়ে শীঘ্রই আশ্রম পরিত্যাগ করিল।

এ দিকে মুহূর্তমধ্যে চারিদিকে পওহারী বাবার আশ্রম-ত্যাগের সংবাদ প্রচার হইয়া গেল। অনেকেই তাঁহার অনুসন্ধানের জন্য বাহির হইলেন, কিন্তু কেহই কোন সন্ধান পাইলেন না। প্রায় এক বৎসরকাল বহু অনুসন্ধানের পর আজিমগড়ের পণ্ডিত রামাচারীজী ব্রহ্মপুরে গিয়া তাঁহাকে আশ্রমে লইয়া আসেন। পওহারী বাবা আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া জগন্নাথক্ষেত্রাভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। তিনি পথিমধ্যে পীড়িত হইয়া অভিলষিত স্থানে পৌঁছিতে পারেন নাই, মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত ব্রহ্মপুরে অবস্থান করিয়াছিলেন। একজন সাধুহৃদয় বাঙালী জাহ্নবী-তীরে তাঁহাকে একখানি কুটীর নির্মাণ করিয়া দেন এবং প্রাণপণ যত্নে তাঁহার সেবা করেন। পওহারী বাবা সেই কুটীরে থাকিয়া সাধন-ভজন করিতেন।

১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের আষাঢ়ী-পূর্ণিমায় এক বৃহৎ যজ্ঞের আয়োজন হয়। ভক্তিমান্ গ্রাম্য জমিদারগণ এবং নগরবাসী সম্ভ্রান্ত লোকেরা অনেকেই ঘৃত, ময়দা, চিনি প্রভৃতি ও প্রচুর অর্থ সাহায্য করেন। ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান তীর্থ হইতে অনেক সাধু, সন্ন্যাসী, পরমহংস ও দরিদ্র ব্যক্তিগণ ঐ যজ্ঞে আগমন করেন। যাঁহার যাহা ইচ্ছা, যাঁহার যাহা প্রয়োজন, তদুপযুক্ত ভাবে সকলকে যত্নের সহিত সেবা করা হয়। এই

মহাযজ্ঞ প্রায় একমাস কাল অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

নির্বাণ

এক দিবস পওহারী বাবা গভীর নিশীথ সময়ে গঙ্গাস্নান করিয়া নির্জনে নদী-কূলে যোগক্রিয়া করিতেছিলেন। দৈবযোগে তাঁহার যোগক্রিয়ায় ব্যাঘাত ঘটে। যোগে ব্যাঘাত ঘটিবামাত্রই তাঁহার শরীর অসুস্থ হইয়া পড়ে। তাঁহার কি অসুখ, তাহা জানিবার জন্য অনেকে অনেকবার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি কোন কথাই প্রকাশ করেন নাই।

বঙ্গাব্দ ১৩০৫ সালের জ্যেষ্ঠ মাসের ৭ই তারিখের প্রাতঃকালে পওহারী বাবার ভ্রাতা এবং ভ্রাতুষ্পুত্র বদরিনারায়ণ, বারাণসী কলেজের পণ্ডিত ভাগবতাচারী, পণ্ডিত জনার্দন প্রভৃতি পাঁচ ছয়জন ব্যক্তি আশ্রমে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা দেখিলেন, আশ্রম-মধ্যস্থ কুটীর হইতে ধূম নির্গত হইতেছে। উঁহারা মনে করিয়াছিলেন, উহা হোমের ধূম। পরে যখন দেখিলেন, শুভ্র মেঘের ন্যায় ধূমরাশি উত্থিত হইতেছে এবং সমস্ত ঘরে অগ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছে, তখন তাঁহারা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। বদরিনারায়ণ বিশেষ বিবরণ জানিবার জন্য কুটীরের উপর উঠিয়া দেখিলেন, সমস্ত ঘরই জ্বলিতেছে। তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন এবং করযোড়ে বলিলেন, 'মহারাজ! অগ্নি-নির্বাণ করিতে অনুমতি দিন।' এই সময়ে পওহারী বাবা একবার তাঁহার মুখের দিকে ফিরিয়া কি ইঙ্গিত করিলেন, বদরিনারায়ণ তাহা বুঝিতে পারিলেন না। বদরিনাবায়ণেব চীৎকার শুনিয়া পওহারী বাবার প্রিয়সেবক ভৃগুনাথ এবং অন্যান্য দুই একজন কুটীরের উপর আরোহণ করিলেন। তাঁহারা দেখিলেন, তাঁহার সদ্যঃস্নাত আর্দ্র কেশরাশি আলুলায়িত হইয়া পৃষ্ঠদেশ আবৃত করিয়া পড়িয়া রহিয়াছে, সেই তপ্তকাঞ্চননিভ অঙ্গে ঘৃত বিলেপিত রহিয়াছে, পরিধানে কুশরজ্জুসংযুক্ত কৌপীন। তিনি হোমকুণ্ডের সম্মুখে কম্বলের আসনে উত্তরমুখ হইয়া পদ্মাসনে* যোগে মগ্ন রহিয়াছেন এবং তাঁহার পবিত্র দেহ অগ্নিশিখায় দগ্ধ হইতেছে। হস্তের সম্বল 'আশা'** নিকটে পড়িয়া রহিয়াছে, চতুর্দিকে ঘৃতের কলস, কর্পূরের ভাণ্ড, ধূপ, ধুনা প্রভৃতি হোমের দ্রব্যসকল সজ্জিত রহিয়াছে। বদরিনারায়ণ, ভৃগু প্রভৃতি সেবকগণ নির্বাক নিষ্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। দেখিতে দেখিতে মহাযোগীর ব্রহ্মরন্ধ্র বিদীর্ণ হইয়া গেল।

---

* পদ্মাসন দুই প্রকার ;—মুক্ত-পদ্মাসন ও বদ্ধ-পদ্মাসন। মুক্ত-পদ্মাসন—প্রথমত বাম উরুর উপর দক্ষিণ পদ ও বাম হস্ত উত্তান করিয়া রাখিবে এবং দক্ষিণ উরুর উপর বাম পদ ও দক্ষিণ হস্ত উত্তান করিবা নাসিকাগ্রে দৃষ্টি সংস্থাপন করিয়া দন্তমূলে জিহ্বা রাখিবে। পরে চিবুক ও বক্ষঃস্থল উন্নত করিয়া যথাশক্তি অল্পে অল্পে বায়ু পূরণ করিবে এবং ঐ পূরিত বায়ুকে রোধ করিয়া রেচক করিবে, ইহারই নাম মুক্ত-পদ্মাসন।

বদ্ধ-পদ্মাসন—বাম উরুর উপর দক্ষিণ পদ ও দক্ষিণ উরুব উপর বাম পদ সংস্থাপন করিযা দুই হস্ত পৃষ্ঠদেশ দিয়া লইয়া আসিযা দুই পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি দৃঢ়রূপে ধারণ করিবে। পরে চিবুক ও বক্ষঃস্থল উন্নত করিয়া এবং নাসিকাগ্রে দৃষ্টি সংস্থাপন করিয়া কুম্ভক করিবে, ইহাকে বদ্ধ-পদ্মাসন বলে।

** কাষ্ঠের যোগদণ্ড! যোগিগণ দিবারাত্র সমভাবে বসিয়া থাকিবার পর ক্লান্তি বোধ করিলে এইরূপ ( ) আকৃতির কাষ্ঠদণ্ডের উপর হস্ত রাখিয়া বিশ্রাম করিয়া থাকেন, ঐ বিশ্রাম-দণ্ডের নামই 'আশা'।

শ্রীরূপ ও সনাতন গোস্বামী

১৩০৩ শকে কর্ণাট দেশে সর্বজ্ঞ নামে একজন রাজা ছিলেন। তিনি ভরদ্বাজ গোত্রোদ্ভব যজুর্বেদীয় ব্রাহ্মণ। তিনি এগার বৎসর মাত্র রাজ্যশাসন করিয়া কালের হস্তে জীবন সমর্পণ করেন। সর্বজ্ঞের একমাত্র পুত্র অনিরুদ্ধ; পিতার মৃত্যুর পর ১৩১৪ শকে তিনি কর্ণাটের অধীশ্বর হন। অনিরুদ্ধের দুই পুত্র;—জ্যেষ্ঠর নাম রূপেশ্বর এবং কনিষ্ঠের নাম হরিহর। ১৩৩৮ শকে অনিরুদ্ধের মৃত্যু হয়। পিতার শ্রাদ্ধকার্যাদি সমাপন করিয়া রাজ্যশাসন লইয়া দুই ভ্রাতায় ঘোর বিবাদ উপস্থিত হয়। রূপেশ্বর যুদ্ধে পরাজিত হইয়া স্ত্রী-পুত্রাদিসহ গৌড় দেশের রাজার নিকট গমন করেন। গৌড়ের রাজা, অনিরুদ্ধের বন্ধু ছিলেন, সেই জন্য তিনি রূপেশ্বরকে সাদরে গ্রহণ করেন। ১৩৫৫ শকে রূপেশ্বরের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র পদ্মনাভ গৌড়ের মন্ত্রিত্ব পদ লাভ করেন। তিনি ৬৯ বৎসর বয়সে মন্ত্রিত্ব পদ ত্যাগ করিয়া, গঙ্গা-তীরে বাস করিবার জন্য গৌড়েশ্বরের অধীন নৈহাটী গ্রামে আগমন করেন। পদ্মনাভের পাঁচ পুত্র;—পুরুষোত্তম, জগন্নাথ, নারায়ণ, মুরারী এবং মুকুন্দ। মুকুন্দের পুত্র—কুমার। কুমারের পুত্র—সনাতন, রূপ* ও বল্লভ।

সনাতন বিদ্যাবুদ্ধিতে বঙ্গদেশের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। শ্রীরূপও সনাতনের মত ছিলেন। সনাতন বিদ্যাবাচস্পতি মহাশয়ের নিকট শিক্ষা লাভ করিয়া শ্রীরূপকে শিক্ষা দিতেন। শ্রীরূপের গুরু ছিলেন সনাতন। সনাতন গুরুর নিকটে যাহা শিক্ষা করিতেন, তাহাই রূপকে শিখাইতেন।

১৪১১ শকাব্দ হইতে ১৪৩৪ শকাব্দ পর্যন্ত, সৈয়দ হুসেন শা নামক জনৈক যবন গৌড়ের সিংহাসনে সমারূঢ় ছিলেন। তিনি সনাতন ও রূপের বিদ্যাবত্তার ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাইয়া তাঁহাদিগকে স্বীয় রাজসরকারে নিযুক্ত করেন। তাঁহারা ক্রমশঃ স্ব স্ব গুণে পাতসাহের প্রিয় পাত্র হইতে থাকেন। পাতসাহ সনাতনকে সাকর মল্লিক এবং শ্রীরূপকে দবীর খাস** এই উপাধি প্রদান করিয়া মন্ত্রিপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। উপাধি প্রদানকালীন রূপ ও সনাতন দুইটি বৃহৎ ভূসম্পত্তি জায়গীরস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ম্লেচ্ছের সংস্রবে যাইয়া তাঁহারা ম্লেচ্ছ হইয়াছেন, এই অনুমান করিয়া সমাজের নেতৃগণ তাঁহাদিগকে সমাজচ্যুত করেন। তখনকার লোকের প্রকৃতি অনুরূপ ছিল। তখন স্ব ইচ্ছায় কেহই ম্লেচ্ছসংস্পর্শে আসিত না, আসিলেই সমাজে নিন্দিত হইত, এমন কি, নেতৃগণ সমাজ হইতে তাহাদিগকে তাড়াইয়া পর্যন্ত দিতেন। তবে পাতশাহের ভয়ে

---

* এরূপ জনশ্রুতি আছে যে, শ্রীচৈতন্যদেব রূপ ও সনাতন নাম দিয়াছিলেন। ইঁহাদের পিতৃদত্ত নাম অমর ও সন্তোষ।

** সাকর অর্থে জ্ঞানবান্ এবং মল্লিক অর্থে শ্রেষ্ঠ বা মর্যাদাশীল। দবীর খাস অর্থে উত্তম লেখক। শ্রীরূপের হস্তাক্ষর অতি সুন্দর ছিল। চৈতন্যদেব শ্রীরূপের অক্ষরের প্রশংসা করিয়া বলিয়াছিলেন যে, 'শ্রীরূপের অক্ষর যেন মুকুতার পাঁতি।'

কার্যের ভার গ্রহণ করিতে হইত, নচেৎ রক্ষা ছিল না। কেবল প্রাণের ভয়ে ও অত্যাচারের ভয়ে রূপ ও সনাতন রাজকার্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা আপনাদিগকে ম্লেচ্ছসংস্পর্শী জানিয়া হীনজ্ঞানে সততই সঙ্কুচিত থাকিতেন। তখনকার লোকেরা বলিতেন, ম্লেচ্ছ-বিদ্যা-প্রাপ্ত, ম্লেচ্ছ-শিক্ষিত, ম্লেচ্ছ-ভাবাম্বিত হিন্দু-ম্লেচ্ছ, যবন-ম্লেচ্ছ হইতেও অধম। হিন্দুর আচার লইয়াই হিন্দুয়ানী। তখনকার সমাজ হিন্দুয়ানী-বিবর্জিত হিন্দুদিগকে সমাজচ্যুত করিতেন, কিন্তু এখন আর সে কাল নাই। এখন অনেকেই হিন্দুর আচার মানিতে কোন ক্রমে প্রস্তুত নহেন। হিন্দু হইয়াও তাঁহারা ঘোরতর ম্লেচ্ছাচারে সর্বদাই রত। যথেচ্ছ আহার করিয়া এবং হিন্দু-নিয়মের বিপরীত কার্য করিয়াও হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জিত হন না। বৈষ্ণবগণ পূর্ণ ম্লেচ্ছাচারসম্পন্ন হইয়াও বৈষ্ণব-সমাজের অগ্রণী হইতে বিশেষ সচেষ্ট। অখাদ্য ও যবনের পাক খাইয়াও তাঁহাদের বৈষ্ণবতা নষ্ট হয় না, নিজ হস্তে পাখি মারিয়া রন্ধন করিয়া খাইলেও বৈষ্ণবতা বজায় থাকে। এখন আর সমাজের কোন ক্ষমতা নাই। এখন ক্ষমতা কেবল ঐশ্বর্যের। যাঁহাদের অর্থ আছে, তাঁহাদেরই এখন জাত আছে, তাঁহারা অতি ম্লেচ্ছ হইলেও হিন্দু-সমাজেব প্রধান নেতা হইয়া থাকেন। মহামহোপাধ্যায় ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ তাঁহার বাটীতে আহার কবিয়া আপনাকে কৃতকৃতার্থ মনে করিয়া থাকেন। উঃ, কালের কি পরিবর্তন!

যে সময়ে শ্রীচৈতন্যদেব ভারতের নানাস্থান পর্যটন করিয়া বৈষ্ণব-ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন, যে সময়ে সৎ, অসৎ, ধনী, দরিদ্র, পণ্ডিত, মূর্খ প্রভৃতি শত সহস্র হিন্দু ও মুসলমান তাঁহার মুখ-নিঃসৃত সুমধুর হরিনাম শ্রবণ করিবার জন্য আকুল থাকিত, সেই সময়ে রূপ ও সনাতন, চৈতন্যদেবের মহিমা অবগত হইয়াছিলেন। তাঁহারা চৈতন্যদেবের গুণগরিমা শুনিয়া অবধি তাঁহার সহিত সম্মিলিত হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু রাজকার্যের প্রতিবন্ধকতাহেতু অভিলাষ পূর্ণ করিবার সময় পাইতেন না। এক দিবস শ্রীরূপ আপনার এবং সনাতনের মনের অবস্থা একখানি পত্রে লিখিয়া মহাপ্রভুর নিকট পাঠাইয়া দেন। চৈতন্যদেব ঐ পত্রখানি পাঠ করিয়া তাঁহাদের মনের অবস্থা বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং উভয় ভ্রাতার সান্ত্বনার জন্য এক শ্লোক রচনা করিয়া পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। সেই শ্লোকটি এই—

'পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্মসু।
তদেবাস্বাদয়ত্যন্তর্নবসঙ্গরসায়নম্॥'

'পরাধীনা (কুলবতী) রমণী গৃহকর্মে নিযুক্তা থাকিয়াও যেমন নব-সঙ্গের রস মনে মনে আস্বাদন করে, সেইরূপ বিষয়কর্মে ব্যাপৃত থাকিয়াও তোমরা ঈশ্বরের চরণ-চিন্তা করিবে।'

চৈতন্যদেবের উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া রূপ ও সনাতনের প্রাণ নূতন ভাবে আন্দোলিত হইতে লাগিল। এক দিবস নিশীথসময়ে যখন মুষলধারে বৃষ্টি পতিত হইতেছিল, মেঘের গর্জনে চারিদিক বিকম্পিত হইতেছিল, প্রবল ঝড়ে বড় বড় গাছসকল মড় মড় শব্দে ভাঙিয়া পড়িতেছিল, পথে জন-প্রাণীর যাতায়াত ছিল না, ঠিক সেই সময়ে শ্রীরূপ নবাবের কার্যে আহূত হইয়া ঐ ভীষণ রাত্রিতে কোন এক পথ দিয়া যাইতেছিলেন। যে সময়ে তিনি একঘর দারিদ্র-প্রপীড়িত, পর্ণকুটীরবাসী ধীবরের কুটীর-পার্শ্ব দিয়া যাইতেছিলেন, সেই সময়ে ধীবর-পত্নী জল ভাঙিয়া যাওয়ার ছপ্-

ছপ্‌ শব্দ শুনিতে পাইল। স্ত্রীলোক স্বভাবতঃই ভীতা ; সে ঐ শব্দ শুনিয়া স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল, 'এই দুর্যোগে এত রাত্রে কে বাহির হইয়াছে ?' ধীবর বলিল, 'এ সময়ে কুকুর ভিন্ন আর কে যাইবে।' ধীবর-পত্নী বলিল, 'না, এ দুর্যোগে কুকুরও ঘরের বাহির হয় না। আমার বোধ হয়, কোন ধনী লোকের চাকর হইবে।' ধীবর-পত্নীর কথা শুনিয়া শ্রীরূপের চৈতন্য হইল। অর্থলোভে বশীভূত হইয়া, রাজগৌরবে স্ফীত হইয়া, আমি কিনা পশু অপেক্ষাও অধম বৃত্তি অবলম্বনে জীবিকানির্বাহ করিতেছি। এই চিন্তাতে তাঁহার মন আলোড়িত হইতে লাগিল। এই চিন্তাতেই তাঁহার বৈরাগ্যের উদয় হইল। তিনি রাজবাটী হইতে ফিরিয়া আসিয়া সনাতনের নিকট সকল কথা ব্যক্ত করিলেন।

শ্রীচৈতন্যদেব নীলাচল হইতে শান্তিপুরে আসিবার সময় রামকেলিতে আসিয়াছিলেন। ঐ সময়ে রূপ ও সনাতনের সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। তাঁহারা মহাপ্রভুর মুখে ভক্তিতত্ত্ব ও প্রেমসাধনের বিষয় শ্রবণ করিয়া বৈরাগ্যানলে দগ্ধ হইতে লাগিলেন। মানসম্ভ্রম, ধনসম্পত্তি এবং পদগৌরব কিছুতেই আর তাঁহাদিগের মনের শান্তিবিধান করিতে পারিল না। তাঁহারা মহাপ্রভুর সহিত 'কানাইনাটশাল' নামক স্থান পর্যন্ত গমন করিলে, চৈতন্যদেব তাঁহাদিগকে প্রত্যাগমন করিতে বলেন। তাঁহারা বাটীতে প্রত্যাগত হইয়া শাস্ত্রালোচনায় দিনপাত করিতে লাগিলেন।

এক দিবস শ্রীরূপ শুনিলেন যে, গৌরাঙ্গদেব বৃন্দাবনে গিয়াছেন। তখন তিনি সমস্ত ধনসম্পত্তি ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব ও কুটুম্বদিগকে বিভাগ করিয়া দিয়া, স্বীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা বল্লবসহ প্রয়াগে আসিলেন। ঐ সময়ে মহাপ্রভু প্রয়াগ-তীর্থের কোন দেবালয়ে ভাবরসে মত্ত হইয়া নৃত্য ও সংকীর্তন করিতেছিলেন। বহুসংখ্যক ব্যক্তি হতচেতন হইয়া তাঁহার সুমধুর হরিনাম শ্রবণ করিতেছিল। ঐ সময়ে রূপ এবং বল্লভ তৃণগুচ্ছ দন্তে করিয়া দূর হইতে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। মহাপ্রভু দূর হইতে তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইয়া আদর করিয়া উভয় ভ্রাতাকে নিকটে বসাইলেন এবং সনাতনের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীরূপ প্রয়াগ হইতে সনাতনকে একখানি পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন। ঐ পত্রে গৌরাঙ্গের বৃন্দাবনে অবস্থিতি, আপনার গৃহত্যাগাদির সংবাদ এবং বণিকের নিকট গচ্ছিত দশ সহস্র মুদ্রার বিষয় লিখিত ছিল। শ্রীরূপের পত্র পাইয়া সনাতনের প্রাণ উদ্বেগ যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল, তিনি হা-হুতাশে দিবানিশি অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

সনাতন পূর্ব হইতেই বিষয়-বন্ধন ছিন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, কিন্তু সহসা কিরূপে রাজমন্ত্রিত্ব পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন, তাহার উপায় স্থির করিতে লাগিলেন। তিনি মনে করিলেন, তাঁহার কার্যে পাতসাহ অসন্তুষ্ট হইলে তাঁহাকে কার্য হইতে অপসৃত করিয়া দিবেন, তাই তিনি রাজকার্যে সম্পূর্ণ অমনোযোগিতা দেখাইতে লাগিলেন। রাজার লোক আসিলে তিনি বলিতেন, 'শরীর অসুস্থ হইয়াছে।' রাজ-বৈদ্য পরীক্ষা করিয়া জানিলেন, সকলই মিথ্যা। পাতসাহ স্বয়ং একদিন সনাতনের গৃহে উপস্থিত হইয়া প্রবোধবাক্যে অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু সনাতনের ব্যাকুল প্রাণে তাহা স্থান পাইল না। পাতসাহ দেখিলেন সনাতনকে গৃহে রাখিবার আর উপায় নাই, সেই জন্য তিনি বিষণ্ণ অন্তরে তাঁহাকে কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন।

উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্রের সহিত যখন হুসেন শার বিবাদ চলিতেছিল, কার্য-

বশতঃ এই সময়ে হুসেন শাকে দক্ষিণ-প্রদেশে যাত্রা করিতে হইল। বুদ্ধিমান্‌ ও সুচতুর মন্ত্রী সনাতনকে সঙ্গে লইয়া যাইতে তিনি মনস্থ করিলেন। সনাতন অস্বীকৃত হইয়া উত্তর দিলেন যে, 'আমি আপনার সহিত দেবতা-নিগ্রহ ও ব্রাহ্মণের উপর অত্যাচার করিতে যাইব না।' সনাতনের কথায় পাতশাহ ক্রুদ্ধ হইয়া চলিয়া গেলেন। হুসেন শাহ উড়িষ্যায় গমন করিলে, সনাতন কারারক্ষককে মিনতি করিয়া বলিল, 'দেখ ভাই! আমি এক সময়ে তোমার কত উপকার করিয়াছি, এখন তুমি তাহার প্রত্যুপকার কর; এবং তোমার সন্তানসন্ততির জলযোগের জন্য পাঁচ সহস্র মুদ্রা গ্রহণ কর।' কারারক্ষক ইহাতে অসম্মত হইল। সনাতন কি করিলেন, তিনি পুনবায় উঁহাকে বুঝাইয়া বলিলেন যে, 'তোমার কোন ভয় নাই, আমি ফকির হইয়া দেশদেশান্তরে চলিয়া যাইব, আমি আর এ দেশে থাকিব না। তুমি পাতশাহকে যাহা বুঝাইয়া দিবে, তিনি তাহাই বুঝিবেন। আমি তোমাকে আবও দুই সহস্র মুদ্রা দিতেছি।' সনাতন কারারক্ষককে এইরূপে বশীভূত করিয়া, সাত সহস্র মুদ্রা দিয়া ভৃত্য ঈশানের সহিত রজনীযোগে কারাগার হইতে পলায়ন করিলেন। ঈশানেব নিকট কয়েকটি স্বর্ণমুদ্রা থাকায় পথিমধ্যে পাতড় পর্বতের নিকট কয়েকজন দস্যু তাঁহাদের পশ্চাদনুসরণ করে। সনাতন ইহা বুঝিতে পারিয়া দস্যু-দিগকে স্বর্ণমুদ্রাগুলি প্রদান করিলেন এবং ঈশানকে প্রত্যাগমন করিতে বলিয়া, তিনি একাকী উদাসীন-বেশে বৃন্দাবনাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। এ দিকে শ্রীরূপ প্রয়াগ-তীর্থে গৌরাঙ্গের সাক্ষাৎ লাভ করিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। গৌরাঙ্গও তাঁহাব পবিত্র হৃদয়ক্ষেত্রে ভক্তি-কল্পতরুর মহাবীজ রোপণ করিয়া দিয়া তাঁহাকে বৃন্দাবন যাইবার জন্য বলিয়া দিলেন এবং স্বয়ং বারাণসীধামে চলিয়া আসিলেন।

সনাতন বৃন্দাবন যাইবার সময় একদিবস রাত্রিকালে হাজিপুরের এক উদ্যানের বৃক্ষতলে বসিয়া নামকীর্তন করিতেছেন, এরূপ সময়ে তাঁহার ভগিনীপতি হঠাৎ সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি রাজতুল্য মহিমান্বিত সনাতন মলিন বসন ও উদাসীন বেশ দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখ করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাকে গৃহে ফিরাইয়া লইয়া যাইবার জন্য কত প্রয়াস পাইলেন, কিন্তু সনাতনের মন ফিরিল না। তিনি সনাতনের শীতবস্ত্র নাই দেখিয়া শীত-নিবারণার্থ তাঁহাকে আপনার গাত্রের শাল প্রদান করিলেন, কিন্তু তিনি তাহা গ্রহণ করিলেন না। ভগিনীপতি অনেক বুঝাইয়া এবং তর্কবিতর্ক করিয়া অবশেষে তাঁহাকে একখানি ভোটকম্বল ব্যবহার করিতে সম্মত করাইলেন। সনাতন সেই ভোটকম্বলখানিতে গাত্রাচ্ছাদিত করিয়া কাশীধামে আসিয়া উপনীত হইলেন। ঐ সময়ে শ্রীগৌরাঙ্গদেব কাশীতে ছিলেন। সনাতন, গৌরাঙ্গের চরণে আশ্রয় লইবার জন্য তাঁহার বাস-ভবনের বহির্দ্বারে দন্তে তৃণধারণ করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। ভক্তপ্রিয় গৌরাঙ্গ এই সংবাদ পাইয়া সেই স্থানে আসিয়া সনাতনকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন এবং সনাতনের মস্তক মুণ্ডন ও স্নান করাইয়া দিয়া নববস্ত্র পরিধান করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু সনাতন একখানি পুরাতন বস্ত্র ভিক্ষা করিয়া লইয়া তাহাই পরিধান করিলেন। সনাতনের গাত্রে ভোট-কম্বল দেখিয়া চৈতন্যদেব মনে করিতেছিলেন, 'সনাতন আজিও বিষয়-সুখ সম্পূর্ণরূপে পরিহার করিতে সমর্থ হন নাই।' ভক্ত সনাতন, গৌরাঙ্গের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া একজন দরিদ্র ব্যক্তিকে উহা দান করিলেন। কেবল শীত-নিবারণের জন্য তিনি একখানি ছিন্ন ও মলিন কন্থা গ্রহণ

করিলেন। সনাতনের কার্য দেখিয়া মহাপ্রভু বলিলেন, 'উত্তম বৈদ্য কি কখন রোগের শেষ রাখে ?'

চৈতন্যদেব সনাতনকে দুই মাসকাল ক্রমাগত 'ভক্তি' শিক্ষা দিয়া নীলাচলে গমন করিলেন। যাইবার সময় সনাতনকে বলিয়া গেলেন, 'তুমি বৃন্দাবনে যাও, সেখানে তোমার ভ্রাতৃদ্বয় আছেন, তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ কর।' শ্রীচৈতন্যের আদেশানুসারে তিনি বৃন্দাবনযাত্রা করিলেন। সনাতন বৃন্দাবনে উপস্থিত হইয়া শুনিলেন যে, রূপ তাঁহার অন্বেষণের জন্য অন্য পথ দিয়া কাশীধামে গমন করিয়াছেন। সুবুদ্ধি রায়* সনাতনকে অতি সাদরে গ্রহণ করিলেন। সনাতন পরম বৈরাগী, তিনি সুবুদ্ধির আলয়ে দুই দিন মাত্র থাকিয়া বৃক্ষতলে আশ্রয়গ্রহণ করিলেন। তিনি প্রতিদিন বন হইতে কাষ্ঠাহরণ করিয়া বাজারে বিক্রয় করিতেন এবং সেই বিক্রয়লব্ধ অর্থের কিয়দংশ জীবন-ধারণোপযোগী আহার্যের জন্য ব্যয় করিতেন, অবশিষ্ট দীনদুঃখীকে বিতরণ করিতেন।

সনাতন বৃন্দাবনে বাস করিতেছিলেন, সেই সময়ে এক দিন তিনি যমুনায় স্নান করিতে যাইয়া একখানি বহুমূল্য মণি প্রাপ্ত হন। উহা কোন ভিক্ষুককে দান করিবার জন্য যমুনার তটে বসিয়া রহিলেন। বহুক্ষণ বসিয়া থাকিবার পর যখন তিনি কোন ভিক্ষুককে দেখিতে পাইলেন না, তখন তিনি ঐ মণি এক স্থানে রাখিয়া বালি ঢাকা দিয়া জলে অবতরণ করিলেন। স্নান করা প্রায় শেষ হইয়াছে, এরূপ

*সুবুদ্ধি রায় এক সময়ে গৌড়ের অধীশ্বর ছিলেন। সৈয়দ হুসেন খাঁ ইঁহার কর্মচারী ছিল। হুসেন খাঁ রাজকার্যে অবহেলা করিত বলিয়া সুবুদ্ধি ইঁহাকে কশাঘাত করিয়াছিলেন। চিরদিন কখন সমভাবে যায় না। ভাগ্যবিপর্যয়ে সুবুদ্ধি মুসলমানাধিপতি কর্তৃক রাজ্যচ্যুত হন এবং হুসেন খাঁ নবাব হয়। হুসেন খাঁ নবাব হইয়া কিছুদিন পর্যন্ত পূর্বতন প্রভুর প্রতি শ্রদ্ধা-সম্মান করিয়াছিল, কিন্তু তাঁহার স্ত্রী পূর্বের কথা বিস্মৃত হইতে পারে নাই। বেগম সা একদিন সেই কশাঘাতের চিহ্ন দেখাইয়া বলিল, 'এটা কিসের দাগ, তুমি জান ?' হুসেন খাঁ বলিল, 'হ্যাঁ, আমি খুব ভালরূপ জানি।' বেগম বলিল, 'তবে তুমি কেন তাহার প্রতিশোধ লইতেছ না ?' তুমি এই দণ্ডে সুবুদ্ধির প্রাণদণ্ড কর, নচেৎ আমি জলে ঝাঁপ দিয়া প্রাণত্যাগ করিব।' পত্নীর কথায় হুসেন বলিল, 'আমি উহার নিমক খাইয়াছি, সুতবাং উহার কোনরূপ অনিষ্ট করিতে পারিব না।' বেগম সাহ নিতান্ত জিদাজিদি করায়, হুসেন খাঁ সুবুদ্ধির মুখে জল ছিটাইয়া দিয়া জাতিভ্রষ্ট করিয়া দিল। সুবুদ্ধি জাতিভ্রষ্ট হইয়া সর্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া বারাণসীতে আসিলেন। তিনি তথাকার পণ্ডিতদিগের নিকট প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা চাহিলেন, তাঁহারা তাঁহাকে প্রাণত্যাগ করিতে বলেন, কিন্তু সুবুদ্ধি তাহা না করিয়া চৈতন্যের নিকট ব্যবস্থা প্রার্থনা করিলেন। চৈতন্যদেব বলিলেন, 'তুমি বৃন্দাবনে গিয়া কৃষ্ণনাম কীর্তন কর, তোমার সকল পাপের ক্ষয় হইবে। কৃষ্ণনামই মহাপাপের একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত বিধি।' সেই অবধি তিনি বৃন্দাবনে থাকিয়া অতি দীনহীন কাঙালের ন্যায় নামকীর্তন করিতে করিতে জীবন অতিবাহিত করিলেন। মথুরা-মাহাত্ম্য গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া প্রথমে তিনিই প্রকাশিত করেন।

সময়ে একজন ব্রাহ্মণ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সনাতনকে বলিলেন, 'মহাশয়! গত রাত্রে আমি স্বপ্ন দেখিয়াছি যে, আপনি আমার দরিদ্রদশা দূর করিবার জন্য আমাকে প্রচুর অর্থদান করিতেছেন। আপনি একজন ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তি এবং স্বপ্ন সময়ে সময়ে সত্য হয়, ইহা ভাবিয়া আমি আপনার নিকট আসিয়াছি। বোধ হয়, আমার আশা পূর্ণ হইবে।' সনাতন ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া বলিলেন, ঠাকুর! ঐ স্থানে বালি চাপা আপনার ধনরত্ন আছে, আপনি উহা লইয়া যান।' ব্রাহ্মণ অনেক অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কোন ধনরত্ন পাইলেন না। তখন তিনি সনাতনকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'মহাশয়! দরিদ্র ব্রাহ্মণের সহিত এত উপহাস করিলেন কেন? আপনি 'দিব না' বলিলেই আমি চলিয়া যাইতাম। ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া সনাতন কিছু দুঃখিত হইলেন এবং বলিলেন, 'ঠাকুর! আপনার অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছে, আমি গিয়া আপনাকে দেখাইয়া দিতেছি। এই বলিযা তিনি স্নান সমাপন করিযা সেই স্থানে আসিলেন। তিনি ব্রাহ্মণকে বলিলেন, 'ঠাকুর! আমি স্নান করিয়াছি, উহা আর স্পর্শ করিব না; আপনি অনুগ্রহ করিযা এই স্থানের বালিগুলি সরাইয়া আপনার ধনরত্ন গ্রহণ করুন।' ব্রাহ্মণ বালিগুলি সরাইবামাত্র সেই বহুমূল্য মণি প্রাপ্ত হইলেন। তিনি মণি পাইয়া মহোল্লাসে গৃহে গমন করিতেছেন, এমন সময়ে মনে এই চিন্তার উদয় হইল, 'এমন পদার্থ গোস্বামী আমাকে কেন দান করিলেন, নিজে রাখা দূরে থাকুক, স্পর্শও করিলেন না; কিন্তু আমি তাঁহার ঘৃণিত পদার্থ পাইয়া মহা আহ্লাদিত হইয়াছি। তিনি ইহা স্পর্শ করিলেন না কেন? অবশ্য ইহার কোন কারণ আছে। যে পদার্থ পাইয়া তিনি পৃথিবীর মণি-মুক্তাকে তুচ্ছ জ্ঞান করিতে শিখিয়াছেন, আমিও তাহা পাইতে এ প্রাণ বিয়োগ করিব।' ব্রাহ্মণ ফিরিয়া আসিলেন এবং সনাতনের নিকট ধর্মশিক্ষা করিযা নবজীবন লাভ করিলেন।

একদা কোন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত রূপ-সনাতনকে বিচারার্থ আহ্বান করিয়াছিলেন। তাঁহারা উহাতে অসম্মত হইয়া পণ্ডিতকে জয়পত্র লিখিয়া দেন। ঐ পণ্ডিত সেই জয়পত্রে জীবকে স্বাক্ষর করিতে বলেন। জীব* ব্রাহ্মণের স্পর্ধা দেখিয়া এবং গুরুর অবমাননা সহ্য করিতে না পারিয়া বলিয়াছিলেন, 'আমি বিচার করিব।' বিচারে পণ্ডিত পরাভূত হইয়া যান। শ্রীরূপ ইহা শুনিয়া জীবকে বহু ভর্ৎসনা করিয়া বলিয়াছিলেন, 'তুমি জয়-পরাজয়, মান-অপমান ত্যাগ করিয়া বৈরাগী হইয়াছ, জয়াভিলাষী সেই পণ্ডিতের নিকট পরাভব স্বীকার করিয়া, আপনি অমানী হইয়া কেন তাঁহাকে দীনতার সহিত মানদান করিলে না? জীব! তুমি এখনও বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করিবার উপযুক্ত পাত্র হও নাই।

সনাতন একবার গৌরাঙ্গদর্শনে বৃন্দাবন হইতে শ্রীক্ষেত্রে গমন করিয়াছিলেন।

জীব গোস্বামী রূপ ও সনাতনের ভ্রাতুষ্পুত্র ও বল্লভের পুত্র। সনাতনের গুরু বিদ্যাবাচস্পতি, রূপের গুরু সনাতন (রূপ জ্যেষ্ঠের নিকট হইতে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন।) আবার জীব গোস্বামীর গুরু রূপ। কিন্তু জীবের বৈদান্তিক গুরু—কাশীনিবাসী মধুসূদন বাচস্পতি মহাশয়। ইনি একজন প্রধান গ্রন্থকার। ভগবৎ ষট্-সন্দর্ভ ও লঘুতোষিণী ইঁহার প্রধান গ্রন্থ। ইনিই বৃন্দাবনের রাধা-দামোদরের মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

পথিমধ্যে তিনি অতি ঘৃণিত কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হন। তিনি নীলাচলে উপস্থিত হইয়া এই ঘৃণিত অবস্থায় চৈতন্যের সম্মুখে গমন করা অপকর্ম বিবেচনায় শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথচক্রে প্রাণত্যাগ করিবেন, ইহাই স্থির করেন। ইতিমধ্যে গৌরাঙ্গের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। সনাতনকে দেখিবামাত্রই চৈতন্যদেব ব্যগ্রতা সহকারে দ্রুতপদে অগ্রসর হইলেন। সনাতন সঙ্কুচিত হইয়া কিছু পশ্চাৎপদ হইলেন এবং বলিলেন, 'প্রভু, আমাকে স্পর্শ করিবেন না, আমি অতি নীচ, তাহাতে আবার অতি ঘৃণিত কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হইয়াছি, আমাকে ক্ষমা করুন।' কিন্তু চৈতন্যদেব তাহা না শুনিয়া তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন এবং বলিলেন, 'তোমার দেহ আমার পক্ষে অতি পবিত্র, ঘৃণা করিলে আমার ধর্ম নষ্ট হইবে।' চৈতন্যদেব দিব্যজ্ঞানপ্রভাবে সনাতনের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে ইহাও বলিলেন, 'সনাতন! তুমি দেহত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিয়াছ, কিন্তু তাহাতে কৃষ্ণকে পাইবে না। কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায় ভক্তি ও ভজন। তুমি বৃন্দাবনে যাইয়া শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলার মাধুর্য রসের আস্বাদন ও বিতরণ কর।' গৌরাঙ্গের আদেশে তিনি পুনরায় বৃন্দাবনে আসিলেন।

বৃন্দাবন হইতে কোন যাত্রী শ্রীক্ষেত্রে গমন করিলে, গৌরাঙ্গ অগ্রে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেন, 'আমার রূপ-সনাতন কেমন আছে? তাহারা সেখানে কিরূপে দিনপাত করিতেছে?' তাহারা বলিত, 'নিরাশ্রয় হইয়া তাঁহারা দুইজনে তরুতলে শয়ন করেন, ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য ভক্ষণ করেন, ছিন্ন বহির্বাস, কন্থা ও করোয়া মাত্র তাঁহাদের সঙ্গে থাকে, অষ্টপ্রহরের মধ্যে চারিদণ্ড কাল নিদ্রা যান; অবশিষ্ট সময় নামজপ, সঙ্কীর্তন এবং ভক্তিশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া থাকেন।'

সনাতন বৃহদ্ভাগবতামৃত হরিভক্তিবিলাস ও তাহার দিগ্দর্শনী নামে টীকা, লীলাস্তব এবং ভাগবতের দশম স্কন্ধের বৈষ্ণবতোষিণী নামে টীকা প্রণয়ন করেন। শ্রীরূপ ভক্তিসারমৃত, মথুরা-মাহাত্ম্য পদাবলী, হংসদূত, উদ্ধব-সন্দেশ, অষ্টাদশকচ্ছন্দঃ স্তব-মালা, উৎকলিকাবলী, প্রেমেন্দুসাগর, নাটক-চন্দ্রিকা, লঘুভাগবততোষিণী, বিদগ্ধ-মাধব, ললিতমাধব, দানকেলী ভাণিকা প্রভৃতি সুপ্রতিষ্ঠিত বহুতর গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। বিদগ্ধমাধব ১৪৪৭ শকে ও দানকেলী ভাণিকা ১৪৬৩ শকে লিখিত হয়। এই সকল গ্রন্থে ভক্ত, ভক্তি, কৃষ্ণতত্ত্ব, হরিভক্তি প্রভৃতি বৈষ্ণবদিগের নিত্যকর্তব্য অতি উত্তমরূপে বিবৃত আছে।

শ্রীরূপ ও সনাতন শ্রীবৃন্দাবনেই ইহলীলা সংবরণ করেন। বিদ্যা, পদ ও ঐশ্বর্যে গৌরবান্বিত হইয়া কী রূপে নিরভিমান, নির্লোভ, প্রেমিক এবং বৈরাগী হইতে হয়, রূপ-সনাতনই তাহার দৃষ্টান্তস্থল।

—:০:—

মৌনীবাবা

১২৬৩ বঙ্গাব্দে নদীয়া জেলার অন্তর্গত আজনুদিয়া গ্রামে পূর্ববঙ্গের সদ্গোপ বংশে মৌনীবাবা জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম শিবনাথ ঘোষ। তিনি পরম বৈষ্ণব এবং হরিভক্তিপরায়ণ ছিলেন। সাংসারিক অবস্থা তাদৃশ স্বচ্ছল না থাকায়, শিবনাথ কর্মোপলক্ষে পাবনায় গিয়া বাস করিয়াছিলেন। শিবনাথের দুই পুত্র, জ্যেষ্ঠের নাম প্যারীলাল এবং কনিষ্ঠের নাম কুঞ্জলাল। দুইটি ভাই-ই পাবনা গবর্ণমেণ্ট ইংরাজী স্কুলে অধ্যয়ন করিত। এই বিদ্যালয়েব একজন শিক্ষক ব্রাহ্ম-ধর্মাবলম্বী ছিলেন। তিনি প্যারীলালের ঈশ্বরানুরাগ এবং পবিত্র জীবন দেখিয়া তাঁহাকে সময়ে সময়ে ব্রাহ্মধর্মের উপদেশ দিতেন। তিনি বলিতেন,—

'যৌবনকালেই ধর্মশীল হইবে, কারণ, কখন মৃত্যু হইবে, কেহই জানে না। আপনাব যশঃ, পৌরুষ ও গুপ্তকথা এবং পবোপকারার্থ নিজ-কৃত কর্ম, কখন প্রকাশ করিবে না।'

'ক্ষমা দ্বারা ক্রোধকে, সাধুতাব দ্বারা অসাধুতাকে, উপকার দ্বাবা অপকারীকে এবং সত্য দ্বারা মিথ্যাকে জয় করিবে। যিনি পরস্ত্রীকে মাতৃবৎ, পরদ্রব্যকে লোষ্ট্রবৎ ও সর্বপ্রাণীকে আত্মবৎ দেখেন, তিনিই যথার্থ জ্ঞানী। সারথি যেমন অশ্ব সকলের সংযম করেন, সেইরূপ জ্ঞানী ব্যক্তি মোহময় বিষযে প্রবৃত্ত ইন্দ্রিয়সকলেব সংযমে যত্ন করিবেন।'

'পরলোকে সহায়ের নিমিত্ত, মাতা, পিতা, স্ত্রী, পুত্র, জ্ঞাতি ও বন্ধু কেহই থাকে না, কেবল ধর্মই থাকেন। মনুষ্য একাকী জন্মগ্রহণ করে, একাকী মৃত হয় এবং একাকীই স্বীয় পুণ্যের অথবা দুষ্কৃতের ফলভোগ করে। বান্ধবেরা মৃতশরীরকে কাষ্ঠলোষ্ট্রবৎ ভূমিতলে পরিত্যাগ করিয়া বিমুখ হইয়া গমন করেন, কিন্তু ধর্ম তাঁহাব অনুগামী হন। অতএব আপনার সহায়ার্থ ক্রমে ক্রমে ধর্মকে নিত্য সঞ্চয় করিবে। ধর্মের সহায়তায় জীব দুস্তর সংসার-অন্ধকার হইতে উত্তীর্ণ হয়।'

বালক দুইটির বয়স যতই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, ততই জ্ঞানলাভের সহিত ধর্মজীবনে সুলক্ষণসমূহ প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল। এই সময়ে ইঁহারা যৌবনের প্রারম্ভে প্রকাশ্যরূপে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। ব্রাহ্মধর্ম-গ্রহণ সময়ে ব্রাহ্মগণ কিরূপ প্রার্থনা করিয়া থাকেন, এই স্থানে তাহার কিঞ্চিৎ আভাষ দেওয়া গেল,—

'হে বিনীত-বৎসল দয়াময় পরমেশ্বর! আমরা সকল নরনারী তোমার চরণে আসিয়া একত্র হইলাম: কৃপাসিন্ধো, দয়া করিয়া আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও। সংসারের পাপতাপ হইতে ক্ষণকালের জন্য আসিয়া তোমার উপাসনার জন্য সকলে মিলিত হইলাম; শান্তিদাতা, আমাদের পাপদগ্ধ হৃদয়ে শান্তি প্রদান কর। দিবসের মধ্যে কতবার তোমাকে ভুলিয়া কত পাপ-চিন্তা করিয়াছি, তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে ক্ষমা কর। তুমি চিরশান্তি, হৃদয়ের ধন, জীবনসর্বস্ব, তোমাকে হৃদয়ে রাখিয়া প্রাণ-মন সুশীতল করি।'

'হে জাজ্বল্যমান প্রত্যক্ষ দেবতা। তোমার জ্বলন্ত তেজঃ চতুর্দিক উজ্জ্বল করিয়াছে, সমস্ত পৃথিবী তোমার আলোকে স্বর্ণময় হইয়াছে, বিভো, আমাদের নিকট প্রকাশিত হও। গতিনাথ, তুমি অনায়াসে অগতির গতি দিতে পার, দীনবন্ধো, আমরা অতি দীনদুঃখী, তোমার চরণে পড়িয়া কাঁদিতেছি, আমাদের সমস্ত দুঃখ দূর কর। তুমি প্রাণের প্রাণ, জীবনের জীবন, অন্তরের অন্তর, আত্মায় আত্মা, হৃদয়ের শোণিত, তুমি অন্ধের যষ্টি, অনাথের নাথ, অসহায়ের সহায়, কাঙালের ধন; ঠাকুর, দয়া করিয়া আমাদিগকে উদ্ধার কর। তোমা ভিন্ন গতি নাই। হে দীনবন্ধো! মোহ-অন্ধকারে মগ্ন হইয়া তোমাকে ভুলিয়াছিলাম, পিতঃ! আমাদিগকে সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত কর। হে প্রাণের ঈশ্বর! পৃথিবীতে ত তোমার মত বন্ধু কাহাকেও পাইলাম না। তুমি ইহকাল-পরকালের দেবতা, জীবনে-মরণে তুমিই একমাত্র সহায়। তুমি অনাদি, অনন্ত; অপার, অগম্য, ক্ষুদ্র মনুষ্য তোমার মহিমা কি বুঝিবে? কোথায় মনুষ্য কীটাণুকীট, বালুকার ন্যায় ধূলিতে পতিত, আর তুমি রাজরাজেশ্বর, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি; লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী জগৎ তোমার পদতলে ঘুরিতেছে। মা গো বিশ্বজননী! সন্তান বলিয়া আমাদের প্রতি স্নেহ-দৃষ্টিপাত কর। আর যত দিন থাকিব, তোমায় ভুলিব না, আর তোমাকে ছাড়িয়া সংসারের পাপকূপে মগ্ন হইব না। তোমার ক্রোড়ে মাথা দিয়া চিরদিন পড়িয়া থাকিব। হে কৃপাসিন্ধো! তুমি আমাদের আত্মার রক্ষক, তুমিই একমাত্র প্রেমস্বরূপ শান্তিদাতা। হে ভক্তজনসহায় মুক্তিদাতা! আর কি বলিব, দয়া করিয়া তোমার দাসদাসীগণের ক্ষুদ্র হৃদয় দিন দিন পবিত্র কর। অস্থির মধ্যে যে সমস্ত পাপ প্রবিষ্ট হইয়াছে, তাহা হইতে মুক্ত কর। হে পূর্ণানন্দ সুখময় অন্তরাত্মা, প্রাণদাতা পরমেশ্বর! তুমিই সত্য, তুমিই সত্য, তুমিই সত্য। বিশ্বময়ী জননী। সংসারের সমুদয় কোলাহল ছাড়িয়া, তোমার ক্রোড়ে বসিয়া, সংসারের দুঃখ-যন্ত্রণা ভুলিয়া গেলাম, এমন মা নিকটে থাকিতে আমরা মাতৃহীনের ন্যায় পথে পথে ভ্রমণ করি। মা! একবার প্রসন্নমুখে আমাদের দিকে চাও, আমরা কৃতার্থ হইয়া যাই। আমাদের ক্ষুধার অন্ন, পিপাসার জল, স্বহস্তে মুখে তুলিয়া দিতেছ, যখন যাহা প্রয়োজন, আয়োজন করিয়া রাখিয়াছ, মা, তোমার মুখের দিকে তাকাইলে পাষাণহৃদয়ও বিগলিত হয়। হে হৃদয়-বন্ধো! কৃপা করিয়া আশীর্বাদ কর, যেন চিরদিন আমরা তোমার শ্রীপাদপদ্মে তাপিত মস্তক রাখিয়া চিরশান্তি লাভ করিতে পারি।

হে পরম পিতা পরমেশ্বর! আমাদিগকে অন্ধকার হইতে জ্যোতিঃতে লইয়া যাও, তোমার যে অপার করুণা, তাহার দ্বারা আমাদিগকে সর্বদা রক্ষা কর।

শান্তিঃ, শান্তিঃ, শান্তিঃ।'

ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের পর হইতেই ইঁহারা হিন্দুসমাজ হইতে তাড়িত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে অর্থকষ্টও উপস্থিত হইল। প্যারীলাল কনিষ্ঠের পড়িবার খরচ চালাইবার জন্য নিজে অধ্যয়ন পরিত্যাগ করিয়া শিক্ষকতার কার্য গ্রহণ করিলেন। তিনি প্রথমে জলপাইগুড়ির বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন, পরে রঙ্গপুরের অন্তর্গত গোয়ালপুর মধ্য-ইংরাজী স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। এই কার্যে তিনি অনেক দিন ব্রতী ছিলেন।

যে সময়ে তিনি শিক্ষকতার কার্য গ্রহণ করেন, সেই সময়ে বিবাহ করিয়াছিলেন। গোপালপুরে থাকিবার সময় তাঁহার একটি ভগিনী এবং সহধর্মিণী তাঁহার নিকট বাস

করিতেন। সংসার-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াও তিনি ধর্মজীবন লাভ করিবার জন্য গভীর রাত্রিতে উঠিয়া সাধন-ভজন করিতেন। পাছে অধিকক্ষণ নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়েন, এই আশঙ্কায় তিনি একখানি বেঞ্চের উপর শয়ন করিয়া থাকিতেন। দিবারাত্রির মধ্যে ৩।৪ ঘণ্টা মাত্র নিদ্রা তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট হইত। তিনি কখনও ভাল দ্রব্য আহার করিতেন না, অতি সামান্য দ্রব্য অল্পমাত্র ভোজন করিতেন, এমন কি, সময়ে সময়ে উপবাসীও থাকিতেন। প্যারীলাল সংসারের মধ্যে থাকিয়া, সংসারের সকল কাজকর্ম সারিয়া যেটুকু সময় পাইতেন, সেইটুকু সময়ে ভাবী জীবন উন্নত করিবার জন্য চেষ্টা করিতেন।

এইরূপ সাধন, ভজন ও সংসারধর্ম অনুশীলন করিতে করিতে প্যারীলাল প্রায় বার বৎসর কাল অতিবাহিত করেন। এই সময়ে তাঁহার পত্নী সাংঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। পত্নীর মৃত্যুতে তিনি কিছু ব্যাকুল হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু ঐ ব্যাকুলতার মধ্যে তাঁহার ঘোরতর বৈরাগ্য জাগিয়া উঠিয়াছিল। তিনি বিষয়কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া নির্জনে গিয়া সাধনা করিবার মনস্থ করেন।

প্যারীলালের কোন বন্ধু, প্যারীলালের পত্নী-বিয়োগ হইয়াছে শুনিয়া, দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ করিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি বন্ধুর অনুরোধ-বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিয়াছিলেন, 'ভাই! মানুষ সর্বদা সংসার-লীলায় উন্মত্ত। সংসারের উন্নতি এবং স্ব স্ব পার্থিব উন্নতি, এই লইয়াই সর্বদা ব্যতিব্যস্ত। কিসে রাশি রাশি অর্থসঞ্চয় হইবে, কিসে সংসারের শ্রীবৃদ্ধি হইবে, কি উপায়ে মানুষের নিকট প্রশংসনীয় হইবে, এই সকল নশ্বর ভাবনায় ক্ষুদ্র মানব-জীবন অতিবাহিত করে। ধর্মের জন্য তাহাদের প্রাণে একটুও পিপাসা হয় না। ! কেবল সংসারখেলায় মজিও না। দেখিতেছ না, রিপুগণের প্রবল আক্রমণে জর্জরিত হইয়া অত্যন্ত দুর্গতি হইতেছে, কখন কামের বশবর্তী হইয়া অশেষ অনিষ্ট সাধিত হইতেছে; কখন ক্রোধের দাস হইয়া কাটাকাটি মারামারি প্রভৃতি কতই নিষ্ঠুর আচরণ সম্পাদিত হইতেছে। যখন দেখিতেছ, একটি রিপুর পরিণাম অত্যন্ত দুর্গতি, তখন কেন আর সংসারে মজিয়া রিপুর ক্রীতদাস হইয়া, বৃথা আমোদে অমূল্য সময় অতিবাহিত কর? তুমি জান, এই মুহূর্তেই মৃত্যু আসিয়া ধরিতে পারে? কোন প্রকার আপত্তি উত্থাপন করিয়া পায়ে মাথা খুঁড়িলেও সে এতটুকু অপেক্ষা করিবে না। তাই বলিতেছি, সর্বদাই ধর্মের দিকে লক্ষ্য রাখ, ধর্মের দিকে চাহিয়া প্রত্যেক কার্যে অগ্রসর হও। মিথ্যা কার্যে ঘুরিয়া, অসার বিষয়ে মাতিয়া, কেন বৃথা হৈ-চৈ করিয়া সময়টা কাটাও? নিশ্চয় জানিও, যাইতে হইবে। এই ধন, মান, যশঃ, যাহার জন্য এত কলহ, এত বিদ্বেষ, এত দলাদলি, এ সকল তখন কিছুই রক্ষা করিতে পারিবে না। যে সংসারে পদে পদে কুকাজ, কুদৃশ্য বিরাজমান, তাহা কি মানব-সুখের আধার, না দুঃখাগার? সংসার অনিত্য, সংসার ছায়াবাজী! যে সংসারে মুগ্ধ, সে ভ্রান্ত, সে ঘোর মূর্খ! আমি এত দিন ভ্রান্তির বশে থাকিয়া সংসার-সাগরে হাবুডুবু খাইয়াছিলাম, ভগবান আমায় রক্ষা করিয়াছেন। আমি আর উহাতে নিমজ্জিত হইতে চাহি না। ভাই! তুমি আর আমাকে বিবাহ করিবার কথা বলিও না, যাহাতে ভগবানকে ডাকিতে পারি, সেই বিষয়ে বরং সাহায্য কর।' প্যারীলালের জ্ঞানগর্ভ কথা শুনিয়া, তিনি আর কিছুই বলিতে না পারিয়া বন্ধুর নিকট বিদায় গ্রহণ করেন।

প্যারীলালের পত্নীবিয়োগের কিছুদিন পরে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা অধ্যয়ন পরিত্যাগ

করিয়া অর্থোপার্জন করিতে প্রবৃত্ত হন। প্যারীলাল সুযোগ বুঝিয়া কনিষ্ঠের প্রতি সকল ভারার্পণ করিয়া যোগসাধনের জন্য চিত্রকূট পর্বতে গমন করেন। প্যারীলাল নিঃসহায় অবস্থায় পড়িয়া কেবল ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার মন হিন্দু-ধর্মের জন্য ক্রন্দন করিত এবং সেই জন্যই আজ তিনি যোগসাধনের জন্য পর্বত-গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করেন।

প্যারীলাল তিন বৎসরকাল চিত্রকূট পর্বতে যোগাভ্যাস করিয়া ওঁকারনাথ পর্বতে* গমন করেন। ওঁকারনাথ পর্বত সাধনার একটি প্রশস্ত স্থান। ইহা প্রকৃতিদেবীর রম্য কানন বলিয়া অনেক সাধুসন্ন্যাসী তথায় গিয়া বাস করেন। প্যারীলাল ওঁকারনাথে একটি মনোমত স্থান নির্দিষ্ট করিয়া লইয়া তথায় তপস্যা করিতে প্রবৃত্ত হন। এক বৎসরকাল তিনি স্বল্পাহারে ও অনাহারে, নিদ্রায় ও অনিদ্রায়, রৌদ্রে ও বৃষ্টিতে থাকিয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে আসন পরিত্যাগ করিয়া উঠিতে প্রায় কেহই দেখিতে পাইত না। তাঁহার এইরূপ কঠোর যোগসাধন দেখিয়া তৎস্থানীয় লক্ষ্মীনারায়ণ শেঠ নামক একজন ব্যবসায়ী তাঁহার জন্য ঐ পাহাড়ের গাত্রে একটি সুন্দর গুম্ফা নির্মাণ করিয়া দেন। প্যারীলাল ঐ গুম্ফার মধ্যে আসন স্থাপন করিয়া পূর্বাপেক্ষা আরও দৃঢ়তার সহিত সাধনা করিতে থাকেন। এই সময় হইতে তিনি মৌনব্রত অবলম্বন করেন। পাছে তাঁহার নিকট লোক-সমাগম হয়, এ আশঙ্কায় তিনি প্রায় গুহার বাহির হইতেন না। তিনি কখন কোন্ সময়ে শৌচ-কার্যাদি সমাধা করিতেন, তাহা সহজে দৃষ্টিগোচর হইত না। প্রায় ছয়মাসকাল এইরূপে অতিবাহিত হইলে, তিনি জনসমাজে 'মৌনীবাবা'** বলিয়া পরিচিত হন।

মৌনীবাবার গুহায় দ্রব্যসামগ্রীর মধ্যে তিনটি পিত্তলের ঘটি, একখানি চর্ম এবং একটি পাথরের নোড়া ছিল। চর্মে বসিতেন, কখনও শয়ন করিতেন। শয়নসময়ে ঐ পাথরের নোড়াটি শিয়রে দিতেন।

মৌনীবাবার সাক্ষাৎলাভের জন্য সময়ে সময়ে তাঁহার গুম্ফার দ্বারে ভীষণ জনতা হইত। ঐ জনতাকারীদিগের মধ্যে কেহ উৎকট রোগ শান্তির জন্য, কেহ অর্থকৃচ্ছ্রের প্রতিকারাকাঙ্ক্ষায়, কেহ গুপ্ত স্বার্থসিদ্ধির জন্য কেহ বা শিষ্য হইবার আশায় আসিতেন। অনেকে আশাতীত ফললাভ করিয়া বিশেষ উপকৃত হইয়াছেন। পূর্বোক্ত ব্যবসায়ী

এই পর্বত বিন্ধ্যগিরির একটি অংশ, বর্তমান খাণ্ডোয়া জেলার অন্তর্গত। এই স্থানে ওঁকারনাথ নামক মহাদেব স্থাপিত আছেন।

মৌনব্রত অর্থাৎ বাক্‌সংযম, সত্য-সাধনেরই আনুষঙ্গিক। অধিক বাক্য বলিলে প্রায় মিথ্যা বা বৃথা বাক্য হয়। সেইজন্য কার্যক্ষেত্রে যথাসম্ভব অল্প বাক্য প্রয়োগ করা কর্তব্য। মৌনাবলম্বন করিলে অনেক সময় মিথ্যার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় এবং মনেরও শক্তি বর্ধিত হয়। এই জন্যই পূর্বকালে মুনিরা মৌনব্রত অবলম্বন করিতেন। ফলতঃ বাগিন্দ্রিয়ের দমন অত্যন্ত সুফলপ্রদ। যাঁহারা মৌনব্রত গ্রহণ করেন, তাঁহাদের অধিক বাক্য বলিবার শক্তি ও প্রবৃত্তি উভয়ই নষ্ট হয়। তাহাতে প্রধানতঃ দুইটি মহৎ ফললাভ হয়। প্রথমতঃ মনের বিচারশক্তি বৃদ্ধি পায়; দ্বিতীয়তঃ নীচসংসর্গ বা পাপসংসর্গ হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। মৌনব্রত যোগ-সাধনের একটি প্রধান অঙ্গ।

আপনার মুখে বলিয়াছেন, 'আমি অতি দরিদ্র ছিলাম, যে দিন হইতে আমি মৌনীবাবার শুভদৃষ্টিতে পতিত হইয়াছি, সেই দিন হইতে আমার উন্নতি আরম্ভ হইয়াছে। মৌনীবাবাই আমার ধনৈশ্বর্য্যের মূল।' ওঁকারনাথের মোহান্ত বলিয়াছিলেন, 'আমি এ জীবনে কত সাধু সন্ন্যাসী দেখিয়াছি, কিন্তু মৌনীবাবার মত সাধু একজনও দেখি নাই।'

মৌনীবাবা নিজের শরীরের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া কঠিন অপেক্ষা কঠিনতর যোগসাধনা করিতে থাকেন। বোধ হয়, তিনি ইহা একবারও ভাবিয়া দেখেন নাই যে, শরীরকে অগ্রে রক্ষা করা আবশ্যক। তিনি প্রতিদিন এক পোয়া দুগ্ধ এবং এক ছটাক বিল্বপত্রের রস পান করিয়া থাকিতেন। যে শরীর-রক্ষার জন্য প্রচুর খাদ্যের প্রয়োজন, সেই শরীর কি কখন এক পোয়া দুগ্ধ এবং এক ছটাক বিল্বপত্রের রসে রক্ষিত হয়? কাজেই তাঁহার শরীর ক্রমশঃ শুষ্ক হইয়া কঙ্কালে পরিণত হইয়া আসিল। তিনি আর পৃথিবীতে থাকিলেন না। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ৩৭ বৎসর বয়সে মৌনীবাবা শান্তিদাতা পরমেশ্বরের শান্তিময় ক্রোড়ে মাথা রাখিয়া যোগাসনে চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হন।

—ঃ০ঃ—

লোকনাথ ব্রহ্মচারী

১১৩১ বঙ্গাব্দে বা ইহার কিছু অগ্রপশ্চাৎ সময়ে পশ্চিমবঙ্গে* ব্রাহ্মণকুলে লোকনাথ ব্রহ্মচারীর জন্ম হইয়াছিল। ইনি দশ বৎসর বয়স পর্যন্ত গ্রাম্য পাঠশালায় পাঠাভ্যাস করিয়া, সংস্কৃত ও ব্যাকরণ শিক্ষার জন্য গুরুগৃহে গমন করেন।** ঐ সময়ে ইঁহার উপনয়ন কার্য সমাপ্ত হয়। লোকনাথের শিক্ষা ও দীক্ষা গুরুর নাম ভগবানচন্দ্র গাঙ্গুলী। ভগবান ষড়্‌দর্শনে অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন।

উপনয়নের পর লোকনাথ কয়েক বৎসরকাল গুরুগৃহে শাস্ত্রালোচনা করিয়া গুরুর সহিত জন্মভূমি পরিত্যাগ করেন। বেণীমাধব বন্দ্যোপাধ্যায় নামক এক ব্যক্তি উঁহাদিগের সহযাত্রী হন। ভগবানচন্দ্র দুইজন শিষ্য লইয়া কালীঘাটে আসেন। ঐ সময়ে কালীঘাট জঙ্গলময় ছিল। অনেক সাধু-সন্ন্যাসী ঐ জঙ্গলে আসিয়া যোগসাধনা করিতেন। কালীঘাটের জঙ্গলে থাকিয়া ভগবানচন্দ্র শিষ্যদ্বয়কে কঠোর ব্রহ্মচর্য ব্রতানুষ্ঠান করাইতে লাগিলেন।

এরূপ জনশ্রুতি আছে যে, লোকনাথ ব্রহ্মচর্যাবস্থায় তাঁহার বাল্যসখীকে স্মরণ করিয়া তাঁহার ব্রহ্মচর্যের ফল নষ্ট করিতেন। ভগবানচন্দ্র লোকনাথের এই বিষয় জানিতে পারিয়া শিষ্যদ্বয়কে লইয়া দেশে ফিরিয়া আসেন এবং যে স্থানে তাঁহার বাল্যসখী বাস করিতেন, তথায় অবস্থান করিতে থাকেন। ভগবানচন্দ্র অনুসন্ধান দ্বারা জানিতে পারেন যে, লোকনাথের বাল্যসখী বাল্যাবস্থায় বিধবা হইয়া তাহার চরিত্র কলুষিত করিয়া ফেলিয়াছে। ভগবান সুযোগ বুঝিয়া সেই বিধবা বাল্যসখীকে লোকনাথের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে বলেন। ভগবানের কথায় সে সম্মত হয়। যখন লোকনাথের স্ত্রী-সম্ভোগজনিত লালসায় বিতৃষ্ণা জন্মাইল, তখন তাঁহাদের গুরুদেব উঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া সেই স্থান পরিত্যাগ করেন।

ভগবানচন্দ্র ব্রহ্মচারীদ্বয়কে নক্তব্রত, একান্তরা, পঞ্চাহ, নবরাত্রি, মাসাহ প্রভৃতি ব্রতসকল উদ্‌যাপন করাইয়া মনঃসংযম করাইয়াছিলেন। দীর্ঘকালব্যাপী এইরূপ ব্রত অনুষ্ঠান করায় ব্রহ্মচারীদ্বয় জাতিস্মরতা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন, 'আমি পূর্বজন্মে বর্ধমান জেলায় বেড়ুগ্রামে সীতানাথ বন্দোপাধ্যায় নামক ব্যক্তি ছিলাম।' পরীক্ষার দ্বারা জানা গিয়াছে, তাঁহার কথা সম্পূর্ণ সত্য।

ভগবানচন্দ্র লোকনাথ ও বেণীমাধবকে লইয়া নানাস্থান ভ্রমণ করিয়া কাশীতে আসিয়া উপস্থিত হন। এ স্থানের মণিকর্ণিকার ঘাটের উপর যোগাবলম্বনে তিনি

* বহু অনুসন্ধানেও ইঁহার জন্মস্থানের প্রকৃত নাম জানিতে পারি নাই।

** পূর্বকালে ব্রাহ্মণ-সন্তানেরা গুরুগৃহে থাকিয়া বিদ্যাভ্যাস করিতেন। গুরুদেব ছাত্রদিগকে আহার, বাসস্থান ও পরিধান-বস্ত্রাদি দিয়া আপন সন্তানের ন্যায় প্রতিপালন করিতেন। এখনও কোন কোন স্থানে সংস্কৃত টোলে এরূপ নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায়।

দেহত্যাগ করেন। মর্ত্যধাম পরিত্যাগ করিবার পূর্বে তিনি তাঁহার শিষ্যদ্বয়কে ত্রৈলিঙ্গ স্বামীর হস্তে সমর্পণ করিয়া যান।

লোকনাথ ও বেণীমাধব স্বামীজীর নিকট কিছুকাল যোগশিক্ষা করিয়া যোগসাধনার জন্য হিমালয়ের কোন নিভৃত স্থানে গমন করেন। ঐ স্থানে তাঁহারা কয়েক বৎসরকাল কঠোর যোগসাধনা করিয়া সিদ্ধ হন। মহাপুরুষদ্বয় পর্বত-শৃঙ্গ হইতে অবতরণ করিয়া প্রথমে চন্দ্রনাথে আসেন। বেণীমাধব চন্দ্রনাথ হইতে কামাখ্যাভিমুখে প্রস্থান করেন এবং লোকনাথ নিম্নভূমি বারদী গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হন।

ঢাকা জেলার নারায়ণগঞ্জ মহকুমার অধীন মেঘনা নদীর তীরে বারদী গ্রাম অবস্থিত। তিনি বারদীতে আসিয়া অবস্থান করিয়াছিলেন বলিয়া তত্রত্য ব্যক্তি সকল তাঁহাকে বারদীর ব্রহ্মচারী বলিত, ক্রমে তিনি ঐ নামেই খ্যাত হন।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, লোকনাথ ব্রহ্মচারী জাতিস্মর ছিলেন। ইহা ব্যতীত তিনি জীবাত্মাকে আপনার দেহ হইতে বাহির্গত করিতে পারিতেন। জীবজন্তুর মনের ভাব বুঝিতে পারিতেন। অন্যের রোগ নিজ শরীরে আনিয়া রোগীর রোগ দূর করিতে পারিতেন। তিনি ইচ্ছামত অন্যের মনোগত ভাব জানিতে পারিতেন।

১২৯৭ সালের ১৯শে জ্যেষ্ঠ বেলা সাড়ে দশ ঘটিকার সময়ে লোকনাথ ব্রহ্মচারী যোগাবলম্বনে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার ভক্তবৃন্দের মধ্যে অনেকে বলেন যে, লোকনাথের দেহত্যাগের দুই এক মাস পূর্বে বারদী নিবাসী কোন ব্যক্তি ক্ষয়কাস রোগে মরণাপন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহার আত্মীয়েরা ঐ রোগ ব্রহ্মচারীকে গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করে। ঐ রোগে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, তিনি ইহা জানিয়া ঐ রোগীকে রোগমুক্ত করিতে অস্বীকার করেন। কিন্তু রোগীর আত্মীয়দিগের কাকুতি-মিনতি ও সাধ্য-সাধনাতে তিনি রোগীকে ঐ রোগ হইতে মুক্ত করেন। যদিও রোগী ক্ষয়কাস রোগের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন বটে, কিন্তু অন্য রোগ আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করে এবং দুই চারি মাসের মধ্যে তিনি ভবের খেলা সাঙ্গ করেন।

এ দিকে ব্রহ্মচারীর দেহে ক্ষয়কাসরোগ প্রবেশ করিয়া তাঁহার প্রাণনাশের চেষ্টা করিতে লাগিল। মহাপুরুষ যখন বুঝিলেন, এখন তাঁহার জীবনধারণ কেবল কষ্টের কারণ, তখন তিনি যোগাবলম্বনে দেহত্যাগ করেন।

—:০:—

সাধুবচন সংগ্রহ বা শত উপদেশ

১। অন্ন-জল নিয়মিতরূপে আহার করিলে, রক্ত হইয়া দেহ ক্রমে যেমন বলবান্ হইতে থাকে, তেমনি ঈশ্বরের বাক্য অর্থাৎ সাধু মহাজনদিগের উপদেশসকল গ্রহণ করিয়া পালন করিলে, আত্মা বলবান্ হইতে থাকে।

২। রোগসকলের আরোগ্যার্থ যেমন শ্রীশ্রীঈশ্বর কৃপা করিয়া, নানা ঔষধি সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই প্রকার পাপ হইতে মুক্ত হইবার নিমিত্ত, তাঁহাব পবিত্র বাক্য রহিয়াছে। তাঁহার আজ্ঞাসকল গ্রহণ করিয়া পালন, তাঁহাকে আরাধনা ও সাধনা এবং মন দিয়া তাঁহাকে প্রেম কবিলে, পাপ হইতে অবশ্যই মুক্ত হওয়া যায়।

৩। বক্ত ভাল থাকিতে থাকিতে চিকিৎসা কর, বক্ত মন্দ হইলে আর দেহের রক্ষা নাই। আব ভাল চিকিৎসকের ব্যবস্থা না হইলে, যেমন দেহ-রক্ষা হয় না, তেমনি এক্ষণে সময় থাকিতে থাকিতে পবিত্র মহাজনদিগেব উপদেশসকল গ্রহণ করিয়া পালন না করিলে পাপ হইতে কেহ মুক্ত হয় না।

৪। সাবধান হও, যেন রোগেব উপর কুপথ্য না হয়, তাহা হইলে আর দেহের রক্ষা নাই, সেই প্রকাব পাপ জানিয়া পাপ কবিলে আর আত্মার নিস্তার নাই।

৫। সকল শিশুসন্তান মাতাব হস্ত কিংবা অঞ্চল ধরিয়া চলিলে, তাহাদেব যেমন কোনও ভয় থাকে না, তেমনই যদি আমবা অজ্ঞান শিশুর মত হইয়া আমাদের স্বর্গস্থ পবম-পবিত্র পিতাব কথাব বশে অর্থাৎ তাঁহার আজ্ঞানুযায়ী চলি, তাহা হইলে আর আমাদের কোন বিপদ কিংবা ক্লেশ ও পাপ ঘটিতে পারে না।

৬। সাধু পবিত্রাত্মাদেব উপদেশসকল গ্রহণ কর। তাঁহাদের পথে চলিলে সাধুও পবিত্র হইতে পারিবে। তাঁহাদের সাহায্য বিনা কেহ সিদ্ধ হইতে পারে নাই এবং সদ্‌গুরু ভিন্ন অন্য কেহ ধর্মের পথ দেখাইতে পারেন না।

৭। আত্মা ও দেহেব তত্ত্ব না করিলে ধর্মাধর্ম এবং পাপপুণ্যের বোধ হয় না, সত্যে ধর্মের উৎপত্তি, দয়াতে বৃদ্ধি, ক্ষমাতে স্থিতি এবং লোভেতে বিনাশ।

৮। ধর্মের একই পথ, বড়ই দুর্গম এবং সঙ্কীর্ণ, অনেকেই প্রবেশ করিতে চেষ্টা পায়, কিন্তু ঈশ্বরের কৃপা বিনা কেহ দেখিতে এবং যাইতে পাবে না। তাঁহার কৃপা যাহাতে হয়, তাহা সকলের অগ্রে চেষ্টা করা অতি আবশ্যক এবং কর্তব্য।

৯। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য এই ষড়্‌রিপুকে জয় এবং মনকে বশীভূত না করিলে ও বৈরাগ্য-পথের পথিক না হইলে, ধর্মের পথ কেহ দেখিতে পায় না।

১০। সাধু, পাপী, নাস্তিক, ধনী এবং দুঃখী সকলকে সময় হইলে দেহ রাখিয়া যাইতে হইবে। জন্মিলে মৃত্যু অবশ্যই আছে, ইহার আর সন্দেহ নাই, কিন্তু কোথায় যাইতে হইবে, তাহা অনেকেই জানিয়াও জানিতেছে না, ঐশ্বর্যের অহঙ্কারে উন্মত্ত হইয়া মনে করিয়াছে যে, আমার এইরূপ সময় চিরস্থায়ী থাকিবে, আর আমাকে যাইতে হইবে না; কিন্তু যখন কাল উপস্থিত হইবে এবং মৃত্যুশয্যাতে শয়ন করিতে হইবে, তখন ধন,

ঐশ্বর্য এবং পরিবারসকল কোথায় পড়িয়া থাকিবে এবং কোথায় যাইতে হইবে, তাহা জানিতে পারিবে। অতএব এক্ষণে সময় থাকিতে থাকিতে আপনার আপনার যাইবার পথ চেনা এবং জানা অতি আবশ্যক।

১১। অন্ন, মিষ্টান্ন, ফল, বস্ত্র, ধন, কড়ি ফুল ও চন্দন দিয়া পূজা ও আরাধনা করিলে যে তাঁহাকে পাওয়া যায়, তাহা নয়, তিনি এই সকল দ্রব্য চান না, কেবল মন চান ; অতএব মনকে স্থির করিয়া ভক্তিপুষ্প দিয়া তাঁহাকে পূজা, আরাধনা এবং সাধনা করিলে অবশ্যই তাঁহাকে পাওয়া যায়।

১২। টাকা কড়িতে দেহের রোগের প্রায়শ্চিত্ত হয়, কিন্তু পাপ রোগের প্রায়শ্চিত্ত হয় না। এ রোগের ঔষধ কেবল পাপকে ঘৃণা করিয়া নিয়ত শ্রীহরির আরাধনা, সাধনা এবং তাঁহার নামামৃত পান।

১৩। মৃত্যু ধার্মিকদিগের বন্ধু এবং পাপীদিগের কালস্বরূপ। পাপীরা মৃত্যুকে ভয় করে, আর সাধকেরা মৃত্যুকে ক্রমে ক্রমে ক্রমে জয় করেন।

১৪। অগ্নির দ্বারা যেমন স্বর্ণ পরীক্ষিত হয়, ইহকালে নানাবিধ ঘটনা দ্বারা মানুষ তেমনই পরীক্ষিত হইয়া থাকে।

১৫। অদ্য তুমি স্বীয় জীবনের পাপ ও দুর্বলতা স্বীকার করিলে বটে, কিন্তু যাহা স্বীকার করিলে, হয় ত কল্য আবার তুমি তাহাই করিবে।

১৬। অনন্ত কালের সম্বল নিত্যধনের জন্য চেষ্টা না করিয়া, ক্ষণস্থায়ী ঐহিকের সুখে প্রমত্ত থাকা অসারতামাত্র।

১৭। অন্তরে শুদ্ধ এবং স্বাধীন থাক, কোন সৃষ্ট বস্তুর সহিত আপনাকে জড়িত করিও না। অন্তরে বিবেক উজ্জ্বল না হইলে, মানুষ নিরাপদে আনন্দ উপভোগ করিতে পারে না।

১৮। অন্যের প্রতিপত্তিলাভ ও উন্নতি এবং আপনার অসম্মান ও অবনতি দেখিয়া দুঃখিত হইও না।

১৯। অন্যের নিকটে যদি সহিষ্ণুতার আশা কর, তবে অন্যের প্রতিও সহিষ্ণু হও।

২০। অনেক ক্ষুদ্রচেতা লোক বলিয়া থাকে যে, দেখ, ঐ লোকটি কেমন সুখী, উনি কত ধনী, কেমন সম্ভ্রান্ত ও মহৎ ব্যক্তি ; কিন্তু একটু বুঝিয়া দেখিলে, জানিতে পারিবে যে, সংসারের সম্পত্তিরাশি অকিঞ্চিৎকর, অস্থায়ী, ভারজনক এবং দুঃখ-উৎপাদক। ঐহিক সম্পত্তির অধিকারী হইলে মানুষ সুখী হয় না।

২১। অনেক প্রকার আকাঙ্ক্ষা আমাদের মনে উদিত হইয়া আমাদিগকে বলপূর্বক নানাদিকে চালনা করে ; ইহাতে আমাদিগকে সময়ে সময়ে বিপদে পড়িতে হয়, সুতরাং উহা দমনের চেষ্টা করা উচিত।

২২। অপরিমিত ব্যয় কখনও করিও না। অপরিমিত ব্যয় করিলে আজীবনে দুঃখকষ্ট মোচন হয় না, বরং দিন দিন দরিদ্রতা বৃদ্ধি ও সঙ্গের সাথী হয়, অবশেষে ঋণজালে জড়িত হইয়া সর্বস্বান্ত হইতে হয়।

২৩। অমুক কেন কষ্ট পায়, অমুক কেন সুখভোগ করে, অমুকের বা কেন এত উন্নতি ইত্যাদি বিষয়ে চিন্তা বা তর্কবিতর্ক করিও না। এই সকল বিষয় মানব-বুদ্ধির অতীত। ঈশ্বরের অভিসন্ধির নিগূঢ়তত্ত্ব জানিবার মানুষের অধিকার নাই।

২৪। গালাগালি ও অপমান সহ্য করিতে না পারিলে রাগ দমন করা যায় না।

২৫। আত্মীয় ব্যক্তির সহিত কখনও দেনা-পাওনা সম্বন্ধ রাখিও না।

২৬। আপনাকে অন্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিও না। তুমি ত জান না, তাঁহার সন্তানমণ্ডলীর মধ্যে কোন্ স্থান লাভ করিবে।

২৭। আমরা অন্যকে নির্দোষ দেখিতে চাই, কিন্তু স্বীয় দোষ সংশোধন করি না।

২৮। আপনার উপর নির্ভর না করিয়া, ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর স্থাপন করিও, তুমি স্বীয় কর্তব্যসম্পাদনে ব্রতী হইলে, ঈশ্বর তোমার সেই শুভ ইচ্ছা সম্পাদনে সহায় হইবেন।

২৯। আমাদের মন এমনই দুর্বল যে, শীঘ্রই কলঙ্কিত হইত যায়। কথা বলিবার পরে অনেক সময় এরূপ মনে হয় যে, 'হায় যদি নীরব থাকিতাম, যদি লোক-সমাজে না যাইতাম, আলোচনায় যোগ না দিতাম, তাহা হইলে বড়ই ভাল হইত।'

৩০। আমরা যে কখনও কখনও দুঃখ পাই, তাহা ভাল ; কেননা, তদ্দ্বারা আত্ম-পরীক্ষার সুযোগ উপস্থিত হয়।

৩১। আমরা যে পরব্রহ্ম হইতে শান্তিলাভ করিতে পারি না, তাহার কারণ এই যে, আমরা অনুতাপিত হইয়া শান্তি অন্বেষণ করি না, এই পৃথিবীর অসার সুখের মায়া ত্যাগ করি না।

৩২। ইচ্ছামত কাজ করিতে না পারিলে কখনও দুঃখিত হইও না ; কারণ, ইচ্ছামত কাজ করিতে এ পৃথিবীতে কয়জন পারে ?

৩৩। ঈশ্বর-প্রেম ও ঈশ্বর-সেবা ভিন্ন এ সংসারে আর সকলই অসার। ঈশ্বর যাহাকে রক্ষা করেন, মানুষ তাহার প্রতিকূলাচরণ করিয়া কিছুই করিতে পারে না।

৩৪। উদ্দেশ্য উচ্চ রাখিবে ; কিন্তু চক্ষু নিম্নদিকে রাখা চাই।

৩৫। উচ্চাভিলাষী হইও না। ভগবান যখন যে অবস্থায় রাখেন, সেই অবস্থাকে সুখকর মনে করিবে। উচ্চাভিলাষী লোক কোনদিনও সুখী হয় না।

৩৬। ঊর্ধ্বে দৃষ্টি রাখিয়া কার্য করিও, মনে শান্তি পাইবে।

৩৭। এমন সময় আসিবে, যখন তুমি স্বীয় জীবন সংশোধনের জন্য সময় ভিক্ষা করিবে ; কিন্তু তাহা তুমি পাইবে কি না সন্দেহ।

৩৮। ঋণ করিয়া শুভাশুভ কোন কার্য করিও না। ঋণ-পাপ বড় ভয়ানক। ঋণীকে কেহ বিশ্বাস করে না এবং ঋণী ব্যক্তি কখনও মনে শান্তি পায় না।

৩৯। এরূপে জীবনযাপন কর, যেন মৃত্যুসময়ে মনোমধ্যে কোনরূপ অনুতাপ না আসে।

৪০। ঐহিক সুখের জন্য কাহারও মনে কষ্ট দিও না, কারণ, ঐহিক সুখ ক্ষণেকের জন্য।

৪১। কর্তব্য পালন করিতে কখনও ভুলিও না।

৪২। কখনও অসত্যের পূজা করিও না।

৪৩। কখনও ছোট লোক ও নীচ অন্তঃকরণবিশিষ্ট লোকের সেবা করিও না।

৪৪। কখনও স্ত্রীজাতির প্রতি অন্যায় ব্যবহার করিও না। স্ত্রীলোকেই গৃহের লক্ষ্মী ও শোভা। স্ত্রী সম্পদে বিপদে, সুখে দুঃখে, সুস্থতায় অসুস্থতায়, জীবনে মরণে, সকল অবস্থায় সকল সময়ে তুল্য অধিকারিণী।

৪৫। কার্যস্রোতে পড়িয়া যদি কখনও তোমার প্রবৃত্তি উত্তেজিত এবং অন্তঃকরণ

ক্রোধান্ধ, অশান্ত, গর্বিত বা হিংসাপরতন্ত্র হয়, তাহা হইলে কোন নির্জন স্থানে বসিয়া করযোড়ে ঈশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা করিবে যে, হে প্রভু, তোমার দাসকে শাসনে রাখ।

৪৬। কাহারও কোন বিপদ দেখিলে প্রাণপণে তাহা হইতে তাহাকে উদ্ধার করিতে চেষ্টা করিবে।

৪৭। ক্রোধকে সংবরণ করিতে চেষ্টা করিবে, ক্রোধই মানবের এক প্রধান শত্রু। ক্রোধান্বিত হইয়া মানুষ না করিতে পারে, এমন দুষ্কার্যই নাই। ক্রোধ উপশম হইলে মনকে অনুতাপানলে দগ্ধ করে ও যন্ত্রণা দেয়।

৪৮। কাহারও সহিত তর্ক করিও না। কারণ, তর্ক করিতে করিতে পরস্পরের মধ্যে বিবাদ ঘটিতে পারে। যদি একান্ত আবশ্যক বোধ হয়, অগ্রে ক্ষমা চাহিয়া লইয়া নিজের বক্তব্য মিষ্টভাবে বুঝাইয়া দিবে।

৪৯। কাহারও গলগ্রহ হইয়া থাকিও না। নিজে নানাপ্রকার কষ্ট ও পরিশ্রম করিয়া শাক অন্ন খাওয়া ভাল, তত্রাচ কাহারও গলগ্রহ হইয়া কালিয়া পোলাও ভক্ষণ করা উচিত নয়।

৫০। কুসংসর্গ পরিত্যাগ করিও। কথাও আছে, 'সাধুসঙ্গে স্বর্গে বাস, আর অসৎসঙ্গে সর্বনাশ।'

৫১। কোন কার্য কঠিন বলিয়া মনে করিও না, বা অবহেলা করিও না, একাগ্রচিত্তে চেষ্টা করিলেই তাহা সফল হইতে পারে।

৫২। কেহ তোমার অনিষ্ট করিলে বা তোমার প্রতি অন্যায় ব্যবহার করিলে বেদনা পাও এবং শাস্তি প্রদান করিলে উৎসাহান্বিত হও ; কিন্তু তুমি কতজনের প্রতি অন্যায় ব্যবহার করিয়া থাক, তাহা একবারও ভাবিয়া দেখ না।

৫৩। গুরুজনের প্রাণে কখনও আঘাত দিও না। গুরুজনের প্রাণে আঘাত দিলে কেহ কখনও সুখী হইতে পারে না।

৫৪। চেষ্টা ও পরিশ্রম দ্বারা আমি এত উন্নতি করিয়াছি, এরূপ বলা বা মনে করা কেবল মূর্খতার পরিচয় মাত্র ; কারণ, দেব-প্রসাদ ব্যতীত, দৈব-বল ভিন্ন, তোমার কিছুই করিবার ক্ষমতা নাই। কথায় বলে—'মানুষের অভিপ্রায়, বিধি নিয়ত খণ্ডায়।'

৫৫। তোমার কোনো গুণ থাকিতে পারে, কিন্তু অন্যের আরও অধিক আছে, ইহা ভাবিয়া নম্রতা অবলম্বন করা কর্তব্য।

৫৬। দ্বেষ, হিংসা, পরনিন্দা কখনও করিবে না। সাধারণতঃ দেখা যায়, লোকে পরনিন্দা ও পরচর্চা করিতে যেমন আমোদ পায়, এমন আর কিছুতেই পায় না। যিনি ঐ সমস্ত রিপু দমন করিয়াছেন, তিনিই সাধু পুরুষ ও জগতের পূজ্য।

৫৭। দুষ্ট লোকের মিষ্ট কথায় মুগ্ধ হইয়া আপন কার্য ভুলিও না।

৫৮। দৈনিক কার্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে প্রভু পরমেশ্বরকে স্মরণ করিবে।

৫৯। দৃশ্যজগতের প্রতি অনুরাগ হইতে মনকে ফিরাইয়া অদৃশ্য সচ্চিদানন্দময় রাজ্যে লইয়া যাইবার জন্য সাধনা কর।

৬০। ধন, সম্পদ্ কিংবা পরাক্রমশালী বন্ধুদিগকে পাইয়া গর্ব করিও না ; যিনি ঐ সকল দান করিয়াছেন, সেই পরম পিতার মহিমা ঘোষণা কর।

৬১। ধনীদিগের তোষামোদ করিও না এবং প্রতিভাশালী ব্যক্তিদিগের নিকট সহজে গমন করিও না।

৬২। ধার্মিকতার বেশ ব্যবহার করা কিছুই কষ্টকর নহে ; কিন্তু কুরীতি এবং পাপ পরিত্যাগ করা বড়ই কঠিন।

৬৩। নিয়ত ঈশ্বর-সেবাতে নিয়োজিত থাক। নিয়ত স্মরণ কর যে, পরমেশ্বরের সেবা করিবার জন্যই তুমি ইহসংসারে আসিয়াছ।

৬৪। পবিত্র চরিত্রে বাস করিবে। চরিত্রবান্ লোক, সকলের নিকট আদরণীয় ও ঈশ্বরের প্রিয়পাত্র হয়।

৬৫। পরধনের প্রত্যাশা করিও না। আপনার অবস্থার উপর সন্তুষ্ট থাকিয়া প্রাণপণে উন্নতির চেষ্টা করিবে।

৬৬। পরের ত্রুটি এবং দুর্বলতা সহ্য কর। তোমারও অনেক দোষ আছে, তাহা অন্যকে সহ্য করিতে হয়।

৬৭। প্রাণের কথা কাহাকেও বলিও না। কারণ, আজ যিনি তোমার বন্ধু আছেন, কাল তিনি তোমার শত্রু হইতে পারেন।

৬৮। পরশ্রীতে কাতর হইও না। পরশ্রীতে কাতর হওয়া বড় অধর্মের কথা। যে পরশ্রীতে কাতর হয়, সে কোন দিনও শান্তি পায় না ; চির জীবন দুঃখানলে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরে।

৬৯। পরিবারবর্গের প্রতি সর্বদা সদ্ব্যবহার করিবে। সকলের দোষ, ত্রুটি ও আবদার অকাতরে সহ্য করিবে। যে সংসারে কর্তার সহ্যগুণ নাই, সে সংসার কোন দিনই সুখের ও শান্তির আবাসস্থল হয় না।

৭০। মাতাপিতাকে সর্বতোভাবে সুখী করিতে চেষ্টা করিবে। মাতাপিতাকে শ্রদ্ধা ভক্তি করিলে, ভগবানের প্রিয়-কার্য সাধন করা হয় ও ইহকাল ও পরকালে সে সুখ-শান্তিতে বাস করে।

৭১। পৃথিবীর সকল মহাজনই দুঃখের সেতুর মধ্য দিয়া ধর্মরাজ্যে গমন করিয়াছেন। সুখের শয্যা কাহারও জন্য ছিল না।

৭২। বিনয়ী ও নম্র হইও এবং কখনও আপনাকে বড় বলিয়া ভাবিও না।

৭৩। বিপদসময়ে অধীর হইও না. অধীর হইলে জ্ঞান, বুদ্ধি, বল সমস্তই হারাইতে হয়। বিশেষতঃ বিপদ কখনও একা আসে না ; তাহার দলবলকে সঙ্গে লইয়া আসে।

৭৪। বিপদে স্থির থাকা, নির্যাতনের সময় নীরব থাকা, ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টি রাখা এবং মানুষের কথায় বিচলিত না হওয়া একান্ত কর্তব্য।

৭৫। ভণ্ড সন্ন্যাসীরা অর্থাৎ যাহারা পথের ধারে বা ঝোপের আড়ালে বসিয়া তিলকমাটী মাখিয়া নাগাসন্ন্যাসী সাজে এবং লোকের বাড়ী বাড়ী ভিক্ষা করে, হস্তরেখা দেখিয়া ভূত-ভবিষ্যৎ গণিয়া দেয়, বন্ধ্যা স্ত্রীলোকদিগের সন্তান হইবার ঔষধ প্রদান করে, ছলনাবাক্যের দ্বারা প্রতারণা ও প্রবঞ্চনা করিয়া অর্থ উপার্জন করে, তাহাদিগকে কখনও প্রত্যয় করিও না। এরূপ সন্ন্যাসীদিগের সহিত কথা কহিলেও পাপ হয়। কারণ, উহারা ধার্মিকের বেশ ধারণ করিয়া লোকের মন আকর্ষণ করে ও সুবিধা পাইলে প্রতারণা করিয়া প্রস্থান করে।

৭৬। ভবিষ্যৎকে বিশ্বাস করিও না, এবং ভবিষ্যৎ আশা করিয়া কাহাকেও আশ্বাস দিও না।

৭৭। ভবিষ্যতে করিব বলিয়া হাতের কার্য ফেলিয়া রাখিও না, ফেলিয়া রাখিলে প্রায়ই তাহা শেষ হয় না।

৭৮। মানুষের সহিত অধিক আলাপ করিয়া যে সময় অতিবাহিত কর, সে সময় ঈশ্বরের সহিত আলাপ করা অধিকতর ইষ্টজনক।

৭৯। মানুষ আজ আছে, কাল থাকিবে না ; এই আছে, এই নাই ; আমরা ইহা জানিয়াও বর্তমান সুখ-সুবিধা লইয়া ব্যস্ত, ভবিষ্যতের জন্য কোন চিন্তাই করি না।

৮০। মিষ্টভাষী, মৃদুহাসী, দেখিতে গোবেচারা, এরূপ লোককে কখনও বিশ্বাস করিবে না ; এরূপ লোকের অন্তর প্রায়ই ভাল হয় না।

৮১। যখন অন্যের মৃত্যু দর্শন কর, চিন্তা করিও, তোমাকেও সেই পথে যাইতে হইবে।

৮২। যত দুঃখ হউক না কেন, যতই বিপরীত বিষয় ঘটুক না কেন, যে ব্যক্তি কৃতজ্ঞ অন্তরে সমভাবে সকল বিষয় গ্রহণ করে এবং ঈশ্বরের হস্ত হইতে আসিয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করে, সেই ব্যক্তিই প্রকৃত ধৈর্যশীল।

৮৩। যদি তুমি সর্বদা আত্মপরীক্ষা করিতে না পার, তবে দিনের মধ্যে অন্ততঃ দুইবার—প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে পরীক্ষা করিবে। প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া, সৎসংকল্প গ্রহণ করিয়া দিবাভাগ যাপন কর। সন্ধ্যাকালে পরীক্ষা করিয়া দেখ, সারাদিন কিরূপ ব্যবহার করিয়াছ। দেখিবে, ঈশ্বর ও মানবের কাছে কত দোষ করিয়াছ।

৮৪। যদি দেখ, কোনো ব্যক্তি ভয়ানক পাপ করিতেছে, আপনাকে তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জানিয়া অহঙ্কার করিও না ; কেন না, এমন সময় আসিতে পারে যে, তুমিও ঐ প্রকার পাপ করিবে। নিজে কত কাল সুস্থির থাকিতে পারিবে, তাহা ত জান না।

৮৫। যাহার অন্তরে বাসনার অনল জ্বলিতেছে, পদ্মপত্রের জলের মত তাহার চিত্ত সর্বদাই অস্থির। লোভী ব্যক্তি কখনও শান্তিলাভ করিতে পারে না।

৮৬। যাহারা সাংসারিক সমুদয় বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া ঈশ্বরের সেবার জন্য অবসর রাখেন, তাঁহারাই মানুষ।

৮৭। যে কেবল পরের কথা ও অনধিকারচর্চা লইয়া ব্যস্ত, নিজ জীবনের কথা ভাবে না, আত্মচিন্তা করে না, সে ব্যক্তি পশু ব্যতীত আর কিছুই নহে।

৮৮। যে সকল দোষ অন্য লোকের মধ্যে দেখিলে তোমার ঘৃণার উদ্রেক হয়, সে দোষ হইতে তুমি নিবৃত্ত হও।

৮৯। যৌবনকালে অত্যাচার করিয়া শরীর নষ্ট করিও না। অনেকে যৌবনকালে অত্যাচার করিয়া পরিণামে অনুতপ্ত হন।

৯০। শরীরের সৌন্দর্য দেখিয়া স্ফীত হইও না, কেন না, সামান্য পীড়াতেই সৌন্দর্য নষ্ট হইয়া যাইতে পারে।

৯১। সময়ের সদ্ব্যবহার করিও। কখনও আলস্য পরবশ হইয়া সময় নষ্ট করিও না। আলস্য করিয়া সময় নষ্ট করিলে সংসারে অলক্ষ্মী প্রবেশ করেন।

৯২। সকলের নিকটে স্বীয় হৃদয়-দ্বার উন্মুক্ত করিও না, তাহাতে অনিষ্টের আশঙ্কা আছে। যাঁহারা জ্ঞানী এবং ভক্ত, তাঁহাদের কাছে আপনার বিষয় ব্যক্ত কর।

৯৩। শেষের দিন স্মরণ কর, এবং যে সময় যাইতেছে, তাহা আর ফিরিয়া আসিবে না, এ বিষয় চিন্তা কর।

৯৪। সংসারের মোহে ডুবিয়া ভগবানকে ভুলিও না।

৯৫। সংসার তোমার স্থায়ী বাসস্থান নহে। এখানে দুই দিনের জন্য আছ। অনন্ত পরমেশ্বরই তোমার নিত্যকালের আশ্রয়স্থান, অতএব তাঁহার প্রতি নির্ভর কর।

৯৬। সর্বপ্রকারে ত্যাগ-স্বীকার শিক্ষা করিবে, ইহা অপেক্ষা ধর্ম আর নাই।

৯৭। সৎপথ অবলম্বন করিয়া সংসারযাত্রা নির্বাহ করিবে, কখনও অসৎপথ অবলম্বন করিও না। অধর্মের সংসার কখনও উন্নতির পথে পদার্পণ করিতে পারে না।

৯৮। সাধুকার্য করিতেছ বলিয়া অহঙ্কার করিও না। কেন না, ঈশ্বরের বিচার মানবের বিচার হইতে ভিন্ন। যে কার্যে মানুষকে সুখী করে, তাহা অনেক সময় ঈশ্বরের কাছে ঘৃণাকর।

৯৯। স্বাভাবিক ক্ষমতা অথবা বিদ্যাবুদ্ধি লাভ করিয়াছ বলিয়া উল্লাসিত হইও না। এরূপ করিলে ভগবান অসন্তুষ্ট হইবেন; কেন না, তোমার যাহা আছে, সে সকল তিনিই দিয়াছেন।

১০০। স্ত্রীলোক এবং অপরিচিত ব্যক্তিদিগের সহিত অধিক আলাপ করিও না।

সমাপ্ত